উত্তরসূরী

অষ্টম বর্ষ কার্তিক-পৌষ

12.8

ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীর একটি গান ও অবনিদি, ইন্দিরাদেবীর অপ্রকাশিত রচনা। [illegible]নারায়ণের কবিতা ইন্দিরা দেবী পরশুরাম বিভূতিভূষণ ও মাইকেল সম্পর্কে চিঠিপত্রাদি এবং পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রফুল্ল দাস, রথীন্দ্র রায়, মিতাই বসু ও নীরেন্দ্র সিংহ রায়ের বিস্তারিত আলোচনা। ইন্দিরা দেবী রাজশেখর ও বিভূতি-ভূষণের পত্রাবলী ও শিল্প সাহিত্য প্রসঙ্গে নবম শ্রেণীর আপাতী কবিতা বিষয়ে এলিয়ট ও. গাঙ্গেবাদাক

জীবনানন্দের কয়েকটি অপ্রকাশিত কবিতা। অমিয় চক্রবর্তী, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, নীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণকুমার সরকার, শুভদত্ত বসু, দিলীপ রায়, চিত্ত ঘোষ, আরতি দাস, রাম বসু, বীরেন্দ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, অরুণ ভট্টাচার্য, ঘটকৃষ্ণ দাস, কৃষ্ণধর, ওজন সাহাবুদ্দিন ঘটকৃষ্ণ দে, মানস রায়চৌধুরী, আলোক সরকার, শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় ও অরুণদের কবিতা।

শিল্পী শ্রীসুধীরসমাদ্দার সেনের ছবি

কবিতা- সঙ্গীত- শিল্পচর্চা ও সমালোচনার ত্রৈমাসিক মুখপত্র

দুর্গা দুর্গতিনাশিনী। অর্থাৎ যাঁর মন্ত্র আমাদের অন্তর দান করে এবং শত্রুদের বিনষ্ট করে।

বাঙালীর আজ দুর্দিন সমাগত, সাম্প্রতিকতম দুর্ঘটনা ঘটবার বাঙালী লোকান্তর। অন্যদিকে, শিল্পসাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ প্রদেশ সুদূরপ্রসারী। জাতির এই সংকটময় মুহূর্তে বাঙালীকে আবার শক্তির আরাধনায় সমস্ত মনপ্রাণ নিয়োগ করতে হবে। দুর্গার আরাধনায় সেই শক্তিরই বিকাশ যা সকল দুঃখ ও দৈন্যকে, বিচ্ছেদ ও বেদনাকে প্রতিরোধ করবার অমোঘ সাহস ও বীর্য দান করে। বঙ্কিমচন্দ্র যে দুর্গার চিত্রকল্পনা করেছিলেন, লোভ লালসা ঘৃণা অহংকারকে যা চূর্ণ করবে, দশ হতে আসুর শক্তিকে দমন করবে, তারই আবাহন হোক আজ বাঙালীর ঘরে ঘরে।

কে সি দাশ প্রাইভেট লিমিটেড

আবিষ্কারক ঃ রসোমালাই

কলিকাতা।

স্মরণীয় দুই ● অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড

প্রতি মাসের ৭ তারিখে আমাদের নূতন বই প্রকাশিত হয়

৺দুর্গাপূজা উপলক্ষে বন্ধ থাকায় অন্ত দুই ভাদ্র ও
দুই আশ্বিনের বই এক সঙ্গে প্রকাশ করা হোল।

চিত্রিতা দেবীর উপন্যাস	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস
দুই নদীর তীরে ৩·৭৫	চতুষ্কোণ ৩·২৫
ডঃ শুকদাস ভট্টাচার্যের	দিলীপ কুমার রায়ের স্মৃতিচারণ
বাংলা কাব্যে শিব	(১ম ও ২য় পর্ব একত্রে ১২·০০)

সুভাষ ঘোষের ৭ খানি নূতন বই :

লীলা মজুমদারের	শৈলেন্দ্র বিশ্বাসের
বকধার্মিক ১·৭৫	রামায়ণ ২·৫০
শিবরাম চক্রবর্তীর	সুখলতা রাও-এর
হাসুহানা ২·৫০	নানান গল্প ২·৫০
শৈল চক্রবর্তীর	সুধীর সরকারের
ছোটদের ক্রাকজ্যাক ২·৫০	বোমা ২·৫০

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের
চল গল্প-মিকেতনে ২·৫০

অ ম র ক থা শি ল্পী

শ র ৎ চ ন্দ্র চ ট্টো পা ধ্যা য়ে র

নিম্নলিখিত বইগুলি আমাদের নিকট পাইবেন

উপন্যাস : স্বামী স্ত্রী শুভদা শেষপ্রশ্ন শ্রীকান্ত (১ম পর্ব : ২য় পর্ব : ৩য় পর্ব) দেনা-পাওনা বামুনের মেয়ে বৈকুণ্ঠের উইল হরিলক্ষ্মী পল্লীসমাজ পণ্ডিত মশাই বড়দিদি মেজদিদি নববিধান অরক্ষণীয়া চরিত্রহীন চন্দ্রনাথ অনুরাধা, দত্তা ও পরেশ নিষ্কৃতি নারীর মূল্য (প্রবন্ধ)

নাটক : বিজয়া রাজলক্ষ্মী নিষ্কৃতি পথের দাবী বৃহন্নলা রমা দেবদাস শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলী

গ্রাম : "কালচার" ফোন : ৩৪-২৩৪১

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

উল্লেখযোগ্য বই ও পত্র-পত্রিকা

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
(সংক্ষিপ্তসার) দাম : এক টাকা
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
(সংক্ষিপ্ত বিবরণী) দাম : ছয় আনা
॥ ছোটদের জন্য ॥
দেশ-বিদেশের উপকথা
অমোজিৎ বসু দাম : এক টাকা
যারা জেগেছে নতুন আলো
॥ হরিপ্রসাদ দেবগুপ্ত ॥
॥ দীপ্তি দেবগুপ্ত ॥
গুঞ্জন
ছুটির দিনের কবিতা
দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
তেল—নুন—কড়ি
ভ্রমরপ্রসাদ আচার্য
চলার পথে
বাসন্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
জয়যাত্রা
দীপিমা সেন
ভারত আমার
সতীকুমার নাগ
লাল্লোজর
বিশ্ব বিশ্বাস
প্রতিটি বই সচিত্র এবং দাম চার আনা
আমাদের পতাকা
দাম : পঞ্চাশ নয়া পয়সা

কথাবার্তা

সমসাময়িক ঘটনাবলী ও সাহি
বিষয়ক বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক
সাপ্তাসিক ১'৫০ টাকা।

উইক্‌লি ওয়েষ্ট বেঙ্গল

সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কি
ইংরেজী সাপ্তাহিক। বার্ষিক
সাপ্তাসিক ৩৲ টাকা।

বসুন্ধরা

প্রাচীন অর্থনীতি ও কৃষি বিষয়
বাংলা মাসিকপত্র। বার্ষিক ২৲ টাক

শ্রমিক বার্তা

শ্রমিক কল্যাণ সংক্রান্ত বাংলা দ্বি
পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ১'৫০ টাক

পশ্চিম বংগাল

নেপালী ভাষায় সচিত্র সাপ্তাহিক সংব
পত্র। বার্ষিক ৩৲, সাপ্তাসিক ১'

মগরেবী বংগাল

উর্দু ভাষায় সচিত্র পাক্ষিক সংবাদপ
বার্ষিক ৩৲ টাকা, সাপ্তাসিক ১'

অনুসন্ধান করুন

(বইয়ের জন্য) পাবলিকেশনস্ সেলস্-অফিস, নিউ সেক্রেটারিয়েট, ১ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১

(পত্র-পত্রিকার জন্য) প্রচার-অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রাইটার্স বিল্‌ডিংস্, কলিকাতা ১

রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা

॥ রবীন্দ্র পরিচিতি ॥

রবীন্দ্রস্মৃতি

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

"কোনো মহাপুরুষকে বাইরের লোকে যে ভাবে দেখে যা তাঁর প্রতিভার যে পরিমাণ পরিচয় পায়, ঘরের লোকের দৃষ্টিভঙ্গি সে রকম নয়। তারা বেশি কাছ থেকে দেখে বলে যেমন তাঁর ব্যাপক বা সমগ্র ব্যক্তিত্বের অনুধাবন করতে পারে না, তেমনি অনেক ছোটখাটো ইঙ্গিত জানতে পায়, যা বাইরের লোকের অধিগম্য নয়। আত্মীয়মাত্রেরই যে এই সৌভাগ্য ঘটে তা নয়, তবে নানা ঘটনাচক্রে আমরা বহুদিন ধরে তাঁর নিকটসান্নিধ্য এবং ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাবার সুযোগ পেয়েছিলুম। সেই ছোটখাটো পরিচয়গুলি একত্র করে এই স্মৃতিপটে সাজিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি।" গ্রন্থমুখ : রবীন্দ্রস্মৃতি

সূচী ॥ সংগীতস্মৃতি, নাট্যস্মৃতি, সাহিত্যস্মৃতি, ভ্রমণস্মৃতি, পারিবারিক স্মৃতি

মূল্য ২·০০, বোর্ড বাঁধাই ও বহু চিত্রশোভিত ৩·৫০ টাকা

রবীন্দ্র জীবনকথা

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

"চারিটি সিরাট খণ্ডে লিখিত 'রবীন্দ্রজীবনী'র সংক্ষেপিত সংস্করণ বলে এই গ্রন্থটিকে গণ্য করলে ভুল করা হবে। ঐ বৃহদায়তন চার খণ্ড জীবনীর একটি সারসংকলন অবলম্বন করে প্রভাতকুমার নতুন করে এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। গ্রন্থের সবচেয়ে বিশেষত্ব এই যে, গ্রন্থটি আদি থেকে অন্ত চলতি ভাষায় লেখা। গ্রন্থের শেষাংশে একটি সংক্ষিপ্ত বংশলতিকা, রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী ও রবীন্দ্ররচনাপঞ্জী অন্তর্ভুক্ত করে গ্রন্থটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। রবীন্দ্রচর্চার পক্ষে গ্রন্থটি অপরিহার্য।"—মাসিক বসুমতী

মূল্য ৬·০০ টাকা

বিশ্বভারতী

৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে

উত্তরসূরী

মাঘ ও বৈশাখ সংখ্যা একত্রিত হবে
একটি প্রামাণ্য সংকলন প্রকাশ করবে

প্রবন্ধ লিখছেন :

ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, অন্নদাশংকর রায়, অমিয় চক্রবর্তী, সুবোধ ঘোষ, কানাই সামন্ত, আশুতোষ ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ, শিবনারায়ণ রায়, অরবিন্দ পোদ্দার, অরুণকুমার সরকার, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্ল দাশ, বিমল কর, রাজ্যেশ্বর মিত্র, রথীন্দ্র রায়, সুনীল মুখোপাধ্যায়, অজ্ঞ সিকদার, সুরজিৎ দাশগুপ্ত, অমিয়ভূষণ মজুমদার ও অরুণ ভট্টাচার্য।

এ ছাড়াও গল্প উপন্যাস, চিত্রকলা ও সঙ্গীতের তিনটি সংযোজনা থাকছে

রবীন্দ্রনাথের ছবি স্বরলিপি ও চিঠি এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

প্রায় আড়াই শ পৃষ্ঠার এই সংকলনটির দাম আনুমানিক মাত্র ছ টাকা।

উত্তরসূরী : ৯বি-৮ কালিচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা ২

'নাভানা'র বই

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'লো

দীপ্তি ত্রিপাঠীর

আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়

দীর্ঘকালের অধ্যবসায় ও সুগভীর গবেষণার ফলশ্রুতি দীপ্তি ত্রিপাঠী 'আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়' গ্রন্থের বিস্তৃত পরিসরে আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রকৃতি ও পটভূমি এবং বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে ও অমিয় চক্রবর্তী—এই পাঁচজন কবির এ-পর্যন্ত প্রকাশিত সমুদয় গ্রন্থের প্রায় প্রতিটি বিশিষ্ট কবিতা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সূচনা থেকে সিদ্ধির সেতু নির্মাণে, পূর্বাপর বিশ্লেষণের সুচারুতায় 'আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়' বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয় গ্রন্থ, ঐতিহাসিক মূল্যেও অসামান্য। দাম : সাড়ে-সাত টাকা।

নাভানা

৯৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

আমাদের প্রকাশিত কবিতার বই

বুদ্ধদেব বসু
যে আঁধার আলোর অধিক ২·৫০
বিবি
যে দিন ফুটলো বিশ্বের ফুল ২·৫০
বিষ্ণু দে
আলেখ্য ২·৫০
হুমায়ুন কবীর
মরুসাথী ২·০০
সাথী ১·৫০
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
মরকাউ ২·০০
অদ্ভুত চট্টোপাধ্যায়
সিংহল মেস ২·০০
হরপ্রসাদ মিত্র
তিমিরাভিসার ১·৫০
মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়
সংকলিতা ৪·০০

বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত
আধুনিক বাংলা কবিতা ৬·০০
নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবী সম্পাদিত
কাব্য দীপালী ৭·০০
নবনীতা দেব
প্রথম প্রত্যয় ১·৫০
সুশীল গুপ্ত
আলোর আকাশ ২·০০
বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়
আকাশিনী ও মৃন্ময়ী ২·০০
অমিত দত্ত
আমাদা ২·০০
মণীন্দ্র রায়
অমিল থেকে মিলে
সুশীল রায়
পাকালী ২·০০

এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ। কলিকাতা ১২

FOREIGN PUBLISHERS AGENCY

GRAND HOTEL ARCADE CALC

Sole distributor

COMMERCE (Weekly)
Editor: S. V. Rayan

QUEST (Quarterly)
Editors: Abu Sayeed Ayyub
& Amlan Datta Editor:

Also Available Books on
Art, Theatre, Literature, Philosophy & Soc'al Sciences.

অরুণ ভট্টাচার্যের
নতুন প্রবন্ধ সংকলন
সঙ্গীতচিন্তা
শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

●

পুরোগামী প্রকাশনী
১০।১ ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ
কলিকাতা ৪

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়-এর
দুই পৃথিবীর মাঝের দেশ
দাম ৬'৫০ টাকা

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট
লিমিটেড, কলিকাতা-১২

বাংলার বস্ত্রশিল্পের লক্ষ্মী

ব ঙ্গ ল ক্ষ্মী

নিত্যপ্রয়োজনে

ব ঙ্গ ল ক্ষ্মী ব্র

ধুতি — শার্টিং — শাড়ি

অ প রি হা র্য

ভারতের প্রাচীনতম গৌরবময় প্রতিষ্ঠান

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ

মিলস্ শ্রীরামপুর হুগলী

হেড অফিস : ৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—১৩

আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে
দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় প্রস্তুত

৮০ বৎসরের লোকপ্রিয়

ফুল মার্কা ঘি

মুন্নালাল দ্বারকাদাস
৭৬, বড়তলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন নং ৩৩-২৭৩৩

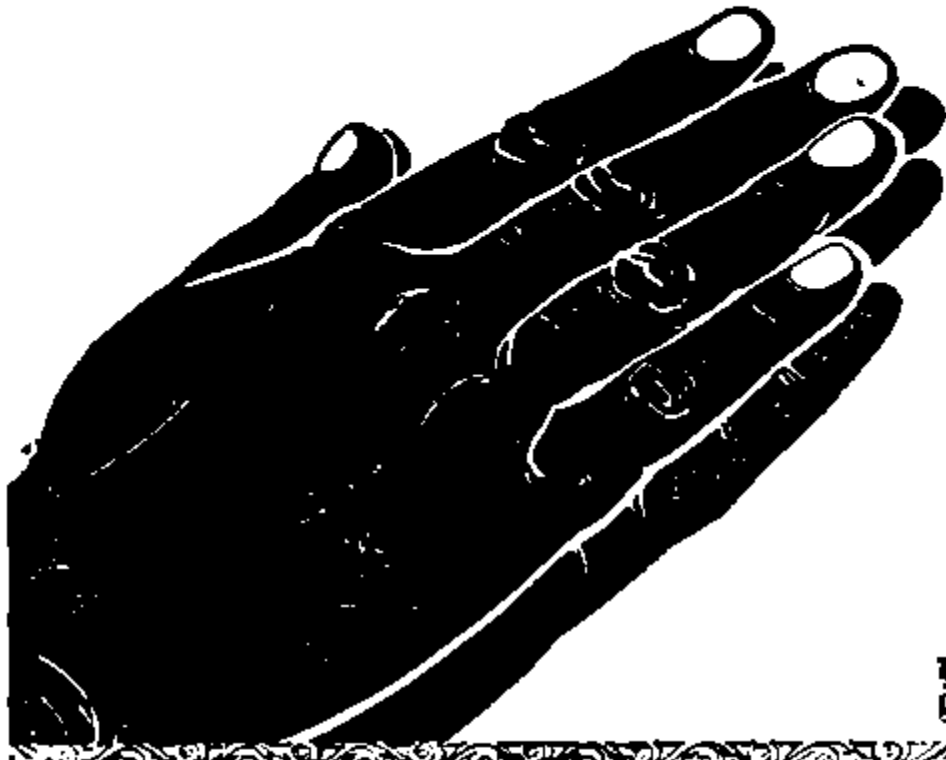

সর্বে সুস্থিনঃ সন্তু, সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্ভবেৎ॥

সুখী হোক সবে, হোক সবে নিরাময়,
সবারেই যেন শুভের দেখে হৃদয়ে বহে জয়।

METROPOLITAN BANK Ltd.

(A Scheduled Bank)

Efficiency Safety
Banking facilities

•

Head office:
7, Chowringhee Road, Calcutta

•

Branches at:
Mission Row (Calcutta) North Calcutta, South Calcutta,
Kharagpur, Cooch Behar and Alipur Duar.

উপহার!

'বাথগেটের'
দেড়শত বৎসরের বিখ্যাত
ক্যাষ্টর অয়েল
খরিদ করিয়া

লোভনীয়
পূজোপহার
লাভ করুন

(১০০টি উপহার ১৲ হইতে ৫০৲ পর্যন্ত)

☆ ১ম উপহার— ১টি নূতন রেডিও ৫০০৲ (all wave all transistor)
☆ ২য় উপহার— ১টি নূতন সাইকেল ২৫০৲
☆ ৩য় উপহার— ১টি নূতন সেলাই কল ১১৫৲
এবং আরও ৯৭ টি মূল্যবান উপহার—

আপনি এখনই আপনার নিকটস্থ ষ্টোর বা তাহার পরবর্তী ষ্টোর হইতে 'GIFT COUPON INSIDE' লেখাযুক্ত বাথগেটের ক্যাষ্টর অয়েল (৪ আ: শিশি) ক্রয় করিয়া 'লাকীকুপন' এবং তা তৎক্ষণাৎ উপহার পাইতে পারেন।

অনুগ্রহপূর্বক লক্ষ্য করুন :

বেঙ্গল বাথগেট এণ্ড কোং লিঃ
১৭।১৯, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১
ফোন : ২২-১৮০৬

বেঙ্গল পল্লী এণ্ড কোং
মেসার্স ডিষ্ট্রিবিউটার্স, কলিকাতা ও মফঃস্বল
৫৬, চৌরঙ্গী, কলিকাতা-১৩
ফোন : ৪৪-৪১৬৮

নিম

দাঁত
সুদৃঢ় করিতে
ও
মাড়ী সুস্থ রাখিতে
অদ্বিতীয়

২০০০ বছর পরিয়া ইহার
উপকারী গুণগুলি স্বপ্রতিষ্ঠিত

নিম টুথপেষ্ট

পত্র লিখিলে
"হাসিতে মুক্তা ঝরে"
পুস্তিকা পাঠান হয়।

ইহা নিমের সক্রিয় ও উপকারী গুণ
এবং আধুনিক টুথ পেষ্টগুলিতে ব্যবহৃত
ঔষধাদি সমন্বিত একমাত্র টুথ পেষ্ট।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা-২৯

একদা প্রবীণ লেখকের রচনার ভাষা ও ভঙ্গি ইঙ্গিতে চিহ্নিত করিবার জন্য একজন লেখকের খ্যাতি হইয়াছিল। কিন্তু সেই এই ভঙ্গি সর্বত্র প্রযোজ্য হইবে না। আধুনিক পাঠকের মনোযোগ এই আর্ট প্রতি হইবে যে তাঁর লেখনী মুক্তার অক্ষর বাহির না।

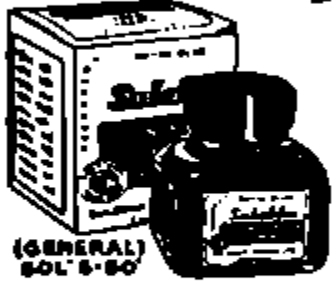

আধুনিক মুক্তার লেখকরাও হয় যে যাহার লেখার পদ্ধতি কোনক্রমেই ধারণ করা হয়। আর এই অবস্থার পরিবর্তন করাই সুলেখা আজ এই অবস্থিতি।

সুলেখা ওয়ার্কস্ লিঃ

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ

সূর্যমুখীর দান

[illegible] ইতিহাস সেখা হয়নি। [illegible] বিবাহের পরে রাহুর যে অংশ প্রথম [illegible] ২৩ সংখ্যক বা [illegible] পাখি। এর প্রধান পাওয়া যেত। [illegible] হিসেবে বহু আদরের ছিলো। [illegible]-এর যে [illegible] আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে যে অংশে লিখিত আছে তা পাখি [illegible] পরিচয়ের অংশ। আবার, [illegible], ইজিপ্ট ও [illegible] প্রাচীন পরিবারে যে বিবাহ পাওয়া যেত তাতেও পাখির প্রাচীনত্বের প্রমাণ মেলে। খৃষ্টজন্মের ৭০০০ বছর আগে পাওয়া যেতো এর চাষ খুব [illegible] ছিলো।

আমাদের [illegible] পুরাণ ও পাঞ্চালিতে [illegible] উল্লেখ আছে। [illegible] আবিষ্কারের [illegible] জানা গেছে যে পাখির [illegible] খৃষ্টজন্মের ৭০০০ বছর আগে আবাদযোগ্য ছিল। [illegible] [illegible] [illegible]

আনন্দে উৎসবে...
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে...

পবিত্র সুরভিত
কেশতৈল

কেশরঞ্জন

[illegible]

অন্তহীন শূন্যে মানুষের অভিযানের আরও একটি বিরাট পরিকল্পনা! পৃথিবী থেকে ১০৫০ মাইল উঁচুতে বিজ্ঞানীরা একটি বিশাল স্পেস-স্টেশন তৈরী করবার জল্পনা-কল্পনা করছেন। যন্ত্রপাতি ও জিনিষপত্র পৃথিবী থেকে এই স্পেস-স্টেশনের কক্ষপথে পাঠানো হবে রকেটে করে—সেগুলো তারপর স্পেস-ট্যাক্সিতে করে কার্যক্ষেত্রে নিয়ে আসা হবে।

স্পেস-স্টেশন তৈরীর কাজে যদি আপনিও থাকেন তা হলে অন্য সবাইর মত আপনিও স্পেস-ট্যাক্সির জন্য উদগ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করবেন—কারণ এই ট্যাক্সিতে আসবে দরকারী জিনিষপত্র, দেশের খবর, বাড়ীর চিঠি, আর বলা বাহুল্য আপনার প্রিয় সিগারেট—উইলস নেভিকাট।

উইলস
মানেই ভালো
আধুনিক সিগারেট

দি ইণ্ডিয়ান টোব্যাকো কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত BC/166

প্রেম ও প্রীতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে সৌন্দর্য্যেরও প্রয়োজন। আর এই সৌন্দর্য্যের একটি প্রধান অংশ লুকিয়ে রয়েছে কেশের সৌন্দর্য্যের মধ্যে। যদি অন্যের ভাবনার মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চান তাহলে আজ থেকেই ব্যবহার করুন

আর্নিকা হেয়ার অয়েল

ইহা একটি দুষ্প্রাপ্য ভেষজ কেশতৈল। চুল ওঠা, অকালপক্কতা এবং যে কোন শিরঃপীড়ায় অতি ফলপ্রদ। সুগন্ধযুক্ত ৭ আউন্স শিশিতে পাওয়া যায়। মূল্য ৩ টাকা।

বিশ্ব ঔষধ কোং

৯০।৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

ফোন—৩৪-২০০১

শাখা
১৫৪ রসা রোড, কলিঃ-২৬
ফোন—৪৮-১৩১১

শাখা
১২ বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিঃ-১৬
ফোন—৪৪-৫৮৬৩

কনকাপাড় খালধার পেরিয়ে পালকি চলে।

বৌয়ের মন চলে তারও আগে। সোঁদামাটি আর

শিউলি ফুলের গন্ধে মন আনচান। বাপের বাড়ীর দেশ আর কতদূর?

উত্তরের যাত্রায় দুরন্তের বাঁধা সড়ক হোক

পূর্ব রেলওয়ে

উড়িষ্যার লোকশিল্পের নিদর্শনে।

উড়িষ্যার পোড়ামাটির
পুতুলের অনুসরণে

ঐশ্বর্য বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল
উৎসব সমারোহ
দূরান্তের আত্মীয়
পরিজনের সান্নিধ্যে
উজ্জ্বলতর হোক....

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

আরামে বিশ্রাম
করতে হ'লে
চাই

ডানলাপিলো

গদি | বালিশ | কুশন

DPC-103 BEN

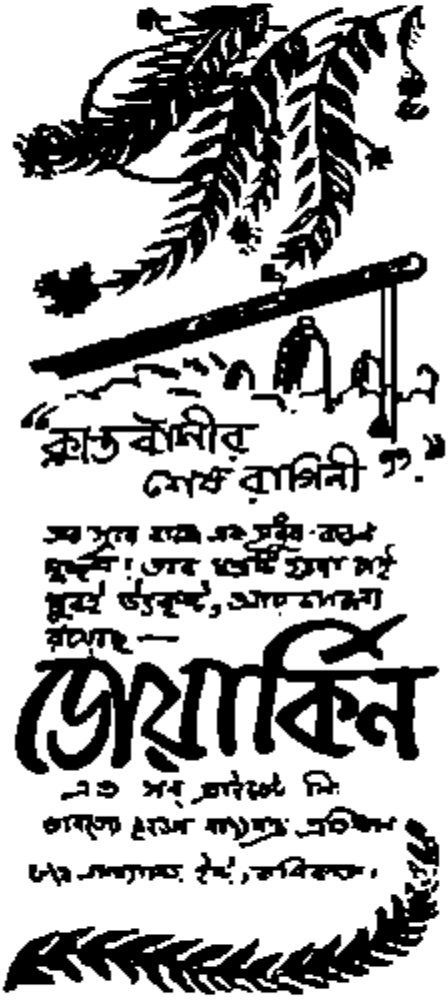
"ক্লান্তবাসীর
সেরা রাগিনী"
ভোয়াকিন

পথ চলার আনন্দ
ভালো চলতে চাই ভালো জুতো। জুতোর আরামেই চলার আরাম। চুক্কার আরাম বাটার জুতোয়। উপযুক্ত প্রসাধিত পোষ্টা, মিনুত মজবুত। ফলে, শুধু সুখে চলা নয়, পথ ভালো করে চলা।
Bata

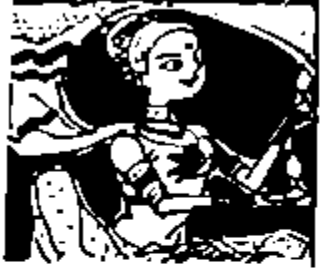

ফিলিপ্‌স যে কোন উৎসব-অনুষ্ঠানের জাঁকজমক ও আনন্দ বাড়িয়ে দেয়।

ফিলিপ্‌স

ফিলিপ্‌স ইণ্ডিয়া লিমিটেড

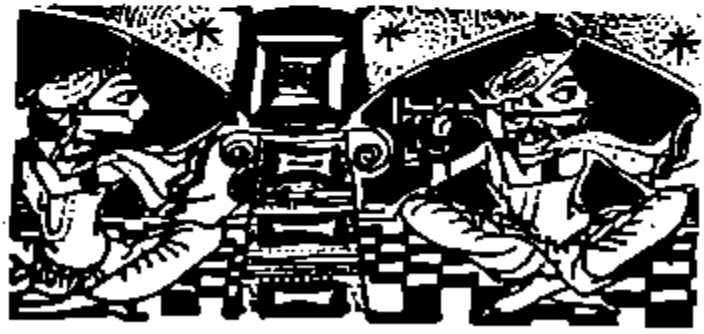

উত্তরসূরী

অষ্টম বর্ষ ॥ প্রথম সংখ্যা ॥ কার্তিক-পৌষ ॥ ১৩৬৭

ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীর একটি গান ও স্বরলিপি
সুশীলমাধব সেনের ছবি

প্রবন্ধ

ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী : কবিগুরু স্মরণে। ১। মিহিরকুমার গুপ্ত : সাঁট জেমারেশান : এক দার্শনিক অনুসন্ধান। ৩। জীরেন্দ্র সিংহরায় : মধুসূদনের সামাজিক প্রতীতি ও তাঁর প্রহসন। ১৬। নিতাই বসু : বিভূতিভূষণের ছোট-গল্পে মুগ্ধসংকেত। ২৬। প্রফুল্লকুমার দাস : ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী। ৫৭। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় : স্মৃতিচিত্র। ৬৮। রথীন্দ্রনাথ রায় : গল্পকার পরশুরাম। ৯৮।

কবিতাবলী

জীবনানন্দ দাশ, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, মণীন্দ্র রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র গুপ্ত, রাম বসু, আরতি দাস, শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, মানস রায়চৌধুরী, অসিতকুমার, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, তুষার চট্টোপাধ্যায়, অমিত দত্ত, শান্তি লাহিড়ী, দিব্যেন্দু পালিত (৩২-৪৬)

অনুবাদ কবিতা

নবম শতকের জাপানী গীতি কবিতা : অশোক মুখোপাধ্যায়। রিলকে ও পাস্তেরনাক : বিমল চক্রবর্তী। এলিয়ট : গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় (১২২-১২৪)

কবিতাবলী

অমিয় চক্রবর্তী, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণকুমার সরকার, দিলীপ রায়, শুভসঙ্ঘ বসু, চিত্ত ঘোষ, বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অরুণ ভট্টাচার্য, ষষ্টীকৃষ্ণ দাস, কৃষ্ণ ধর, ষষ্টীকৃষ্ণ দে, কমল শাহাবুদ্দিন, আলোক সরকার, শোভন সোম, প্রকৃতি ভট্টাচার্য, তরুণ সান্যাল, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ কর, পরিমল ঘোষ, আশিস সান্যাল, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, কাজল ঘোষ (৭৯-৯২)

শিল্প সাহিত্য প্রসঙ্গ

"শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার" : অমূল্য দাশগুপ্ত। 'বাংলার লোকশ্রুতি' : সুরজিৎ দাশগুপ্ত। শ্রীমদ্ভাগবৎ ও চণ্ডীতে পার্থক্য : যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী। ভারতবর্ষে শতবার্ষিকী, মেঘনাদবধ ও পেদুইনের পঁচিশ বছর : অরুণ ভট্টাচার্য ॥

পত্রাবলী

ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী রাজশেখর বসু ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি

সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৯বি-৮ কালিচরণ ঘোষ রোড ॥ কলিকাতা ২

আমাদের

প্রীতি ও শুভেচ্ছা

গ্রহণ করুন

ষ্ট্যাণ্ডার্ড-ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানী
(সীমাবদ্ধ দায়িত্বের সঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

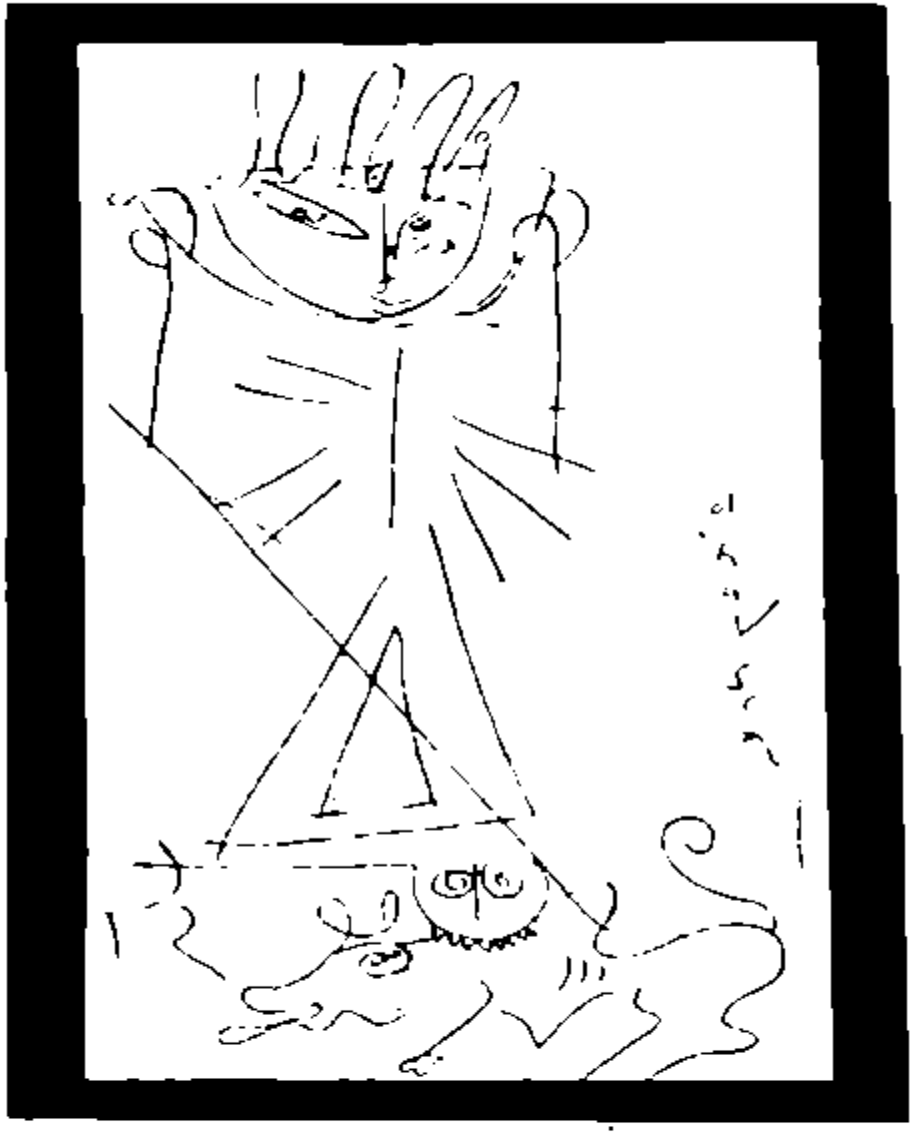

শ্রীশ্রীদুর্গা

শিল্পী : সুধীরমাধব সেন

উত্তরসূরী

৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা। কার্তিক-পৌষ ।-১৩৬৭

কবিগুরু স্মরণে

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

স্মৃতি, স্মৃতি, স্মৃতি লিখতে লিখতে এক একবার ইচ্ছে করে বিস্মৃতির অতলে ডুবে যাই। তার বেশি দেরিও নেই।* তবে যতক্ষণ ঢেউ খেলা সব চুকিয়ে দেবার সময় না হবে ততক্ষণ রঙ্গুল কাগজের নৌকায় কল্পনের দাঁড় টেনে স্মৃতিসমুদ্র মন্থন।

হয়ত এক কথারই বার বার পুনরাবৃত্তি হবে। তার সান্ত্বনা এই যে, সকলে ত সব কাগজ পড়বে না। উত্তরী, দক্ষিণী, পূর্বী, পশ্চিমী অন্ততঃ চার বিভাগে পাঠক বিভক্ত হবে। কেন থেকে কালে এই উপমা টেনে নিয়ে গেলে,

---

* ২৭শে শ্রাবণ শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী পরলোক গমন করেছেন। বিগত ১৩ই জুন আমি শান্তিনিকেতনে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে দেখা করি এবং রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সংখ্যার জন্য লেখবার অনুরোধ জানাই। দুদিন বাদে উনি এই ছোট্ট লেখাটি দেন এবং আমাকে জিজ্ঞেস করেন, এমন লেখা তোমাদের কাগজে চলবে কিনা। আমি বলেছিলাম যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সবুজপত্রের যোগাযোগের বিষয় যদি কিছু লেখেন তাহলে খুব ভালো হয়। কেননা, ইতিপূর্বে শ্রীঅন্নদাশংকর রায় আমাদের পত্রিকায় এবিষয়ে লিখেছিলেন। আপনার কাছে এবিষয়ে আমরা কিছু শুনতে চাই। উনি আরো দুদিন পরে আর একটি লেখা দিলেন—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'সবুজপত্র'-এর সম্পর্কের কথা ওঁর যা মনে ছিল তা স্মৃতি থেকে আহরণ করে লিখলেন। সে লেখাটি আমরা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যায় প্রকাশ করব। বোধ হয়, এই দুটি রচনাই ওঁর শেষ লেখা। সঃ উত্তরসূরী।

P 29224

শৈশব, যৌবন, জরা, মৃত্যুতে পৌঁছতে পারা যায়। তার প্রথম দুই অংশে স্মৃতি খুব প্রবল থাকে, জরাতে ক্রমশঃ লোপ পেতে থাকে। তারপর ?

তারপর সব অন্ধকার। স্মৃতির দীপ নিভে গেলে কিন্তু আশা ও বিশ্বাসের বর্তিকা হাতে করে কিছু দূর কি এগনো যায় না ? সব ধর্মেই বলে পরে আবার দেখা হবে, প্রিয়জনের সঙ্গে আবার মিলন হবে। সে কি কেবল বৃথা আশ্বাস বাক্য ? কে বলবে ? কেউ ত পরপার থেকে ফিরে এসে কোন কথা বলে না, কোন সাক্ষী দেয় না। তবে আশাই আমাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক হোক্। কালে কালে মনে মনে মধুর স্বরে বলুক এপারের দেখাশোনা মেলামেশা শেষ হলে ও-পারে নতুন দেশে নতুন বেশে নতুন জীবন আরম্ভ হয়—মানব দেহ নশ্বর হলেও মানবাত্মা অমর। অন্যান্য বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত হলেও এ বিষয়ে সকল ধর্মই প্রায় একমত—নয় কি ?

এ সব গূঢ় রহস্য ভেদ করবার মননশক্তি আমার না থাকলেও এটুকু বলে শেষ করি যে কবিগুরুর তিরোধানের অব্যবহিত পরে তাঁর হাতে যখন শান্তিনিকেতনে বাস করতে আসি, তখন থেকেই আমার পূর্ণ ইচ্ছা এবং আশা-বিশ্বাস সম্বলিত মনোভাব থেকে তাঁর যে-কোন স্মৃতিবাসর উদ্যোগে আমার হাত থাকত, তাতে তাঁর উদ্দেশে একটা কোন গান রাখতুম, আর মনে করতুম তিনি হয়ত সব জানতে পারছেন।

সেই একই মনোভাবে প্রণোদিত হয়ে আজও মনে করি যেন তাঁর শতাব্দী পূজায় যে দেশব্যাপী সমারোহ হচ্ছে বা হবে তা তিনি বুঝতে পারুন, তা'তে আনন্দ লাভ করুন, এবং তাঁর আশীর্বাদ আমাদের উপর বর্ষণ করুন।

শান্তিনিকেতন, ১লা আষাঢ় ১৩৬৭

বীট জেনারেশান : এক দার্শনিক অনুসন্ধান

মিহিরকুমার গুপ্ত

ফ্যাসিষ্টবাদ, মার্ক্সীবাদ, সাম্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, স্পেন, হিটলার, ষ্টালিন, অমঙ্গলের চুক্তি, পার্ল হারবার, কনসেনট্রেশান ক্যাম্প, হিরোশিমা, নাগাশাকি, মস্কো, ইয়ালটা, হাংগেরী, সুয়েজ, ছায়াসাম্যাত, সার্ত্রিজম্—সমসাময়িক ইতিহাস এই সব বিশেষ নামে পরিপূর্ণ। এ সবের অন্য নাম : হিংসা, ধ্বংস, ঘৃণা, লোভ, দোষারোপ, বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মিক দেউলিয়া।

সম্ভবত পৃথিবীর সমগ্র সভ্যজগতের প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির অবচেতন মনের উপর আণবিক বোমা ও কনসেনট্রেশান ক্যাম্প এর মনোধ্বংসী প্রভাবের ফলাফল নির্ণয় কোন দিনই সম্ভব হবে না। সভ্যতার ইতিহাসে—বোধহয় মানুষের তিনশো বছরের ইতিহাসে—অব্যক্ত ও অপ্রকাশিত এক চেতনা ও জ্ঞান এই সর্বপ্রথম মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপর প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে : আমাদের ভাবনা, চিন্তা ও ব্যক্তিত্বের সামান্যতম প্রক্ষেপ, অথবা আমাদের ভাবহীন, চিন্তাহীন ও ব্যক্তিত্বহীন অস্তিত্ব—জীবনধারণের এই দুই প্রত্যয়ই সমানভাবে এক গৌরবহীন পরিণতি থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারছে না, যে পরিণতির অন্য নাম মৃত্যু—সম্মানহীন, মর্যাদাহীন, অজ্ঞানিত, অমহান, এক মৃত্যু—যার আকস্মিক আবির্ভাব হয়ত হবে প্রাচীন গ্রীকনাট্যের deus ex machina এর মত কোন গ্যাসাগারে কিংবা কোন তেজস্ক্রিয় মহাশূন্যে। সময়কে জয় করে, সামাজিক কার্য-কারণের যোগাযোগকে জয় করে প্রকৃতিকে বশীভূত করার কাউন্টার দৃঢ় সংকল্পের উপর গঠিত এই সভ্যতার মাঝে—যার মূলে আছে আধুনিক মানুষের অমড় ও গভীর বিশ্বাস যে মানুষের ইচ্ছা দ্বারা সময়কে বশীভূত করা খুবই সম্ভব—মানুষের মনে ক্রম-সঞ্চারিত হয়েছে এক অসহনীয় উৎকণ্ঠা যে মৃত্যু যদি কারণহীন হয় তাহলে জীবনও কারণহীন, এবং কার্যকারণ বর্জিত সময়ের মৃত্যুও তাহলে অবধারিত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রদান করেছে মানবিক অবস্থার এক জলন্ত আর্শি যা মানুষের দু চোখকে করে দিয়েছে অন্ধ।

অধিকারের সমাধানহীন চির অসংগতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বিরাট বিরাট রাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ও অনমনীয় যন্ত্রণা যদি লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী হয়, তাহলে সেই সমাজ ও রাষ্ট্রের স্রষ্টিকর্তা হিসাবে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মানুষই এই অকল্পনীয় দুর্ঘটনার জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী। এবং সমাজ যদি এত নিষ্ঠুর হয়, তাহলে মানুষের নিজস্ব প্রকৃতির অমানুষিক বিকটতার প্রশ্নকে কে অবহেলা করতে পারে?

ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে নিজস্ব স্বাধীন চিন্তাধারার অভিব্যক্তি সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করার সাহস তাই মানুষকে পরিত্যাগ করেছে; কেন না, সে জানে কোন এক উলঙ্গ সংকটের দিনে সমাজের সাথে তার ব্যক্তিগত মতভেদের পরিণাম হ'ল অকাল মৃত্যু। তাই সৃষ্টি হয়েছে অবসাদ, উদ্যমহীনতা ও সম্মতির যুগ, আমেরিকার সমাজদেহের প্রতিটি রোমকূপ থেকে নির্গত এক দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়েছে যা সৃষ্টি করেছে এক সমবেত মানবিক দুর্বলতা।

বিকৃত, ক্লান্ত, ঠাণ্ডা কমকনে এই আবহাওয়ার পটভূমিকায় আমেরিকান অস্তিত্ববাদী বা Beat এর আবির্ভাব এক আশ্চর্যজনক সামাজিক সংঘটন। বীট হচ্ছে আমেরিকার সংস্কৃতির নূতন নায়ক। সে জানে, আনবিক যুদ্ধে বা কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে আসন্ন মৃত্যু, অথচ সামাজিক সম্মতিবাদের শেষন যন্ত্রে শিল্পী, মেধাবী ও বিদ্রোহীর সৃজনক্ষম সাহসিক প্রকৃতির তিলে তিলে মৃত্যুর সংগে সহবাস যদি মানুষের সমবেত অবস্থা বা সর্ত হয়, এবং কৈশোরের উপাত্তকাল থেকে অকালবৃদ্ধির সীমারেখা পর্যন্ত মৃত্যুর সংগে সংবাস যদি বিংশ শতাব্দীর মানুষের নিয়তি হয়, তাহলে জীবনধারণের একমাত্র পথ হচ্ছে জীবমৃতত্ব। হিসাবে মৃত্যুর সর্তকে গ্রহণ ক'রে আসন্ন মৃত্যুর বিপদের সাথে ঘর করা, সমাজের বন্ধন সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন ক'রে শিকড়হীন অস্তিত্ব মেনে নেওয়া, এবং আত্মবিস্মৃতির অবশ্য পালনীয় আদেশ স্বীকার ক'রে নিজমনের পদ-চিহ্নহীন বন্যভূমি অনুসন্ধান করা। তাতাতে, জীবন ঘোর বা নির্দোষ হোক, আসল কথা এক নিষ্ঠাতে উপনীত হওয়া। যেমন, নিজস্ব মনোবিকারকে উৎসাহ দিয়ে অভিজ্ঞতার সেই পরিবেশ অনুসন্ধান করা যেখানে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা শুধু অসহনীয় অবসাদ, এবং যেখানে উপস্থিত শুধুমাত্র বর্তমানকাল

—অতীতহীন, ভবিষ্যৎহীন, শেষহীন, আবর্তনহীন, স্মৃতিহীন, পরিকল্পনাহীন এক সর্বগ্রাসকাল যেখানে ব্যক্তিগত সাহস ও অদৃষ্টপূর্ব পরিবেশের সংঘাতের সংকটে নিজস্ব উৎসাহশক্তির সংগে জুয়াখেলা অপরিহার্য। নূতন নূতন জয় নূতন নূতন উপলব্ধির বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনের শক্তি বৃদ্ধি করে : এবং পরাজয়, ভুল রকমের পরাজয়, শরীর আক্রমণ ক'রে উৎসাহশক্তিকে বন্দী রাখে যতক্ষণ না অন্যের পরাজয়, তাদের অভ্যাস, অবসন্নতা, নিস্তব্ধ বৈরাগ্য ও অনুচ্চারিত তুষারময় আত্মধ্বংসী ক্রোধের বিষাক্ত নিশ্বাস আত্মার নিজস্ব স্বতন্ত্রতা নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

মানুষের সাহসের উপর নিরঙ্কুশ ও স্বেচ্ছাচারী টোটালিটেরিয়ান সমাজের দাবী অপরিসীম : এবং আধা-টোটালিটেরিয়ান সমাজের দাবী আরও প্রচুর, কেননা সাধারণের উদ্বেগ সেখানে অনেক বেশী। বস্তুত, নিজেকে মানুষ হিসাবে গণ্য করতে হ'লে রীতিবিরুদ্ধ বা অপ্রচলিত কোন এক কর্মসম্পাদনের জন্য যে সাহসের প্রয়োজন তার চেহারা অসাধারণ। সুতরাং এটা মোটেই আকস্মিক সংঘটন নয় যে আমেরিকার এই "নূতন বর্বরদল"এর উৎস হচ্ছে আমেরিকার নিগ্রোসমাজ। কারণ, স্বেচ্ছাচার ও গণতন্ত্রের সীমান্তরেখায় আমেরিকার নিগ্রোসমাজ গত দুশো বছর ধ'রে বাস ক'রে আসছে। আমেরিকা জীবনমরণসংকটের উপকণ্ঠে ও দেহশহরের মৃত্যুপথে এক কার্যকারী দর্শন হিসাবে বীট এর উপস্থিতি, আমেরিকান সংস্কৃতির মাঝে এর ধারালো প্রবেশ, এবং সচেতনে বা অবচেতনে, উনিশশো বিশের, ত্রিশের, চল্লিশের ও পঞ্চাশের অমরণীয় ও তিক্ত অভিজ্ঞতায় মোহমুক্ত এক দুঃসাহসী ও প্রগতিশীল যুগের উপর এর তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম প্রভাব খুব সম্ভবত জ্যাজ্ (Jazz) সংগীতের জন্য। ধনী ও প্রভাবশালী শাসক সম্প্রদায়ের প্রতি সমবেত অবিশ্বাসের ফলে এই মোহমুক্তের দল সমাজের প্রচলিত রীতির প্রতিও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। এক ঘর এক নারী, পারিবারিক বন্ধন ও সম্মানজনক প্রেমজীবন—সামাজিক এই রীতির বিরুদ্ধে তারা প্রত্যক্ষভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রেছে। এদের স্বল্পসংখ্য শিল্পপ্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ডি, এইচ, লরেন্স, হেনরি মিলার ও উইলহেম রাইখ্ এর প্রভাব বিদ্যমান থাকলেও এ যুগের দর্শন ও জীবনযাত্রার উপর হেমিংওয়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রশ্নাতীত : অসত্য ও অসৎ এই পৃথিবীতে মানুষ যদি সাহস বজায় রাখতে সক্ষম না হয় তাহলে প্রেম, দয়া, মায়া, সহিষ্ণুতার

ইত্যাদির অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হ'য়ে যাবে। এবং এ যুগের নৈতিক দাবী নিশ্চিতভাবে মেটাতে পেরেছে হেমিংওয়ের সমগ্র চিন্তাদর্শনের মূল প্রত্যয় : যা ভাল লাগে তাই ভাল।

সুতরাং এটা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয় যে নিউ ইয়র্ক, শিকাগো, সান্ ফ্রানসিস্কো, লস্ এঞ্জেলেস্ এর এই সব মোহমুক্ত 'নূতন বর্বর'রা এক নূতন জীবনদর্শন অনুসন্ধানের অভিপ্রায়ে শহরতলীর আনাচে কানাচে আদিম ও সরল 'প্রাচীন বর্বর'দের (নিগ্রো) মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে তাদের জীবন-যাত্রার সরল ও জটিল অভিব্যক্তির মাঝে নিজ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা ক'রেছে। সাদা সমাজ পরিবেষ্টিত আমেরিকার এই কালো নিগ্রো সম্প্রদায়ের কাছে সামাজিক নিরাপত্তা, সুখী পরিবার, ভাল চাকরী ইত্যাদির মূল্য শুধু অর্থহীনই নয়, বিরাট পরিহাস। জীবনধারণের মাত্র দুটো পথ তার সামনে খোলা : হয়, নিজের অপদস্থ অবস্থা স্বীকার ক'রে সাদা সমাজের পায়ের নীচে এক অপমানিত ও লাঞ্ছিত অস্তিত্বে জীবন কাটানো ; না হয়, এই অবস্থার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বিদ্রোহে সাদাদমাজের হাতে নিজেকে জবাই ক'রে ফেলা। জীবনরক্ষার সহায়ক হিসাবে ভদ্রতাভব্যতা যেখানে রক্তের মতই প্রয়োজন, সেখানে নিগ্রোর পক্ষে অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র এই কারণে যে দেহের প্রয়োজন ও দাবী ব্যতিরেকে অন্যান্য প্রয়োজনের দাবী সে নির্মমভাবে দমন করেছে নিজের মধ্যে। জীবনের প্রতি মুহূর্তে শুধুমাত্র জীবনরক্ষার জন্য যাকে সংগ্রাম করতে হয় তার পক্ষে সভ্যজগতের কৃত্রিম আবেগের মূল্য দেওয়া সম্ভব নয়। তাই জীবন সংগ্রামে প্রাণরক্ষার জন্য সে আদিম মানুষের সাহসিক প্রবৃত্তিসহ কৌশল বজায় রেখে অতীতহীন ভবিষ্যতহীন বিশাল বর্তমানের বুকে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। সেই আশ্রয়ের পরিবর্তে মন ও আত্মার আনন্দ পরিত্যাগ ক'রে নিজস্ব জ্যাজ সংগীতের মাধ্যমে সে তার ক্রোধ, কামনা, ক্লান্তি, বৈরাগ্য, উল্লাস, সংশয়, আর্তনাদ, পীড়ন, আক্ষেপ, অস্তিত্বের যন্ত্রণা ও রাগমোচনের বৈরাগ্যের রূপ প্রকাশের চেষ্টা করেছে। জ্যাজ্ হচ্ছে রাগমোচনের সংগীত। আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এর কালো বৈরাগ্যময় সুরলহরী যুদ্ধোত্তর মোহমুক্ত সাদা অস্তিত্ববাদীর কানে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে সাদা ও কালোর সংমিশ্রণে সেই অস্বাভাবিক সামাজিক সংগঠন : বীট্ জেনারেশান।

রীট্ জেসারেশান : এক দার্শনিক অনুসন্ধান

রীট্ হচ্ছে অস্তিত্ববাদী। নিজের অনুভূতির গভীরতা যে উপলব্ধি করতে চায় সেই অস্তিত্ববাদী। নিজের কামনা, ক্রোধ, সংশয়, ভীতি ও বিফলতাপূর্ণ সমস্যা সম্বন্ধে সচেতনতা এবং এই সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন একজন অস্তিত্ববাদীর একান্তই প্রয়োজন। সত্তা বা অস্তিত্ব অস্তিত্ববাদী নিজের জীবনের অভিপ্রায় মর্ম ও গতি সম্বন্ধে খুবই সচেতন; কিন্তু যে জীবন কর্মের প্রয়োজনীয়তার বিশ্বাস দ্বারা নির্মিত সেই জীবনের জ্ঞাত হওয়া উচিত যে অস্তিত্বের সর্বনিম্নস্তরে আছে অনুসন্ধানের তীব্র আকাঙ্ক্ষা যার লক্ষ্য জীবনের অর্থপূর্ণ রহস্যসন্ধান। প্রক্ষোভ বা ভাবাবেগ সৃষ্ট সুগভীর প্রত্যয় ব্যতিরেকে এই ধরনের জীবনযাপন অসম্ভব। কেবলমাত্র নির্ভ্রান্তি-বিচ্ছিন্ন ফরাসী দার্শনিকদের পক্ষেই অনুভূতিহীন অস্তিত্ববাদ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে, কেননা তারা অবচেতনার অস্তিত্ব অস্বীকার ক'রে সচেতনতার স্বরূপের অনুসন্ধানে এক যান্ত্রিকবাদী দর্শন রচনার অভিপ্রায়ে ঘোষণা করেছে যে অসংগতিপূর্ণ এই পৃথিবীতে অস্তিত্বের অসংগতি খুবই সংগত।

নাস্তিক ও অতীন্দ্রিয়বাদীর তর্ক সংলাপে নাস্তিকের স্থান জীবনের পাশে—যুক্তিসিদ্ধ ও অন্ধ জীবন; কেননা তার কাছে মৃত্যু এক বিরাট শূন্যতা, এবং মৃত্যু যদি শূন্যতা হয় তাহলে আরও আরও জীবন ছাড়া সে আর কি কামনা ক'রতে পারে? নিজের দুর্বলতা ও আত্মিক ক্লান্তির বিনিময়ে এক রোমান্টিক মৃত্যু-কামনা সে করে না—এই তার গর্ব। কারণ সে জানে, মৃত্যুর এই মূল্য-নিরূপণ সুসম্পন্ন, কল্পনার মাধ্যমে সারা বিশ্বরূপকে এক বিশেষ অর্থপূর্ণ নৈতিক আকার দান করতে পারে; এবং সে তা চায় না।

এই যুক্তি অতীন্দ্রিয়বাদীর কাছে অর্থহীন। জীবনের দুর্বলতা ও হতাশার উত্তর অতীন্দ্রিয়বাদ—তার বিরুদ্ধে নাস্তিকের এই অভিযোগ স্বীকার করতে তার কোন দ্বিধা নেই। এবং এ সত্ত্বেও তার যুক্তি এই যে, সে একমাত্র সেই অতীন্দ্রিয়বাদী হিসাবে, মৃত্যুর সংগে সহবাস করার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে মৃত্যু সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের আশা রাখে; তার মতে নাস্তিক নিরাশার অসংখ্য আকৃতির রূপ-নিরূপণ বর্জন করায় সে মৃত্যুর অভিজ্ঞতা বিচারে অক্ষম। অতীন্দ্রিয়বাদীর প্রধান যুক্তি তার ব্যক্তিগত দৃষ্টির গভীরতা—দৃষ্টিলাভের এই অসাধারণ উপলব্ধি কোন অনুমানসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক যুক্তিদ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়; এবং তার কাছে এই বিশ্বাস নাস্তিকের যে কোন

যুক্তিসিদ্ধ বিশ্বাস থেকে অনেক বেশী সত্য। মৃত্যুর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার অন্তর্নিহিত অস্তিত্বতা তার যুক্তি। এবং এই যুক্তি তার শুধু একারই নয়—অস্তিত্ববাদীর, মুনিঋষির, মুলকাইটার এর এবং প্রেমিকেরও। বর্তমান সম্বন্ধে অসীম সচেতনতা, যে সচেতনতা মৃত্যুর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার দ্বার তাদের সামনে উন্মুক্ত, যার সাথে অবিরাম সংগ্রাম ছাড়া জীবনযাপন সম্ভব নয় তার এই গভীর মৈরাত্মদর অবস্থার পুরস্কার হল এই জ্ঞান যে, বর্তমানের প্রতিটি মুহূর্তে যা সংঘটিত হচ্ছে তা তার পক্ষে, তার কর্ম, কারণ, প্রয়োজন ও ভালোবাসার পক্ষে হয় ভাল, না হয় মন্দ।

শান্ত নির্বাক এক ধার্মিক পুনরুত্থানের মত এই জ্ঞান সঞ্চার করেছে বীট্ জেনারেশান, এক অদ্ভুত অনুভূতি যার একটি বিশেষ উপাদান এবং যা খুবই বিরক্তিকর ও দুঃখময় : শান্ত আন্তর জীবন ও উগ্র বাহ্যজীবন, তাওর ইন্দ্রিয়াসক্তি ও স্বপ্নময় প্রেম, ধ্বংসকামনা ও সৃষ্টিকামনা—এই দুই পরস্পর-বিরোধী ধারণার এক অসংগত মিলন। তবুও অনস্বীকার্যভাবে সুগভীর এই প্রত্যয় যে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মানুষই জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে হয় জীবনবৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হচ্ছে, না হয় পশ্চাদপসরণ করছে মৃত্যুর দিকে। হয়ত ভবিষ্যতে এ দর্শন আসবে কোন নৈতিক বিপ্লব যা ইতিহাসজীবী মানুষকে রূপান্তরিত করে নেবে অস্তিত্বজীবী মানুষে (Heidegger ? Sartre ?)।

• •

Beat Generation কথাটা Jack Kerouac এর রচনা। তাঁর মতে Beat শব্দটার উৎপত্তি হয়েছে Beatitude থেকে। অন্য কিছু লেখকের মতে Beaten কিংবা Jazz Beat থেকে।

Jack Kerouac তাঁর প্রথম উপন্যাস 'The town and the city'তে Beat generation কথাটা প্রথম ব্যবহার করেন। এই উপন্যাসে তিনি আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত এক বিশেষ যুবকদলের জটিল দৃষ্টিভঙ্গীর বর্ণনা দেন। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-লাভের দৃঢ় সংকল্প এই দলের বিশিষ্টতা।

বাস্তবজীবনে এই উপন্যাসের চরিত্রসমূহের প্রতিলিপি হচ্ছে : Allen Ginsberg (Beat generation এর শ্রেষ্ঠ কবি ; যদিও তিনি এ কথা

স্বীকার করেন না ; তিনি আমাকে জানান যে তাঁর মতে Gregory Corso, শুধুমাত্র Beat Generation এরই নয়, সমগ্র আমেরিকার শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি Corso সম্বন্ধে লেখেন—"Corso is a great word-slinger, first naked sign of a poet, a scientific master of mad mouthfuls of language. He wants a surface hilarious with ellipses, jumps of the strangest phrasing picked off the streets of his mind like "mad children of soda caps".....All his own originality! What's his connection, but his own beauty? Such weird haiku-like juxtapositions aren't in the American book. Ah! but the real classic tradition—from Aristotle's description of metaphor to the wildness of his Shelley—and Apollinaire, Lorca, Mynkovsky.....His Heaven is Poetry.....He's got the angelic power of making autonomous poems, like gods making brooks.....". তাঁর সংগে Kerouac এর পরিচয় Columbia Universityতে, এবং তাঁর Willian Blake এর প্রতি প্রগাঢ় আবেগ ও প্রবল উৎসাহ Kerouacকে বিস্মিত করে ; Willian Lee, অভিনেতার অভাবহতাশ যুবকের মত চেতনা যাঁর ; শান্ত, উৎসর্গিত, গভীর Clellon Holmes ; অত্যুজ্জ্বল, আলোড়নপ্রিয় Neil Cassidy ; অসাধারণ, মেধাবী, অন্তর্মুখ, ফরাসী Surrealists অঙ্কিত প্রত্যক্ষ বা জগৎ খণ্ডিত বিভাগের অনুসন্ধানরত Carl Solomon (Allen Ginsberg এর শ্রেষ্ঠ বন্ধু ; যাঁর জন্যে Ginsberg তাঁর সুপ্রসিদ্ধ কবিতা "Howl" রচনা করেন)। এবং আরও আরও অনেকে, যারা বীট জেনারেশানের অসাধারণ যুগে প্রবেশ করেছে, বহির্ভূত হয়েছে, একসাথে অনর্গল কথা বলেছে, একসাথে অভিজ্ঞতা অনুসন্ধান করেছে এবং একসাথে পত্রিকা প্রকাশ করেছে (যেমন G. Legman এর Neurotica)।

এদের দৃষ্টিভঙ্গী—অতীত ও ভবিষ্যতের বর্জন, সমাজের প্রতিষ্ঠিত কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, এবং Square-এর (যে সমাজের গতানুগতিক নীতিবদ্ধ আচরণে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়) প্রতি এক উলঙ্গ ঘৃণা। সাহিত্যের মাধ্যমে এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় Nelson Algren, Vance Bourjally, Chandler Brossard, Herbert Gold, George

Mandel, R. V Cassil, Anatole Broyard ইত্যাদির লেখায়। এই লেখকেরা যে যুগ সম্বন্ধে লিখেছে তাকে যদি Beat বলে উল্লেখ করা হয়, তাহলে তার কারণ এই যে জোয়ার-এর নিজস্ব সৃষ্ট সামাজিক ইঁদুরের প্রতিযোগিতার অর্থহীনতা থেকে এই যুগ নিজেকে ঘৃণাজনকভাবে সরিয়ে নেয়েছে। সরিয়ে নেওয়ার কারণ শুধুমাত্র পুরস্কারের অকিঞ্চিতকরতাই নয়, অমূল্য মানবিক প্রচেষ্টার অর্থহীন অপব্যবহারের জন্য। তাদের মতে এই প্রতিযোগিতা মানুষের চেতনা ভোঁতা করে, সমস্তকে নির্মমভাবে হত্যা করে ও অনুকৃতির বিভূতি ঘটায়। সামাজিক নাট্যমঞ্চে অভিনয়ের জন্য যে সব মুখোসের প্রয়োজন তা সম্পূর্ণভাবে বর্জন ক'রে বীট জেনারেশান নিজের অস্তিত্বের দারিদ্রে ও অপলাপিত সত্যতায় প্রবেশ করেছে। পরাজয়ের সমস্ত সম্ভাবনার বাইরে যাত্রা করাই বীটের অবিরত প্রচেষ্টা। সে সমস্ত কিছুর অনুসন্ধান করতে চায়, সমস্ত কিছু গ্রহণ করতে চায়, সমস্ত কিছু সম্বন্ধে বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে চায়; কেননা সে সামাজিক বাধ্যবাধকতা ছাড়িয়ে চ'লে গেছে অনেক দূর—যে বাধ্যবাধকতা জোয়ারের প্রতিটি পদক্ষেপ নির্ণয় করে। বীট হিসাবে সে মানুষ, প্রকৃতি ও ঘটনাকে শাসন করার আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছে। অস্তিত্বের প্রকৃত স্রোতে ভেসে প্রেমহীন, ঘৃণাহীন ও প্রতারণাহীন এক অবস্থায় সে প্রবেশ করতে চায়। অসংখ্য প্রতারণা, অসংখ্য বিষাদ, অসংখ্য আত্মপ্রবঞ্চনা—এই তার মোটামুটি অভিজ্ঞতা। সুতরাং বীট জেনারেশানের ধর্মমত ও বিশ্বাস হয়ে প'ড়ে সহজ ও সরল: আত্মসংযমী এই পৃথিবীতে দুঃখ ও আনন্দের বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়ানোই জীবনের সাথে সন্ধিস্থাপনের এক মাত্র পথ। এ ছাড়া সমস্ত ছলনা, সমস্ত প্রবঞ্চনা। বীট জানে যে এই বিরাট পৃথিবীতে সে সম্পূর্ণরূপে একাকী, এবং তার সমস্যা এই জ্ঞানের সাথে সহবাস করা। তাই তার প্রধান উদ্বেগ আত্ম-অনুসন্ধানের, যে অনুসন্ধানে সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাথে নিজের আত্মার যোগাযোগ অনুভব করার আশা রাখে। আগামী কালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে অসমর্থ হ'য়ে সে জানে, বস্তু, জীবন ও ঘটনার পরস্পর সম্বন্ধ স্বীকার ক'রতে রাজি আছে যদি এই সম্বন্ধ তার বর্তমান অস্তিত্বের সত্যতা উদ্ঘোষণে সাহায্য করে। তার কাছে ব্যক্তি ও স্থান নিজের প্রকৃতির ও ব্যক্তিত্বের গভীরতা নির্ণয়ের

মন্ত্র মাত্র। তার সমস্ত সংস্পর্শ প্রত্যক্ষ ও গভীর। কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সাথে যোগাযোগের উপর তার ভবিষ্যত নির্ভর করে না। সুতরাং বর্তমানের মুহূর্ত-পরিবেশের বহির্ভূত ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা তার আবশ্যক নয়। অন্যের সাথে তার সম্বন্ধ কোন নাটকের পরিবর্তনশীল চরিত্রগুলির সংলাপের মত, যে সংলাপের আকার বর্তমানকাল। জীবন-ভূমির সুতন্ত্রদর্শী হিসাবে সম্পূর্ণ নিজস্ব এক অভিনব সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার চাপে সে কেবলমাত্র একটি দায়িত্ব গ্রহন করতে বাধ্য হয়েছে : নিজের অনুভূতি ও ভাবাবেগের তীক্ষ্ণতার মাধ্যমে অস্তিত্বের সাথে সংলাপের উন্নতি সাধন করা।

এই সংলাপের ভাষা অপরিণত ও অবাঞ্ছিত অনেক শব্দের অর্থ খুবই অস্পষ্ট—যেমন dig, cool, cat, chick, hip, beat, swing ইত্যাদি। এই ধরণের শব্দ বা কথার মাধ্যমে বীট চেষ্টা করে তার ভাবাবেগ ও অন্তর্দৃষ্টির বিবরণ দেওয়ার—যে ভাবাবেগ ও অন্তর্দৃষ্টির সহজাত প্রকৃতি যে কোন ভাষার যে কোন বিবরণের সীমারেখার বাইরে। ক্যেরুয়াক-এর বাতাবাত শব্দের সীমাবদ্ধ পরিধির মধ্যে ; অতল শূন্যতা ও বিকট ধ্বংসের ভয় থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য সে প্রতিটি সংঘটনের নাম দান করে। কিন্তু যে বীট সে এই শূন্যতা ও ধ্বংসকে গ্রহণ করে চির পরি-বর্তনশীল জগতের সত্যতা হিসাবে—যে জগতের অর্থ অনুসন্ধানের সংগ্রামে সে প্রতিবারই পরাজিত হচ্ছে।

* *

নূতন এক দর্শন সৃষ্টি নির্ভর করে এক নূতন ভাষাসৃষ্টির উপর। কিন্তু কোন নূতন জনপ্রিয় ভাষার পক্ষে নিজস্ব দর্শন প্রকাশ্যভাবে প্রদান করা মোটেই অবশ্যম্ভাবী নয়। হয়ত প্রশ্ন উঠতে পারে, বীটের জীবন-সৃষ্টির বিশিষ্টতা কি এমন অনন্যসাধারণ যার জন্য তার ভাষা অবমুক্তের শাব্দিক খামখেয়ালী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এর উত্তর হচ্ছে বীটের এক বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক উপাদান—যে উপাদান মানুষের সহজাত প্রকৃতির বিচার করে না মানুষের অতীতের মাপকাঠিতে, যে মাপকাঠির সৃষ্টি হয়েছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালাভের বহু পূর্বে। যেহেতু সে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে দেখতে

পায় এক নূতন বিকল্প, এক নূতন প্রশ্ন, যেহেতু তার আগ্রহ সরলতার উপর নয়, জটিলতার উপর। জটিলতার উপর জোর দেওয়ার জন্য সে পরিত্যাগ করেছে সত্তানুগতিক নৈতিক দায়িত্ব, কারণ তার মতে কোন কর্মের কি ফলাফল হবে তা যদি আমাদের আগে থাকতে জানা না থাকে তাহলে কোন কর্ম ভাল বা কোন কর্ম মন্দ সে সম্বন্ধে মনস্থির করা কি ক'রে সম্ভব? সুতরাং মানুষকে সে দেখে ভাল বা মন্দ হিসাবে নয়, অসংখ্য সম্ভাবনার এক সমষ্টি হিসাবে। একের সম্ভাবনা অন্যের থেকে বেশী, সেই সম্ভাবনাকে রূপ দেওয়ার ক্ষমতা একের অন্যের থেকে বেশী। পরিণত মুহূর্তে নিজস্ব সম্ভাবনার পরিপূর্ণ উপলব্ধি, এবং এই উপলব্ধির মাধ্যমে চরিত্র সৃষ্টি—এই প্রকরণের পট-ভূমিকায় বীট মানুষকে যাচাই করে। চরিত্র বিচারের এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রবেশ করে এক চরম আপেক্ষিকতায়, যেখানে দর্শকের নিজ অস্তিত্বের আন্তরিক সত্য ব্যতিরেকে আর কোন সত্যের স্থান নেই। উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যেতে পারে হয়ত অসমর্থনীয় এই আদিবিদ্যার প্রস্তাব: বিশ্বের অস্তিত্বের প্রতীতি এক ঘটনা, যে ঘটনার মহত্তমোচন সমগ্র দর্শন ও সমগ্র বিজ্ঞানের একমাত্র অভিপ্রায়, এবং যে ঘটনা রূপা-য়িত হচ্ছে এক পরিবর্তনশীল বাস্তবতায়; সে বাস্তবতার বিধি বা নিয়ম প্রতি মুহূর্তে নূতন করে সৃষ্টি করছে সমগ্র জীবন প্রণালী, এবং সে প্রণালীর বিশিষ্ট এক সত্য হচ্ছে জীবন, মানুষ, যে মানুষ আরোহন করেছে এক নব-মধ্যযুগীয় শীর্ষদেশে, যেখানে সত্য চিরন্তন নয়, মুহূর্তের।

সুতরাং এর ফল, আত্মিক ও নৈতিক দাস থেকে মানুষের স্বতন্ত্রতা এবং সমাজের ব্যাধি থেকে আত্মার মুক্তি। বীটের একমাত্র নীতি, যে কোন মুহূর্তে যে কোন জায়গায় নিজের অনুভূতি অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করা, এবং নিজের জন্য সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গতাবে সম্ভাবনার সমস্ত সীমারেখা অতিক্রমের চেষ্টা করা; শুধুমাত্র নিজের জন্য সম্ভাবনার আয়তনকেও বৃদ্ধি করা; সুতরাং প্রত্যেক মানুষের কামনার সমগ্র পরিপূর্ণতায় আছে মানবিক সমবায়ের বৈপরীত্য।

বীটের আত্মজ্ঞান অনুসন্ধানের এই নীতির মূলে দেখা যায় তার বর্তমানকালের শিশুসুলভ উপাসনা (অতীতকে সম্মান করা মানে অতীতের বীভৎস ঘটনা, যেমন কনসেনট্রেশান ক্যাম্প, ব্রেক লেবার ইত্যাদিকেও সম্মান

করা)। বর্তমানের এই উপাদনাই বীটের সত্তাজ্ঞান, কারণ এর চরম মুক্তি মার্ক ডি সাড্-এর সমাধানকেও—যৌনতা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পরিবার —অতিক্রম করে গেছে : সমাজের সংযমময় বিধির অসাধারণ মানুষের নিষ্ঠুর প্রকৃতি বিনাশ ক'রে তার সৃজনক্ষম প্রকৃতির পূর্ণতালাভে সহায়তা করবে।'

• • •

কিন্তু বীট জেনারেশন্-এর চরমতত্ত্ব গভীরতার অর্থসন্ধানের অবিরাম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জীবনের অভিজ্ঞতারাশির সকলন, যার নাম জ্ঞান, তা উপস্থিত নেই। কারণ তার জীবনে এক মুহূর্তের সঙ্গে পরবর্তী মুহূর্তের কোন যোগাযোগ নেই। সে যেন এক অনুভূত আবেগের বীণ, সময়-সমুদ্রে যা বিকম্পন হ'য়ে যাবে কোন' চিহ্ন না রেখে। সামাজিক রীতির প্রতিযোগিতাপূর্ণ মঞ্চ থেকে, নিজেকে প্রত্যক্ষভাবে সরিয়ে ফেলে সে কৈশোরের প্রান্তদেশীয় অস্তিত্বে প্রবেশ ক'রতে বাধ্য হ'য়েছে। যেহেতু সে সমস্ত কিছুরই অনুসন্ধান করতে চায়, সেহেতু অন্তর্নিহিতভাবে, তার কিছুরই প্রয়োজন নেই। অভিজ্ঞতার প্রতি সংবেদনশীল দক্ষতাকে মনুষ্যত্বের চরম পরীক্ষা হিসাবে গ্রহণ করায় সে অভিজ্ঞতাকে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা থেকে ও জীবনশক্তির প্রধান উৎস থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছে।

কিন্তু এ সত্ত্বেও সৃজনক্ষম সাহিত্য ও কাব্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে বীট-এর দান অনন্যসাধারণ ও মৌলিক। এই যুগের চরম প্রতিবাদ হিসাবে Allen Ginsberg-এর সুপ্রসিদ্ধ ও সুদীর্ঘ কবিতা 'Howl' এ আমরা দেখতে পাই এই দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গীর সুস্পষ্ট রূপ। সম্ভাবনার বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন অনুসন্ধানের ফল হচ্ছে এই অসাধারণ কবিতা। William Carlos Williams ও Kenneth Rexroth এর মতে এটা "The most remarkable single poem since the second war" Howl এর প্রথম অংশের শেষ ক'লাইন :

ah, Carl, while you are not safe I am not safe, and now
you're really in the total animal soup of time—,
and who therefore ran through the icy streets obsessed with
a sudden flash of the alchemy of the use of the ellipse
the catalog the meter & the vibrating plane.
who dreamt and made incarnate gaps in Time & Space

through images juxtaposed, and trapped the archangel of the soul

between 2 visual images and joined the elemetal verbs and set the noun and dash of consciousness together jumping with sensation of Pater Omnipotens Aeterna Deus

to recreate the syntax and measure of poor human prose and stand before you speechless and intelligent and shaking with shame, rejected yet confessing out the soul to conform to the rhythm of thought in his naked and endless head,

the madman bum and angel beat in Time, unknown, yet putting down here what might be left to say in time come after death.

and rose reincarnate in the ghostly clothes of jazz in the goldhorn shadow of the band and blew the suffering of America's naked mind for love into an eli eli lamma lamma sabacthani* saxophone dry that shivered the cities down to the last radio

with the absolute heart of the poem of life butchered out of their own bodies good to eat a thousand years.

কার্ল! তুমি নিরাপদ নও যদি, আমিও তো নিরাপদ নই,
এখন সভাই তুমি যাও চাষুড়ুষ্
সমবের সর্বপ্রাণী মাংসের কোলে—
আর দারা, এই জন্তে, ছুটে গেল রাস্তার বরফে
অভিভূত কিন্নিবার আকস্মিক ঝলকানি খেয়ে
উপরন্তু মাপদণ্ড কম্পমান সমতল ক্ষেত্রে
নামের তালিকা কর্ম ব্যবহার অপরসাধনে,
সমর ও স্থান মাঝে পেতে দিয়ে শারীরিক ফাঁদ
যু চাক্ষুষ ছায়া মাঝে ধরেছিল আত্মা-দেবদূত
যাচালো মৌলিক ক্রিয়া বিশেষ্য-চেতনা
সত্য শিব সুন্দরের শিহরণ সাথে,
আবার মোতুসঙ্কপে সৃষ্টি ক'রে বাক্যের রচনা
মেপে নিয়ে মানুষের দীন ক্লান্ত ভাষা
দাঁড়িয়ে তোমার সামনে বাক্যহীন লজ্জাবনত মুখে

প্রত্যাখ্যাত তবু আত্মা দেহ থেকে ছিঁড়ে
লম্বতি আমার চিত্তা-হ্রদ মগ্ন যাবে,
বেবদূতী অন্ধকূপে পরাজিত সময়ের কাছে
তবুও এখন তারা এখানেই ব'সে চ'লে যায়
যা বলা হবত যেত মৃত্যুপরে অন্য সময়
আবার আসলো যারা ভুতুড়ে আলোর সাজ পরিধান ক'রে
পুনর্জন্ম নিয়ে যায় সোনালী হাওয়ায়
মন্ত্রমনা আমেরিকা প্রেমকান্না সানাই-এ ফুঁ দিয়ে
কাঁপিয়ে সমগ্র দেশ নগরীর অন্তিম বেতার
'এলি এলি লামা লামা সাবাক্তানি' সুরে,
জীবনের কবিতায় সোটা প্রাণ নিজ দেহ থেকে
ছিঁড়ে হব কুটিকুটি, খাওবা যাবে হাজার বছর।

"What is going to come of an attitude like this?..... The end result must be the desperation of shipwreck—the despair, the orgies, ultimately the cannibalism of a lost lifeboat. I believe that most of an entire generation will go to ruin—the ruin of Celine, Artaud, Rimbaud, voluntarily, even enthusiastically. What will happen afterwards I don't know, but for the next ten years or so we are going to have to cope with the youth we, my generation, put through the atom smasher. Social disengagement, artistic integrity, voluntary poverty—these are powerful virtues and may pull them through, but they are not the virtues we tried to inculcate—rather they are the exact opposite.....Against the ruin of the world, there is only one defense—the creative act. ....."

—Kenneth Rexroth

• "*Oh Lord why hast Thou forsaken me?*"

মধুসূদনের সামাজিক প্রতীতি ও তাঁর প্রহসন

জীবেন্দ্র সিংহ রায়

বিবেকবান সামাজিকের বস্তুবোধ আর সহৃদয় সাহিত্যিকের সামাজিক প্রতীতির রূপ এক নয়। অথচ তার ভিত্তি অভিন্ন! একজন মানুষ চারপাশে তাকিয়ে সমাজের যে চেহারা দেখতে পায়, তার একটা ব্যবহারিক হিসেব দেওয়া কঠিন নয়। এবং সে হিসেবে চোখের সাক্ষ্য প্রধান। তবে চোখের দ্বারা সংগৃহীত তথ্যগুলির মানসিক বিন্যাসের ওপরই সমাজচিত্রের পূর্ণাঙ্গতা নির্ভর করে। তাই সামাজিকের চোখের দেউড়ি পেরিয়ে তার মনের ভেতর প্রবেশ করলে দেখা যায় একটা বস্তুগ্রাহ্য চেতনা। এই চেতনা লেজুড়ো মানুষের সামাজিক ছবিটাকে স্পষ্ট করে তোলে বলেই তাকে সংশ্লেষণধর্মী (synthetic) বলা যায়।

চাক্ষুষ প্রমাণগুলিকে মানসিক চেতনার সংশ্লেষণ সূত্রে বিন্যস্ত করে নিতে পারলেই সামাজিক অভিজ্ঞতার জন্ম হয়, সন্দেহ নেই—তবু সেই বস্তুবোধ বহির্মুখী, অন্তরাত্মার খাজনা জুগিয়েই তার সার্থকতা, বস্তুজগৎ দ্বান্দ্বিক জড়বস্তুদের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বা ঐতিহাসিক হিসেব (Dialectical or Historical Materialism) পর্যন্ত তার যৌক্তি। অর্থাৎ চারিদিকের আবেষ্টনীর মধ্যে যে বাস্তব তথ্য (আর্থিক-রাষ্ট্রিক-সামাজিক তথ্য) মেলে তা-ই হচ্ছে বিবেকবানের বস্তুবোধের 'মূল' (base) এবং সেই গাঁটছড়ার বন্ধন থেকে তার আর মুক্তি নেই। অবশ্য তার প্রয়োজনই বা কোথায়?

অন্যদিকে সাহিত্যিকের সামাজিক প্রতীতিতে এই বাস্তব 'কেন' অস্বীকৃত না হলেও তার বন্ধন প্রত্যক্ষভাবে মেনে নেওয়া হয়না। আর্থিক-রাষ্ট্রিক-সামাজিক ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠে সাহিত্যের 'মূল' (super structure)। এই 'মূলের' সঙ্গে 'মূলের' বা 'কেনের' সঙ্গে 'সুপারষ্ট্রাক্চারের' সম্পর্ক যেন জটিল এবং সেই জটিলতা নিরসন করতে পারলেই সামাজিকের বস্তুবোধ ও সাহিত্যিকের সামাজিক প্রতীতির ভেদ নির্ণয় করা সহজ হয়।

'কেনের' সঙ্গে 'সুপারষ্ট্রাক্চারের' সম্পর্ক নির্ণয় সাহিত্যের সৃষ্টি-রহস্য উদ্ঘাটনের সামান্তর। শিল্পীর সৃষ্টির জগৎ নিঃসন্দেহে অলৌকিক মায়ার

জগৎ, সুতরাং তা অনির্দেশ্য—এ-জাতীয় কথা বললে সমস্যাটাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে হয়তো দেখা যাবে, একটা কিছু অনির্দেশ্যকে মেনে নিতে হচ্ছে। তবু সাহিত্যের সৃষ্টির মধ্যে যেটুকু বাস্তবিকতা তা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। অনেকে বলেন, পঙ্কজের সেকত পাঁকে প্রোথিত থাকলেও ফুলের রঙে গন্ধে সেই পাঁকের কোন ছাপ থাকে না। অথচ সেই পাঁকের বন্ধন অস্বীকার করেও পঙ্কজ আপনাতে আপনি বিকশিত হতে পারে না। সাহিত্যিকের চেতনাগ্রাহ্য সামাজিক-আর্থিক-রাষ্ট্রিক 'বেসের' সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির 'সুপারষ্ট্রাকচারেরও' ঠিক এই ধরণের সম্বন্ধ।

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত থেকেই আবার একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। তা হচ্ছে —সাহিত্যিক কোন্ কৌশলে আর্থিক-রাষ্ট্রিক-সামাজিক ভিত্তির ওপর সাহিত্যের শিরঃসৌধ নির্মাণ করেন? কি জাতীয় প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পঙ্কের বন্ধনের মধ্যেও পঙ্কজ আপনাকে প্রকাশ করে?

গাছের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি জানিনে, কিন্তু তার একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা জানি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, প্রত্যেক গাছেরই একটা নিজস্ব প্রাণ-প্রবর্তনা বা স্বাভাবিকী বলক্রিয়া আছে এবং সেই পৃথক পৃথক নিহিতার্থেই বটের বটত্ব বা পঙ্কজের পঙ্কজত্ব। এ থেকে আর একটু অগ্রসর হয়ে বলা যায়, প্রত্যেক গাছের নিজস্ব প্রাণ-প্রবর্তনা বা স্বাভাবিকী বলক্রিয়াই গাছের মূলের রসকে ফুলের রসে পরিণত করে। তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাহিত্যিকের মনই হচ্ছে সেই স্বাভাবিকী বলক্রিয়া এবং তারই সংস্পর্শে ও প্রভাবে আর্থিক-রাষ্ট্রিক-সামাজিক তথ্য সাহিত্যের সত্যে পরিণত হয়। তাই প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, 'ইন্দ্রিয় যে উপকরণ সংগ্রহ করে মন তাই নিয়ে কারিগরি করে। এই বর্ণ-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শময় জগতে যে ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ে মন সুখলাভ করে তবু তাই আর্টের উপকরণ।'২ রবীন্দ্রনাথের মতও অনুরূপ—'স্বভাবত বিশ্বজগৎ আমাদের কাছে তার বিশুদ্ধ প্রাকৃতিকভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু মানুষ তো কেবল প্রাকৃতিক নয়, সে মানসিক। মানুষ তাই বিশ্বের উপর অহরহ আপন মন প্রয়োগ করতে থাকে। বস্তুবিশ্বের সঙ্গে মনের সামঞ্জস্য ঘটিয়ে তোলে। জগৎটা মানুষের ভাবানুষঙ্গে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। মানুষের ব্যক্তিরূপের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির মানবিক পরিণতির পরিবর্তন পরিবর্ধন ঘটে।'৩ অর্থাৎ বিশ্বের প্রাকৃতিকতার (যার মধ্যে আর্থিক-রাষ্ট্রিক-

সামাজিক উপকরণ আছে) সাহিত্যিকের মন যতখানি সুখদাত করে, যতখানি তাকে সে প্রভাবিত করে, ঠিক ততখানিই তা সাহিত্যের বিষয় হয়ে ওঠে। সুতরাং মনের কারিগরিতেই আর্থিক-রাষ্ট্রিক-সামাজিক 'রেস' থেকে সাহিত্যের সুপারস্ট্রাক্চারের নির্মিতি, মনই সেই পাতনযন্ত্র যার মাধ্যমিকতায় বস্তুবিশ্ব 'শুদ্ধ' হয়ে সাহিত্যের খোলনলচেয়ারে আসন লাভ করে। সুতরাং একথা মেনে নিতেই হবে যে, সাহিত্যসৃষ্টির প্রক্রিয়ায় বিষয়বস্তুর কোন-না-কোন প্রকার শুদ্ধি (sublimation) বা রসগত পরিণতি ঘটে। অবশ্য সাহিত্যিকের aesthetic faculty ইন্দ্রিয়গোচর বিষয় থেকে aesthetic quality নিষ্কাশিত করেই এই শুদ্ধি ঘটায় না, ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ও বিশেষ বিশেষ সংশ্লিষ্টিতে ভালোমন্দ মেশানো জড়রূপেই অন্তরাবেগের কাছে মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে। এবং তা-ও শুদ্ধি না হোক রস-পরিণতি তো (literary idealisation) বটেই।

সুতরাং আমরা দেখতে পেলাম, সাহিত্যিকের মনের কারিগরিতে আর্থিক-রাষ্ট্রিক-সামাজিক উপকরণ শুদ্ধ হয়ে বা রস-পরিণতি নিয়ে সাহিত্য গড়ে তোলে। আর তাই বিবেকবান সামাজিকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সাহিত্যিকের সামাজিক প্রতীতির একটা পার্থক্য আছে। সামাজিকের অভিজ্ঞতা জড়-ধর্মী ও বহির্মুখী, সাহিত্যিকের সামাজিক প্রতীতি ভাবধর্মী ও অন্তর্মুখী। একে বিষয়প্রধান, অন্যে বিষয়ী বা ব্যক্তিপ্রধান। সামাজিকের লক্ষ্য অভিজ্ঞতার পূর্ণতা, সাহিত্যিকের সাধনা অভিজ্ঞতার রস-পরিণতি। শুধু তা-ই নয়, সামাজিকের বস্তুবোধ তাঁর চিন্তা ও ক্রিয়াকর্মে সর্বত্র বিশ্লেষণ-যোগ্য, কিন্তু সাহিত্যিকের সামাজিক প্রতীতি তাঁর উচ্চতর সৃষ্টিতে প্রচ্ছন্ন দূরবীক্ষ্য এবং তার ব্যবহারিক হিসেবও সর্বত্র সহজ নয়। অবশ্য নীচু স্তরের সাহিত্যে সামাজিক অভিজ্ঞতার প্রকাশ যতটা থাকে, শিল্পীয় সামাজিক প্রতীতির স্বাক্ষর ততটা না-ও থাকতে পারে।

॥ ২ ॥

মধুসূদনের প্রহসন দুটি বিচারের আগে এ-ভূমিকা দরকার। কারণ আলোচনার আরম্ভেই যে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে চাই, তার মীমাংসার জন্য এই তত্ত্বগত আলোচনার প্রয়োজন ছিলো। প্রশ্নটা হচ্ছে, মধুসূদনের

প্রহসনে কি শুধু সমসাময়িক সামাজিক অভিজ্ঞতার বস্তুতায় আছে না সত্যদর্শী সাহিত্যিকের সামাজিক প্রতীতির রস-পরিণতি ঘটেছে? আর এই প্রশ্নের উত্তরের ওপরই নির্ভর করছে তাঁর রচনা দুটির আপেক্ষিক উৎকর্ষ বা কালাতিশায়ী সার্থকতা।

'একেই কি বলে সভ্যতা?' (১৮৬০) প্রহসনটির ঘটনাস্থল কলকাতা। ইয়ং বেঙ্গল বা নবকুমারের চরিত্রদোষ পরিস্ফুটনই এর রচনার উদ্দেশ্য। নবকুমারের বাবা গোঁড়া হিন্দু, সরল প্রকৃতির মানুষ। তাই নবকুমার ও তার বন্ধু কালীনাথ সাধু ও নিরীহ সেজে তাকে প্রতারণা করতে দ্বিধা করেনা। 'অকালের সাধন' বুড়োকে এড়িয়ে তারা মদ খায়, তাদের বিলাসের ক্ষেত্রকে সংস্কৃত-বিদ্যা ও ধর্মশাস্ত্র অনুশীলনের পীঠস্থান বলে চালিয়ে দিয়ে তারা স্ফূর্তির অবসর খোঁজে। অথচ কালীনাথ শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা ও গীতগোবিন্দের নাম পর্যন্ত শোনেনি। তারপর দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে দেখতে পাই, সিকদারপাড়া ষ্ট্রীটের একটি চিত্তাকর্ষক চলচ্চিত্র। এতো বিশেষ একটি সড়ক মাত্র নয়, যেন ইয়ং বেঙ্গল বিস্তৃত বাঙলা দেশেরই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। কর্তাবাবু ছেলে নবকুমারকে জানেন: আরও জানেন, কলকাতা সহর বিষম ঠাঁই। তাই তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে রাজীবকে পাঠালেন সিকদারপাড়া ষ্ট্রীটে। কি দেখলেন তিনি? রাস্তাবিস্তার সরল কৌতুক, বেলাবাল মাতালের উষ্মা, চৌকিদারের বিড়ম্বনা, অর্ধপিশাচ সার্জেন্টের বজ্জাতি, মদবাহী বুটিয়াদের আক্ষেপ, খেমটাওয়ালীদের কটি-বিকার ইত্যাদি মিলে যেন একটা রক্তমাংস আবহাওয়া।

তারপর পথ থেকে ঘর, সিকদার পাড়া ষ্ট্রীট থেকে জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার আসর। কয়েকজন বাবুর সমাবেশে আড্ডাটি জমজমাট। চৈতন্যবাবু চেয়ারম্যান হলেন এবং বিরাজের 'গঙ্গাজল' ছিটিয়ে আসরটাকে 'শুদ্ধ' করে তোলার ব্যবস্থা করলেন। নতুন চেয়ারম্যানের স্বাস্থ্য পান করা হলো। তারপর খেমটাওয়ালীদের নাচ, মুহুর্মুহু মদ্যপান। কিছু বাস্তচিত্তের পর সভার বক্তৃতা করতে উঠলো নবকুমার। তার মুখে শোনা গেলো— জ্ঞানের বাতির দ্বারা তাদের অন্ধকার ঘুচে হয়েছে, তারা 'মুপারষ্টিসনের শিকলি কেটে ফ্রি হয়েছে,' পুত্তলিকা দেখে হাই তোলাতে আর স্বীকার করে না তারা। 'মেয়েদের এডুকেট কর, তাদের স্বাধীনতা দেও, জাত-

ভেব ভজাৎ কর'—এই সব হচ্ছে তাদের মূলমন্ত্র। তারা সব কিছুই করে, এমন কি মদ খায়—ইন্ দি নেম্ অব ক্রিস্তান্। শেষ গর্ভাঙ্কে অক্ষয়মহলের দৃশ্য। ঘরের মেয়েরা তাস খেলে, একে অন্যকে রসিকতায় কাবা ছুঁতে যায়ে, এমন কি ভাইবোনকে নিয়ে কদর্য ঠাট্টা করতে দ্বিধা করে না। তারপর মঞ্চসূত্রে প্রত্যাগত ঘাতাল নবকুমারের বেলাল্লাপনা। কর্তা ঘুমুলেন সবই, কলির রাজধানী কলকাতা ছেড়ে সকলকে নিয়ে বৃন্দাবনে যাওয়ার সঙ্কল্প করলেন। নবকুমারের স্ত্রী হরকামিনীর আক্ষেপোক্তিতে নাটকের পরিসমাপ্তি হলো—'বেহায়ারা আবার বলে কি, যে আমরা সাহেবদের মতন সভ্য হয়েছি। হা আমার পোড়া কপাল! মদ-মাস খেয়ে ঢলাঢলি করলেই কি সভ্য হয়?—একেই কি বলে সভ্যতা'।

কাহিনীর এই বিশ্লেষণে নববাবুদের একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাই। চিত্রাচরিত পারিবারিক শাসন তারা মানে না; সমাজ আর ধর্ম তাদের অবজ্ঞার বিষয়; মদ আর মেয়েমানুষ তাদের বিলাস; সাম্য, স্বাধীনতা ও শিক্ষার কথা নববাবুদের মুখের বুলি। সমসাময়িক অন্যান্য সাক্ষ্য থেকেও আমরা এই রকমের একটা ধারণা পাই। রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলতে দ্বিধা করেননি —'তাহা যে অবিকল হইয়াছে ইহার প্রমাণার্থে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, ইহাতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে প্রায়ঃ তৎসমুদায়ই আমাদিগের জানিত কোন না কোন বাবু দ্বারা আচরিত হইয়াছে।' আর প্রহসনটিতে নববাবুদের কথা যথিষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে বলেই তারা এর অভিনয় বন্ধ করে দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। অতএব 'একেই কি বলে সভ্যতায়' মধুসূদনের সত্যদর্শন ও সামাজিক অভিজ্ঞতার কোন ফাঁকি নেই। আর এই বিষয়ে তাঁর চেয়ে বেশী প্রত্যক্ষ জ্ঞান আর কার ছিলো? তিনি নিজেও ছিলেন ইয়ং বেঙ্গলেরই একজন। আপন বোধ ও বুদ্ধিতে, সংবেদনশীল চেতনায়, সমগ্র সত্তার অন্তর্ভেদ আবাহে একটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ছাপ ছিলো বলেই মধুসূদনের চিত্র-দর্শন অন্তরঙ্গ ও নিষ্ঠাসম্পন্ন। একজন ব্যক্তি বা একটা সমাজকে দু'ভাবে চেনা যায়—হয় দূরে দাঁড়িয়ে, নয় কাছে গিয়ে। মধুসূদন শুধু কাছে গিয়ে ইয়ং বেঙ্গলকে দেখেননি, সমগ্র জীবন দিয়ে তার সঙ্গে পরিচয় করেছেন। তাই তাঁর সামাজিক অভিজ্ঞতা অল্প মূল্যে কেনা নয়, স্পর্শকাতর ইন্দ্রিয় আর সজীব চৈতন্যের

বেদীতে তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা। হয়তো মাঝে মাঝে নাট্যকারের বক্তব্য নিষ্ঠুর সত্যভাষণ হয়ে উঠেছে, তবু তা মিথ্যার বেসাতির চেয়ে সমাদরণীয়। এখানে মধুসূদন আর যা-ই করুন, সত্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেননি এবং সে অর্থেই তাঁর সত্যদর্শন আত্মস্বীকারই নামান্তর মাত্র।

॥ ৩ ॥

'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) অন্য প্রহসনটির মতো মধুসূদনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত নয়। নবকুমারে নাট্যকারের আত্ম-ক্ষেপ (self-projection) ঘটেছে, সন্দেহ নেই; কিন্তু 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'তে তিনি একটু দূরে দাঁড়িয়ে সামাজিক সত্যের মুখদর্শন করেছেন। তবে সে ব্যবধান ঐতিহাসিকের দূরত্ব নয়, নিরাসক্ত দ্রষ্টার দূরত্ব। এবং সেই দূরত্বিত সাধনায় সামাজিক জ্ঞানের ছাড়পত্র নিয়েই সত্যের আনাগোনা ঘটেছে। তরঙ্গের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে নয়, তীরে দাঁড়িয়েই তিনি সমুদ্রের সঙ্গে বোধ ও বুদ্ধির সম্পর্ক স্থাপন করেছেন।

ভক্তপ্রসাদ জমিদার, কিন্তু অর্ধপিশাচ। প্রজা হামিকের ফসল হোক বা না হোক তাতে তার কিছু যায় আসে না। কোম্পানীর নামে সে গরীব মানুষকে শোষণ করে বেড়ায়, অথচ মেয়েমানুষের জন্য অর্থ ব্যয়ে তার কোন কার্পণ্য নেই। পরস্ত্রী পক্ষীর রূপ দেখে সে আবেশে ভারত-চন্দ্রের কবিতা আবৃত্তি করে। বাইরে ভক্তপ্রসাদ পরম বৈষ্ণব, আহারে-বিহারে বেশ বাছ-বিচার; কিন্তু গোপনে যবনী-সংসর্গে তার কিছুমাত্র অরুচি নেই। কারণ 'হাঁ, স্ত্রীলোক—তাদের আবার জাত কি?' তাই ভক্তপ্রসাদ কুটনী পাঠিয়ে হামিকের স্ত্রী ফতিমাকে হাত করতে চায়। স্বামীর অনুমতি নিয়ে ফতিমা পুকুরের ধারে কালা শিবমন্দিরে যায়, কিন্তু বাচস্পতি (আর একজন নিষ্পেষিত ব্যক্তি) আর হামিক আড়ালে লুকিয়ে থাকে। এদিকে ভক্তপ্রসাদের সময় আর কাটতে চায় না,· সারাদিনটাই তার কাছে অনর্থক দীর্ঘ বলে মনে হয়। তারপর সন্ধ্যা হতে না হতেই যুবকের মতো সাজ-সজ্জা করে অভিসারে রওনা হয়ে যায়। শেষ দৃশ্যে হামিকের কাছে হাতে নাতে ধরা পড়ে ভক্তপ্রসাদের মনঃপীড়া আর অর্থনাশের অন্ত রইলো

P21224

না। তাই তার শেষ প্রার্থনা—'এখন নারায়ণের কাছে এই প্রার্থনা করি যে, এমন দুর্গতি যেন আমার আর কখনো না ঘটে।'

রামগতি ন্যায়রত্ন বলেছেন, এই কাহিনী-বিন্যাসে সত্যের অপলাপ হয়েছে। কিন্তু আমরা ভিন্নমত পোষণ করি। কারণ বাঙলাদেশের সমাজের আনাচে কানাচে ভক্ত-প্রসাদের উত্তরপুরুষরা আজও বিরাজিত, 'বামুনের মেয়ে'র চাটুজ্জে মশায় তার প্রমাণ। 'একেই কি বলে সভ্যতা?' সমাজের এক সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্রূপের শাণিত অস্ত্রচালনার বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় এই দ্বিতীয় প্রহসনখানি রচিত—এ-মতও অশ্রদ্ধেয়। মধুসূদনের আর যাই না থাক পৌরুষের অভাব ছিলো না। আর তাই ক্ষুণ্ণিত ইয়ং বেঙ্গলকে খুশি করবার অপচীয় মনোভাবে 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া' জন্ম হতে পারেনা। মধুসূদনের জীবনে ভ্রান্তির অভাব ছিলো না, কিন্তু সাহিত্যের আসরে তিনি অভ্রান্ত। তাঁর প্রহসনেও একটা স্বচ্ছিক্ষম আত্মবিশ্বাস ও নিগূঢ় শিল্পনিষ্ঠা বিবেকবান সামাজিকের চেতনার পটে প্রকাশ-তৎপর হয়ে উঠেছে।

॥ ৪ ॥

সুতরাং মধুসূদনের প্রহসন দুটিতে সত্যদর্শী সামাজিকের দায়িত্ব স্বীকৃত। নাট্যকারের সামাজিক অভিজ্ঞতা কখনও ব্যক্তিগত প্রক্ষেপের অন্তরঙ্গতায়, কখনও বা নিরাসক্ত দৃষ্টির দূরত্বে তাৎপর্যবহ। কিন্তু, আগেই বলেছি, সাহিত্যিকের কর্তব্য এইখানেই শেষ হতে পারে না। সামাজিক অভিজ্ঞতার বস্তুপুঞ্জভারের ওপর মধুসূদনের মনের প্রযোগ কোথায় ও কতখানি এবং অন্তরাবেগের কাছেই বা তার আবেদন কতটুকু, তারই ওপর তাঁর রচনা দুটির সার্থকতা নির্ভর করছে।

বিশেষ ঘটনা বা কাহিনীর ওপর সাহিত্যিক মনের প্রয়োগে নির্বিশেষ সত্য নিষ্কাশিত হয়। এককালীন সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসে চিরকালীন সমস্যা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আধুনিক সমস্যা বলে কোন পদার্থ নেই, মানুষের সব গুরুতর সমস্যাই চিরকালের। রত্নাকরের গল্পটার মধ্যেই তার প্রমাণ পাই। রত্নাকর গোড়ায় ছিলেন দস্যু, তারপর দস্যুবৃত্তি ছেড়ে ভক্ত হলেন রামের। অর্থাৎ বর্বরবিদ্যার প্রভাব এড়িয়ে কবিবিদ্যার যখন দীক্ষা দিলেন তখনি সুন্দরের আশীর্বাদে তাঁর বীণা বাজল।'[৪] এই যে বিশেষ

সত্য থেকে নির্বিশেষ সত্যের প্রকাশ, তার যাত্রা স্তম্ভিত হিলো বাল্মীকির মনের রসায়নে। মোলিয়ারের ব্যঙ্গনাটকেও চতুর্দশ লুইয়ের কালের বিশেষ বিশেষ ঘটনা আছে—কিন্তু আজকের দিনেও সেই ঘটনাগুলির বিশেষ তাৎপর্য না থাকলেও কতগুলি নির্বিশেষ ব্যঞ্জনা-সত্যের জন্যই তা আজও মূল্যবান। সাধুতার খোলসে ভণ্ডতা, প্রেমের মুখে আত্মপরতা, বীরত্বের মণ্ডনে বীর্যহীনতা কিংবা বিদ্যার গর্বে মূর্খতার লজ্জাকর অসঙ্গতিই তো মোলিয়ারের নাটকগুলির চিরকালের অন্তরবার্তা।৫ অথচ সমসাময়িক সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অভিজ্ঞতার মধ্যেই তাদের জন্ম। এ থেকেই সিদ্ধান্ত করতে হয়, বিবেকবান সাধারণিকের অভিজ্ঞতাকে আপন মনের প্রয়োগে সহৃদয় সাহিত্যিক সুলভ সামাজিক প্রতীতিতে পরিণত করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর রসগত পরিণতিতে এমন নির্বিশেষ সত্যের দ্যোতনা সম্ভবপর হয়ে উঠেছে।

মধুসূদনের প্রহসন দুটির বিশেষ সমস্যার বিশ্লেষণ আমরা করেছি। কিন্তু সেই বিশেষ বিশেষ সমস্যার মধ্যে স্তম্ভিত কোন্ কোন্ নির্বিশেষ ব্যঞ্জনা তা-ই এবার বিচার করে দেখতে হবে। খ্রিস্টে ইয়ং বেঙ্গলের একজন হয়েও তিনি নবকুমারকে আঘাত করতে ছাড়েন নি; কারণ তাঁর মন বিশাচর ছিলো না, কাপট্য তাঁর ধাতে সইতো না। যেখানে সত্যের মুখোশ পরে মিথ্যার রাজত্ব, সাধুতাকে ফাঁকি দিয়ে ব্যভিচারের কারবার—সেখানে মধুসূদনের সাহিত্যিক মন বিদ্রূপক। তাঁর শিল্পীমানসের এই নির্বিশেষ সত্যসন্ধিৎসাই 'একেই কি বলে সভ্যতা?' মুখর হয়ে উঠেছে। অথচ ব্যক্তিগত আক্রোশের প্রশ্ন ছিলো না, নবকুমারের জন্যই নবকুমারকে তিনি আক্রমণ করেননি। আর সংসারে নবকুমারেরা যুগে যুগেই দেখা দেয়—হয়তো ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে, তবু তারা চিরকালই আছে। এইভাবে বিচার বিশ্লেষণ করলে মধুসূদনের মনের ধাঁচটি ধরতে পারি। দ্বিতীয়তঃ অত্যন্ত সংযত হলেও সহানুভূতি নাট্যকারের বিদ্রূপাত্মক মনোভাবের সহগ। হল ফোটাতে গিয়েও তিনি শেষ পর্যন্ত ঠিক নির্মম হতে পারেন নি। মাতাল নবকুমার বাড়িতে এসে হাঙ্গামা বাধিয়ে তুলেছে, কর্তার কানে পৌঁছোলে অনর্থ ঘটাতে পারে মনে করে সবাই সন্ত্রস্ত। কিন্তু কর্তার প্রতিক্রিয়া দেখুন—

'কাল প্রাতেই আমি তোমাদের সকলকে নিয়ে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করবো। এ লক্ষীছাড়াকে আর এখানে রেখে কাজ নেই। চল, আমরা যাই, এ বাসরটা একটু ঘুমুক।'

এখানে কার কণ্ঠস্বর শোনা গেলো? ধর্মনিষ্ঠ সাধুচরিত্র খোঁড়া হিন্দু কর্তা মশায়ের? না, মমতাশীল কবিকণ্ঠই এখানে ধ্বনিত। 'লক্ষীছাড়া,' ও 'বাসর' শব্দ দুটির সংস্থান মমতাসূচক। এখানে লেখকের বক্তব্য হচ্ছে: নবকুমারের স্বভাবের জন্যই তাকে বিদ্রূপ করতে হয়েছে। তার ওপর আমার কোন অহেতুক বিদ্বেষ নেই। নবকুমার শান্তি পাক, স্বস্তি পাক, নবকুমার সুখুক—এই তো আমার মনের একমাত্র অভিলাষ।

'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'তে নাট্যকার অন্তপথ নিয়েছেন। সেখানে তাঁর সহানুভূতি তাঁকে নিয়ে গেছে আরেকটু এগিয়ে। ভক্তপ্রসাদের পরিবর্তনে তিনি শুধু poetic justice-ই দেখাননি, একটা সরল কৌতুকও রসরসের মধ্যে সমস্ত কটুকষায় স্বাদ মিলিয়ে দিয়ে নিজের সহৃদয় চিত্তবৃত্তির প্রমাণ দিয়েছেন। এই ক্ষমাসুন্দর মনোভাবই প্রহসনটির একবারে শেষে একটি কৌতুককর ছড়ায় শীতল পাটি বিছিয়ে দিয়ে ভক্তপ্রসাদের মর্ম-জ্বালাকে সহনীয় করে তুলেছে—অন্যথায় দুশো টাকা খেসারত দিয়েই সম্পটপ্রবর নিস্তার পেতেন না, পেটে পিঠে উত্তম মধ্যমও পেতেন।

সুতরাং আমার সিদ্ধান্ত, মধুসূদনের প্রহসন দুটি শুধু বিবেকবান সামাজিকের বস্তুবোধের দিক থেকে লক্ষণীয় নয়, সহৃদয় সাহিত্যিকের সামাজিক প্রতীতির দিক থেকেও মোটামুটি বিশ্লেষণীয়। সামাজিক অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যিক প্রতীতিতে পরিণত করতে পেরেছিলেন বলেই কর্তামশায় ('একেই কি বলে সভ্যতা?') ও বাচস্পতি ('বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ') একই রক্ষণশীল আদর্শের ধারক হয়েও একে অন্যের চেয়ে মহত্তর হয়ে উঠেছে, একই ছাঁচে ঢালাই হয়ে, ব্যক্তিচরিত্র হারিয়ে একটা বিশেষ শ্রেণীর প্রতীক হয়ে উঠেনি। মধুসূদনের সাহিত্যিক মনের রসায়নেই প্রহসন দুটি শ্রেণীগত মানুষের কাহিনীতে নয়, 'ব্যক্তিগত মানুষ আর মানুষগত শ্রেণীর' ইতিকথায় পরিণত হয়েছে। সত্যের কাছে হিন্দু-মুসলমান কোন ভেদাভেদ থাকতে পারেনা; মধুসূদনের সাহিত্যের সত্যেও তাই হিন্দুর ক্ষমা নেই, অথচ সৎ মুসলমানের সমাদর আছে। শুধু সামাজিক অভিজ্ঞতাকে পুঁজি

করে অগ্রসর হলে মধুসূদন কখনও এমন অপক্ষপাত মানবতার পূজারী হতে পারতেন কি ?

তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে। প্রহসন বলেই রচনা দুটির উদ্দেশ্যমূলকতা অত্যন্ত স্পষ্ট। আর উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্যে বিবেকবান সামাজিকের অভিজ্ঞতা স্বভাবতঃই তেমন শুদ্ধি (sublimation) লাভ করতে পারে না ; কারণ প্রহসনকারের সামাজিক অভিজ্ঞতা তাঁর মনের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশেষভাবে শুদ্ধি লাভ করলে তার উদ্দেশ্যমূলকতা নষ্ট হয়ে যায়। তা অতিপ্রেত আলোড়ন বা আঘাত সৃষ্টিও করতে পারে না। ফলে প্রহসন মাত্রই তার লক্ষ্য অব্যর্থ রাখতে গিয়ে একটা নীচু স্তরের সাহিত্যিক সৃষ্টিতে পরিণত হয় এবং তার স্থূলতাও অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়ে। এই কারণেই মধুসূদনের প্রহসনে উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যিক সৃষ্টির মতো সামাজিক অভিজ্ঞতার পরিপূর্ণ রূপ-পরিণতি বা সাহিত্যিকের সামাজিক প্রতীতির (যার বিষয়ে প্রবন্ধের আরম্ভে আলোচনা করা হয়েছে) রসোজ্জ্বল অখণ্ড প্রকাশ আশা করা উচিত নয়।

১। বাঙলা সাহিত্য ও মানবস্বীকৃতি—গোপাল হালদার।

২। তেল, নুন, লকড়ি—প্রমথ চৌধুরী।

৩। সাহিত্যের পথে—রবীন্দ্রনাথ।

৪। রক্ত-করবী (গ্রন্থপরিচয়)—রবীন্দ্রনাথ।

৫। ফরাসী সাহিত্যের স্বর্ণপরিচয়—প্রমথ চৌধুরী ও The plays of Moliere—with an English Translation and Notes by A. R. Waller.

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে যুগসংকেত

নিতাই বসু

বিভূতিভূষণের বই পড়ার আগে বিভূতিভূষণের কথা মনে পড়ে যায়। নিতান্ত-নিরীহ, সরল, আত্মভোলা পার্শ্বিক। ঠিক আমাদের গ্রামে বর্ণিত প্রাচীন কবিদের মতো। সুখে বিগতস্পৃহ, দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন। অন্তগ্রহ থেকে উৎক্ষিপ্ত এক ভাব-বিলাস কবিমানস।

রবীন্দ্র-পরবর্তী [redacted] মধ্যে ইনিই একমাত্র ব্যতিক্রম, সমকালীন সমাজ-চিন্তা [redacted] উদাসীন। বাইরের কোনো বস্তু স্বরূপের প্রচণ্ড ধাক্কায় অথবা রোমান্টিক রসকল্পনার উপযুক্ত ক্ষেত্রের অপ্রতুলে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধিত হয় নি, কেননা তাঁর প্রথম গ্রন্থই তাঁর জীবন-বেদ অথবা মর্ম-বাণী। হয়তো তিনি সমকালীন এক সমধর্মী কবির মতোই জানতেন যে,

> অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,
> যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশী আজ চোখে যারা :
> যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই
> পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
> যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি
> এখনও যাদের কাছে খাঁটি বলে মনে হয়
> মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
> শকুন ও শেয়ালের ঘাণ আজ তাদের হৃদয়।

(অদ্ভুত আঁধার এক : জীবনানন্দ দাশ)

কিন্তু এই 'অদ্ভুত আঁধার' থেকে সরে গিয়ে অথবা তাকে অস্বীকার করে বিভূতিবাবু সাহিত্য-সৃষ্টি করেন নি। তাহলে অন্তকারের সরীসৃপ-কুটিলতার বিরুদ্ধে তাঁর সাহিত্যে বিদ্রোহের যথেষ্ট দৃষ্টান্ত থাকতো, যা লক্ষণীয়ভাবে অনুপস্থিত। তাঁর সৃষ্টির পটভূমি সমকালীন সমাজ-ব্যবস্থা নয়, রাজনৈতিক দেশকাল নয়, এমন কি উত্তরতিরিশের সাহিত্যবিপ্লবের সুস্পষ্ট কোনো ছাপও তাতে নেই। অচিন্ত্য-প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধদেব-গোষ্ঠির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট

না থেকেও যাঁরা তখন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সাহিত্য সৃষ্টি করছিলেন, এক দশকেই সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়েছিলো যে এই মেশিনযুগীয়দের মতো কলোলাহুসংগে অধিই। কিন্তু বিভূতিভূষণ নির্বিকার, নির্মম, নিঃসংগ।

বাংলার মাঠ-ঘাট, পথ-প্রান্তর থেকে বিভূতিভূষণ যে জীবনের কণিকা আহরণ করে এনে আমাদের পরিবেশন করেছেন, তা রাজনীতি নির্ভর বা অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত নয়। রাজনৈতিক পটপরিবর্তন পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো নতুন ঘটনা নয়, অর্থনৈতিক কাঠামোও এই পরিবর্তনের অনুসারী। কিন্তু রাজনীতি ও অর্থনীতির সংগে মানব-মানবের অংগাংগী সম্পর্ক স্বীকার করে নিলে যে চরিত্র সৃষ্টি করা সম্ভব, ঠিক সেই রীতির উপন্যাসনাথ তাঁর প্রবণতা ছিলো না। তাঁর সৃষ্টিতে কোনো মতবাদের প্রচার বা বিরুদ্ধ ঘটনার বিবরণ ও বিবরণের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যই চোখে পড়ে। [illegible]ন্ এর কথায় :

—I don't think that either politics or philosophy are suitable material for the genuine story-teller. They clog the narrative and intefere with the action. And, after all, it is narrative and action which distinguish fictions from other forms of writing." (The Observer, Nov. 10., 1957).

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, বিভূতিভূষণের প্রত্যেকটি বিখ্যাত গ্রন্থে কোনো রাজনৈতিক ঘটনার বিন্দুমাত্র আভাস নেই। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমকালীন ঘটনাকে এড়িয়ে সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস বিশ্বসাহিত্যে বিরল। সাহিত্যের অন্তরালে সাহিত্যিকের নিজস্ব একটা জীবন আছে, যে জীবনে তিনি কোনো রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী, সামাজিক পরিবর্তনের সুচেতনভাবে অত্যন্ত সক্রিয়। প্রত্যক্ষভাবে ঘটনার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে সাহিত্যের মধ্যে প্রতিবিম্ব সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে, এমন কি, পরোক্ষ প্রভাবকে অস্বীকার করার মতো ধৃষ্টতাও অনেক সাহিত্যিকের থাকে না। কিন্তু বিভূতিভূষণের তা ছিলো এবং সম্ভবত এই কারণেই তাঁর সাহিত্যের সৃষ্টিকালীন প্রভাব-মূল্যের যেটুকু পরিচয় আমরা পেয়েছি, আমাদের উত্তরপুরুষের কাছে তার মূল্যায়নের রদবদলের কোনো সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। আমাদের গল্পকারদের গল্পের বিষয়বস্তু ও প্রকাশ-কৌশল যেমন যুগের আবহাওয়ার সংগে সমান্তরালবর্তী, অন্তত রবীন্দ্রোত্তর বাংলাসাহিত্যের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য, চরিত্রাংকনের বৈশিষ্ট্য ও আংগিকের অভিনবত্ব আমাদের গল্প-সাহিত্যের

ইতিহাসে যে নবযুগের সূচনা করেছে, বিভূতিভূষণ যেন তা থেকে অনেকটা দূরে সরে আছেন। তাঁর দূরত্বের কারণ আমাদের পাঠকদের সাম্প্রতিক রুচি, যার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো সম্ভব হয় নি তাঁর পক্ষে, কেননা তাঁর মানসিক গঠন এই রুচির প্রতিকূলতাচারী। তাঁর সহযাত্রী গল্পকারদের অভিজ্ঞতার বিশাল-ব্যাপ্ত পরিধি, মানব-চরিত্রের গূঢ়-গোপন, দুর্জ্ঞেয়, জটিল রহস্যের উন্মোচন প্রবণতা, দৃঢ় অথচ অপ্রাসংগিকতা বর্জিত আংগিকের প্রবর্তন তাঁর চিন্তা ও চৈতন্যে কোনো সাড়া জাগিয়েছিলো বলে মনে হয় না। তাঁর সমেরখানা গল্পগ্রন্থের মধ্যে মাত্র উনিশ-কুড়িটি গল্প ছাড়া আর কোনটিই সুখপাঠ্য নয়। এমন কি, বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব থাকলেও পরিবেশনের দায়িত্বহীন উদাসীন্য সত্যিই পীড়াদায়ক। তাঁর চেয়ে অনেক কমসংখ্যক গল্প লিখে গল্পকারহিসেবে তাঁর চেয়ে যথেষ্ট খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জন করেছেন, এরকম লেখকের সংখ্যা বর্তমান কালে বিরল নয়। তাঁর এমন কোনো একটি গল্পগ্রন্থ পড়ার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমাদের হয় নি, যে বই-এর পাঁচটি গল্প অন্তত উৎকৃষ্টভাবে রচিত। দু'টি বা তিনটি গল্প উৎকৃষ্ট হলেও বাকী গল্পগুলি নিতান্তই বর্ণনাত্মক, নীরস, একঘেয়ে। শুধু বিষয়বস্তুর প্রসংগে এই উক্তি না করে আংগিক-বিচারেও এ যুক্তি সমভাবে প্রযোজ্য। বিষয়বস্তুর দিক থেকে সমকালীনতাকে প্রশ্রয় না দিয়েও যে যথেষ্ট উৎকৃষ্ট গল্প রচনা করা যায়, তাঁর আগে প্রভাতকুমার ও রবীন্দ্রনাথই তা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের বহুবৈচিত্র্যময় গল্পভাণ্ডারের কথা অনালোচিত রেখেও প্রভাত-কুমার প্রসংগে এ মন্তব্য করা অসমীচীন নয় যে, উপজীব্যের বৈশিষ্ট্যে তিনি রবীন্দ্র-সমসাময়িক বাঙালী পাঠক সমাজের মন জয় করেন নি, করেছিলেন পরিবেশনার বৈচিত্র্যে। সমসাময়িক বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় প্রভাতকুমার ও বিভূতিভূষণ উভয়েই যুগান্ধ, হয়তো বা হিকেন স্লেণ্ডারের মতো অভিজ্ঞ, উদাসীন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে একদা স্লেণ্ডার বলেছিলেন :

I still feel that a writer is not made more contemporary by the fact that he is involved in contemporary social struggles. On the contrary, in the long run, these conflicts may appear to be exactly the things that distract him from the most significant reality of his time: London Magazine, 1957.

কিন্তু বিভূতিভূষণ যে ধরনের বিষয়বস্তুকে উপজীব্য করে নিয়ে গল্পগুলি

করেছেন, তার পরিবর্তন বা স্থায়িত্ব কোনো বিশেষ সমসাময়িক ঘটনার উপর নির্ভর করে না অথচ কাজকর্মে উপযুক্ত কৌশল হাতে না থাকায় তাঁর অধিকাংশ গল্পই আংশিক বিবর্তনের ইতিহাসে নাম-গোত্র পরিচয়হীন রয়ে গেলো। John Lehmann মনে করতেন যে কোনো সাহিত্যিকেরই উচিত নয় রাজনৈতিক ঘটনা-বিজড়িত কোনো কাহিনীকে উপজীব্য করে সাহিত্যসৃষ্টি করা। বিভূতিভূষণও গোপাল হালদারকে বলেছিলেন—

: ও সব আমাদের কিছু নয়। আমরা সাহিত্যিক; আমরা জীবনের অনেক গভীরতর দেশকে দেখি। রাজনীতি তো তার উপরকার আলা-ভোলা জিনিসমাত্র।

কিন্তু রাজনীতিকে সাহিত্যের সামগ্রী না করে বিশেষ Lehmann যেমন সমসাময়িক 'central problem'কে উপজীব্য করার স্বপক্ষে মত পোষণ করেন, বিভূতিবাবু সেদিক থেকেও স্বতন্ত্র রীতির স্বপক্ষে স্বকীয় চিন্তাধারাকে নিয়োজিত করেছেন।

॥ দুই ॥

সমকালীন যুগের কোন প্রধান ঘটনাই বিভূতিবাবুর মনে রেখাপাত করেনি এবং সেই কারণেই সাহিত্যের পটভূমিতে তার কোন প্রাসংগিক পরিচয় নেই। তবে, এই লেখক সম্পূর্ণভাবে নিজেকে স্বীয় সৃষ্টির আনন্দে উৎসর্গীকৃত করেন নি; যে সাহিত্য তাঁকে মৃত্যুঞ্জয় করেছে, সেখানে তিনি আত্মলীন, কিন্তু তাঁর যে গৌণসৃষ্টির ক্ষেত্রে (বলা বাহুল্য, ছোটগল্পের প্রসংগেই আমার এই উক্তি বিচার্য) বহুলীন মনোভংগীর পরিচয় তিনি দিয়েছেন, সেখানে তাঁর সৃষ্টি চরিত্রসমূহ যুগের সমস্যায় কণ্টকিত, মুমূর্ষু অথবা জীবন্মৃত। তবে বাইরের ঘটনায় যে দুঃখ-দুর্দশার জন্ম, তা জয় করা যায় আত্মার-শক্তির মহিমায় কিন্তু মানসিক বিকার থেকে যে অশান্তির সূত্রপাত তা অজেয়। বিভূতিবাবুর স্বসংমীক্ষণ বা মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দিকে কখনো প্রবণতা ছিলো না, যা একালের ছোট-বড়-মাঝারি সব সাহিত্যিকেরই একটা বাতিক, এবং সেই কারণেই একালের সাহিত্যের দু'টি প্রধানতম ও, মনে হয়, বৃহত্তম বিষয়বস্তুকে তিনি তাঁর সৃষ্টির সামগ্রী হিসেবে নির্বাচিত করেন নি। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর প্রমুখ অতি-আধুনিক কথাকারদের কথা বাদ দিলেও মানিক-প্রেমেন্দ্র

তারাশংকরের সমসাময়িক অন্য এক প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকের পক্ষে মনস্তত্ত্ব ও যৌনতত্ত্বকে বাদ দিয়ে প্রচুর পরিমাণে সাহিত্যসৃষ্টি করা একমাত্র বিমল-প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব।

মনান্তর ও দেহমিলনের পক্ষে নারীরিক যারা দাম্পত্যজীবনে স্বামী অথবা স্ত্রীর মনোধিকারের কারণ হয়েছে,—অন্য সাহিত্যিকদের হাতে এই ঘটনা মামাকৌশলে রূপায়িত হয়েছে, অথচ বিভূতিভূষণ সৃষ্ট দাম্পত্যচিত্র সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। স্যাড-মনস্তার পরিবর্তে নিবারণ মজুমদার কুড়ো গঙ্গা দিয়ে স্ত্রীর মনোহরণ করার পরিকল্পনা, অপরের উপভুক্ত ব্লেডলেটটি স্ত্রীর কাছ থেকে চুরি করে নেওয়ার চিন্তা অথবা দৈবাৎ-লব্ধ অর্থব্যয় প্রসংগে স্বামী ও স্ত্রীর মনান্তর ও মনান্তর পর্যন্ত বিভূতিবাবুর গল্পের অবলম্বন হিসাবে স্বীকৃত হতে পারে। কিন্তু বিভূতিবাবুর কোন গল্পে (এমন কি, বিভূতিবাবুর অপ্রকাশিত গল্প 'শেষ লেখা'কে স্মরণে রেখে বলা যায়) দাম্পত্যজীবনের কোন জটিল-সুটিল রূপকে তিনি রূপায়িত করেন নি। তাঁর প্রায় সব পুরুষ চরিত্রই উদার, সংসার-বিরাগী, জৈবিক সুখে নিস্পৃহ, উদাসীন, একরকম আত্মভোলা; আর নারীচরিত্র সহনশীলা, মমতাময়ী, কর্তব্যপরায়ণা, প্রেমিকা। তাঁর পুরুষ ও নারীচরিত্রের মডেল ঘর-পার্বতী। বহু চিত্রের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ব্যতিক্রম থাকতে পারে কিন্তু দাম্পত্যচিত্রের অভিব্যক্তিতে এই ঘরপার্বতী মডেলই বিভূতিবাবুর আদর্শ, অবশ্য কোনো কোনো 'পার্বতী'র মডেলকে হয়তো তিনি একটু স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতার কালিমায় চিত্রিত করেছেন, কিন্তু তার ফলে তারা যেন অধিকতর পরিমাণে মানবী-রূপায়িত হয়েছে।

বিভূতিভূষণের প্রায় সবেই দারিদ্র্যের অতি-উৎকট চিত্র ফুটে উঠেছে। কিন্তু মনস্তত্ত্ব ঘাবড়ায় বৈষম্য, ধনিকের শোষণ, ক্ষমতার অপব্যবহার ও নির্যাতন, অভাব দফা—ইত্যাদির বিরুদ্ধে তিনি কোথাও কোন প্রকাশ করেন নি, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো তিনি বলেন নি—

> না-ঘরে আমরা। বুক আকাশ, ঘর বাহির।
> রে প্রভু, তুমিই যেখানে, পৃথিবী মানে কেবল—
> তাই তো আজকে ঘর বিয়েছি উপবাসীর;
> ফলে নেই লোভ। তোমায় সোপায় তুমি কমল। (প্রস্তাব)

শুধু মৌধাক্তিক পার্থিবিকতায় দারিদ্র্যের নির্মম রূপটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সমস্যাকে তিনি সাহিত্যে ব্যক্ত করলেও এই সমস্যার আঘাতে তীব্রতরভাবে তাঁর চরিত্র সমুদ্রের নিয়ামক হতে দেখা যায় নি।

কতকগুলি গল্পে তিনি সামাজিকভাবে সমাজকে দেখেছেন। আমাদের জীবনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও আমরা যেন সস্তায়-পাওয়া, সহজ-লভ্য হালকা আনন্দে ভেসে বেড়াতে চাই যার মাধ্যম প্রধানত চলচ্চিত্র ও সংগীত। 'উত্তরা' ও 'আইনস্টাইন ও ইন্দুবালা' গল্পদ্বয়ে লেখক আমাদের বিকৃত রুচিকে ব্যঙ্গভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। ব্যাস, ভাস, কালিদাস, ভবভূতি ও বানভট্টকে মারকরূপে পরিকল্পনা করে প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য ও নাট্যসাহিত্যের ক্লাসিক রসকে আধুনিক চলচ্চিত্রাবেদনের মাধ্যমে হাল্‌কাভাবে পরিবেশনের বিরুদ্ধে লেখক কটাক্ষ করেছেন। শেষোক্ত গল্পে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের বংশখ্যাতা চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সংগীতজ্ঞা ইন্দুবালার কাছে জনপ্রিয়তার ছেয়ে যাওয়া এবং সশরীরে ইন্দুবালাকে দেখার উৎসাহে 'বীণা' সিনেমা লোকে লোকারণ্য হলেও আইনস্টাইনকে সংবর্ধনা জানাতে কারো পক্ষে মিউনিসিপ্যাল হলে যাওয়া সম্ভব না হওয়ায় ঘটনায় লেখক আমাদের মানসপ্রবণতার উপর অনেমধুর কটাক্ষ করেছেন। 'সুলোচনার কাহিনী', ও 'বিপদ' গল্প দুটিতে লেখক পতিতা-চরিত্র অংকিত করেছেন। দুই গল্পের নায়িকা সুলোচনা ও হাজু—উভয়েই দারিদ্র্যের দেশে বিপর্যস্তা, উভয়েরই মা আছে, উভয়েই পুত্রবতী, এবং স্বামী পরিত্যক্তা। তবে সুলোচনার রূপ ছিলো; হাজুর ছিলো না, কিন্তু রূপার যখন প্রয়োজন হয়, তখন রূপ না থাকলেও রূপোপজীবিনীতে রূপান্তরিত হয় অসহায়া কুলবধূ—হাজু সেকথা ঘোষণা করেছে। অবশ্য এখানেও বিভূতিবাবুর স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে, কেননা চরমতম বিপদের মুখোমুখি হয়েও এরা মনুষ্যত্ব হারায়নি, আর্থিক স্বচ্ছলতার দিনে এরা স্বামীকে স্মরণ করে, পতিতালয়ে থেকে মায়ের উদ্দেশে টাকা পাঠায়—প্রথমটির প্রমাণ সুলোচনা, দ্বিতীয়টির হাজু।

অর্থনৈতিক আবহাওয়ায় পারিবারিক কাঠামোকে লেখক তাঁর স্বকীয় প্রবণতায় প্রতিকূলদর্শিতার আকর বরূপ চিত্রিত করেছেন কয়েকটি গল্পে। যদিও এ যুগের প্রধান সমস্যাই অর্থনীতি প্রভাবিত এবং আমাদের সমস্ত চিত্তবৃত্তির নিয়ামক একালে মূলত অর্থনীতি, তবুও এই শ্রেণীর গল্প লেখকের গল্পভাণ্ডারের সুবিপুল পরিধির তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। অল্প কয়েকটি

গল্পের মধ্যে 'অতলের অমিত্রা'র কথা প্রথমেই মনে পড়ে যায়। বকুল যখন মারা গেলো, তখন অর্থগৃধ্নু স্বামী অতুল মৃত স্ত্রীর শরীর থেকে গয়না খুলে নিয়েছে এবং অর্থকরী চিন্তায় চিরকালের-মতো হারিয়ে-যাওয়া প্রিয়ার স্মৃতিকে ম্লান করে দিয়েছে। 'বাটি চচ্চড়ি' গল্পেও অলকার ওপর পিসিমার ব্যবহার অর্থনীতি প্রভাবিত বলে মনে হয়, কেননা নিষ্কর্ষ সংসারে 'ডাক্তারের বাপের ছোটকাকার বড় ছেলের' স্বল্প বধূ অলকার আবির্ভাব পিসিমা প্রশান্ত মনে সহ্য করতে পারেন নি। বিশেষতঃ অলকা অর্থহীনা। অলকার মৃত্যু হলো, কিন্তু যে অক্ষুণ্ণ আশা নিয়ে তার আত্মা এই মরলোক থেকে চলে গেলো, সেই আশার কোনো সাফল্য সে জীবনে পায় নি। মৃত্যুর পর কোন একটি তুচ্ছ বস্তুকে অবলম্বন করে স্মৃতিচারণা লেখকের একটি বিশেষ প্রবণতা, যা এই গল্পের উপসংহারকে কারুণ্যরসিক করে তুলেছে—

: এই ঘটনার দিন সাতেক পর ডাক্তারের বৌ কোন এক মধ্যাহ্নে তাঁহার ঘর গোছাতে একটা খালি হাঁড়ির মধ্যে পেলো সেই বাটিটা আর তার মধ্যকার কতগুলো শুকনো তরকারী। পুরনো ক্ষতে আবার যেন নতুন করে আঘাত লাগলো, একটি ব্যথিত দীর্ঘনিঃশ্বাস বুকের মধ্যেই চেপে মরলো। মর্মন্তুদ বিচ্ছেদবেদনা লাঘব করলে না লঘুস্ব শোকার্ত বাক্যবিন্যাসে, কেবল সজল নয়নে তাকিয়ে রইলো সেই বাটির পানে আর শুকনো তরকারীগুলোর পানে।

বর্তমান-সভ্যতার দ্রুত-প্রগতির আড়ালে জীবনের যে গভীর অসংগতি লুকিয়ে রয়েছে, তার প্রমাণ 'কমপিটিশন' ও 'মুখোশ ও মুখশ্রী' গল্প। ব্যবসায়ের বাজারে শিবশংকর প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করেছে বটে, কিন্তু আনুষংগিক প্রতিযোগিতায় সে পুত্র বিমানের আবির্ভাবে বিস্ময়-বিমূঢ়। চলচ্চিত্রাভিনেত্রীর সংগে দৈহিক সংগমের ক্ষেত্রে পিতা-পুত্রের প্রতিযোগিতা আধুনিক সভ্যসমাজের অন্তঃসারশূন্যতার নিদর্শন। তথাকথিত অভিজাতদের বিকৃত রুচির নিদর্শন পরবর্তী গল্পটিতেও আছে। অখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় শুধুমাত্র মুখশ্রী ও আর্ট সলেই যুবতী-মনমোহন হতে পারলো, কিন্তু বিখ্যাত পর্বতক ভাল টেনিস খেলতে পারেন না বলে একঘরে। অবশ্য গল্পের শেষে মিঃ সে ও শকুন্তলার আবির্ভাবে মুখোশ সরে গেছে, মুখশ্রী বেরিয়ে পড়েছে, মিঃ ব্যোমকেশ গুহের হাতে মিঃ বসু পরাজিত হয়েছে। এই উভয় গল্পেই

সাম্প্রতিক বিকৃত রুচির উদাহরণ স্বরূপ তথাকথিত প্রগতিপন্থী অতি-আধুনিকদের উৎকট প্রবণতাকে লেখক ঈষৎ কটাক্ষে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ওঁদের বইতে যেমন মনঃসমীক্ষণের ছড়াছড়ি, মোপাসাঁর রচনায় তা নয়। কেননা, পেশোক্ত সাহিত্যশিল্পীর মনোবিশ্লেষণের কোনো প্রবণতা তো ছিলোই না, পরন্তু ইনি মনে করতেন যে, মনঃসমীক্ষক সাহিত্যশিল্পীরা সৃষ্টির আড়ালে আত্মজীবনী রচনা করেন, বস্তুগত সাহিত্যের যা মারাত্মক ত্রুটি। আর কোনো অর্থে না হলেও, অন্তত এই অর্থে বিভূতিবাবু মোপাসাঁর সংগে এক পংক্তিতে আসীন। কয়েকটি গল্পের বিচারের মাধ্যমে উক্তির যাথার্থ প্রতিষ্ঠা করা যাক। যেমন 'উন্নতি' গল্পটি। গোকুলের মানসিক পরিবর্তনের ইতিহাসকে বিশ্লেষণাত্মক ভংগীতে ফুটিয়ে তুললে তার পক্ষে বীণার স্মৃতিকে ভুলে যাওয়া যেন আরো অধিকতর সম্ভব হতো। অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা থেকে তার যে স্বার্থপরতা, যা তাকে অন্তচারী করে তুলেছে—তা সাম্প্রতিক সমাজের পরিবেষ্টনীতে একেবারেই অসম্ভব নয়; তবে মনে হয়, লেখক এই গল্পে কিছুটা অবচেতনভাবেই অর্থনৈতিক স্বার্থপরতাকে ফুটিয়ে না তুলে যৌবনের স্বার্থপরতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন—গোকুলের স্বার্থপরতার কারণ, সে চায় অন্তবস্তু বিশেষতঃ স্বার্থপর যৌবন চায় যা নাগালের বাইরে তাকে হাতে আঁকড়ে ধরতে, চায় তার রূপ, চায় উন্নতি, ছোট চায় বড়কে আয়ত্ত করার আত্মপ্রসাদ'। 'একটি দিনের কথা,' 'পুরনো দিনের কথা,' 'যৌবনমূল,' 'দৈব ঔষধ' ইত্যাদি গল্পে শাশুড়ী কর্তৃক পুত্র-বধূ নির্যাতনের সকরুণ ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। ফ্রয়েডের সাইকো-এনালিসিসের কল-কব্জিতে শাশুড়ি-পুত্রবধূর বিদ্বেষের ঘটনাকে অত্যন্ত বাস্তবভংগীতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে বটে, কিন্তু বিভূতিভূষণ কখনো সে ধরণের কোনো ইংগিত তাঁর গল্পে দেন নি, যদিও তাঁর কোনো গল্পেই সম্ভবত শাশুড়ি-পুত্রবধূর মধ্যে কোনো মধুর সম্পর্ক নেই। একমাত্র 'বিড়ম্বনা' গল্পের নায়ক বিধুর অব্যক্ত মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে লেখকের মনোবিশ্লেষণ প্রবণতার অতি-সামান্য আভাস আছে। প্রাক-বিবাহিত জীবনের প্রণয়িনী পদ্মির বাড়ীতে রাত্রিবাস করার সময় তার জীবনে আকস্মিকভাবেই এমন এক ঝোড়ো হাওয়ার সূত্রপাত হয়েছে, যার ফলে সে 'একরকম ছুটেই বেরিয়ে গেল,' কেননা,

তখন 'বহু দিনের স্বপ্নভরা প্রথম যৌবনের বেলা ওর শিরায় শিরায়'। 'ক্যাম-ডাগার কৃষ্ণলাল' গল্পটিতে কৃষ্ণলালের সংগে সোনালির সম্পর্ক লেখকের প্রতিকূল মন্তির এক অভিনব পরিবেষনা। 'আচার্য কৃপালনী কলোনি' গল্পে মিথ্যা বিজ্ঞাপনের ওপর ভিত্তি করে জমি বিক্রী করার বাস্তব কাহিনীকে লেখক অত্যন্ত আটপৌরে চংয়ে বিন্যাসিত করেছেন। এই সমস্ত গল্পেই যুগের সমস্যা প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে সাংকেতিকতায় ফুটে উঠেছে। অথচ এই শ্রেণীর গল্প রচনায় তাঁর প্রতিভা যেন সমধিক স্ফূর্তি-লাভ করেনি এবং সম্ভবত এই কারণেই এই গল্পগুলি 'ভুইঁচাচা' 'কিন্নরদল' 'মৌরীফুল' বা 'নেবমন্দার'-এর মতো উৎকৃষ্ট রচনা নয়।

॥ তিন ॥

যুগ-সংকেত তাঁর সাহিত্যে ততটা প্রকট, যিনি নাগরিক জীবনকে উপজীব্য করে যত বেশী পরিমাণে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। কেননা, যুগের উত্থান-পতন, সভ্যতার উদয় বিলয় নগর-জীবনকে যতখানি আন্দোলিত করে, গ্রামীণ জীবনকে ঠিক ততখানি আলোড়িত করে না। তাই শহরের তুলনায় গ্রামীণ পরিবেশকে আরো নির্জন, নিরালা, স্পন্দনহীন বলে মনে হয়।

বিভূতিভূষণের ছোটগল্পে যুগ-সংকেত কতোখানি অনুপেক্ষণীয়, তা বিচার করার সময় এই কথাটি মনে রাখতে হবে। গ্রামের যে রূপ ও স্বরূপকে তিনি ছোটগল্পের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন, যে নিঃস্পন্দ, নিস্তরংগ জীবন-যাত্রা প্রণালীর পাঁচালি রচনা করেছেন, তা সাম্প্রতিক কালের নয়, আমার হাজার বছরের পুরনোও নয়—বরঞ্চ আমাদের এই গ্রামীণ রূপ চিরন্তন, শাশ্বত। অতীতের তামসিকতায় এর অস্তিত্ব ছিলো, বর্তমানে আছে এবং অনাগত ভবিষ্যতেও থাকবে। প্রধানত এই কারণেই তার গল্পের মধ্যে যুগের বদল চোখে পড়ে না। নগর-জীবনকে উপজীব্য করে লেখা কয়েকটি গল্পের মধ্যে পরোক্ষভাবে যুগচেতনা ভাস্বর হয়ে উঠলেও পল্লীজীবনের কাহিনী বিশ্লেষণে তিনি কোনো ঝোড়ো হাওয়ার আভাস যেন দি, যা পল্লীবাসীদের জীবনে ও দৃষ্টিভংগীতে আন্দোলন ও আলোড়ন এনেছে। অথচ তাঁর প্রত্যেকটি শ্রেষ্ঠগল্পই গ্রামকেন্দ্রিক পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে তিনি যেন গ্রাম্য এক চারণ-কবি।

বাংলা-সাহিত্য তথা সাহিত্য-ইতিহাসের বিবর্তনের সঙ্গে তিনি সমতালে চলেন নি, যেজন্য সাহিত্যে যুগসাংকেতিকতার প্রশ্নে তাঁর পক্ষে উপেক্ষিত রয়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশি। রবীন্দ্রোত্তর কথাসাহিত্যিকদলের অভিজ্ঞতার বহু বৈচিত্র্যের কথাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়া স্বাভাবিক। শৈলজানন্দ থেকে শুরু করে একালের তরুণ লেখকের অভিজ্ঞতার দ্যাপ্ত পরিধি বাঙালী পাঠকের কৌতূহলকে উদ্দীপিত ও উচ্চকিত করে তুলেছে। (সাহিত্য-সভায় যদিও একই পংক্তিতে ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রকে বিভূতিবাবু ঠাঁই দিয়েছেন, যদিও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাংলার ও প্রত্যন্ত প্রদেশের অনেকেই তাঁর সৃষ্টির কুশীলব, তবুও প্রত্যন্ত প্রদেশের অধিবাসীদের ও অন্ত্যজ আদিবাসীদের জীবন-চিত্রণের মাত্র কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনার রূপায়ণ ছাড়া তিনি সর্বত্র আমাদের চেনা-জানা চরিত্রকেই যেন বারবার আমাদের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছেন। এ উক্তি অবশ্য ঠিক তাঁর উপন্যাসের পক্ষে প্রযোজ্য নয়, বরঞ্চ বিপরীতভাবে প্রযুক্ত হতে পারে ছোট গল্পের ক্ষেত্রে, যেখানে তিনি হয় যুগাগ্র, নতুবা যুগাতীত।

নিজ জীবনের মতো শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রেও বিভূতিভূষণ উদাসীন, আত্ম-ভোলা। বাঙালী পাঠকের হাতে তিনি যে গল্প-কুসুমের ডালি তুলে দিয়েছেন, তার অন্তর্নিহিত সুন্দের রূপ, রং ও গন্ধেই তিনি বিভোর। মালাকারের দায়িত্ব তিনি নেয়েছেন, পূজার দায় পূজারীর।) সেজন্য আমাদের ক্ষোভের অন্ত নেই। তা হয়ত এখন অর্থহীন, কিন্তু অবান্তর নয়।

কয়েকটি কবিতা

জীবনানন্দ দাশ

এখন রাতের শেষে

এখন রাতের শেষে আবার প্রান্তর আছে শ্যাম হয়ে প্রান্তরে ছড়ায়ে ;
ঊর্ণনাভের জালে আবার মেয়েছে ব্রহ্মা হৃদয়ের কাজ বুঝে নিবে ;
সেইখানে শান্ত সব শিশিরের স্বরে
ভোরবেলা থেকে-থেকে জ্ব'লে ওঠে আধ ফুট হর্ষের রূপে :
ঘাসের উপরে সব ভূতেরা গিয়েছে খেলে—জ্যোৎস্নার রাতে
মধ্যোদধ্যের থেকে এসে—
তাদের গায়ের ঘ্রাণ এখনো বাতাসে লেগে আছে মনে হয় :
একটি ধবল ঘোড়া সন্দেহ আতুর হয়ে পলনিপলের অবসেশে
তাকায়ে রয়েছে দূর ঝঞ্ঝাবাল নীলিমার কুয়াশার দিকে :
সেইখানে কারা তবু আছে :
অনেক ধূসর ঘোড়া খেলে যেত যদি কোনো মেহগনি-অরণ্যে সেখানে,
সোনালি সবুজ সাদা কাকাতুয়াগুলি অটিল শিকড়শীল গাছে
অসংখ্য ডানায় হেসে খুব হয় কমলারঙীন রৌদ্র ঘিরে,
তাহলে এ-পৃথিবীর রাজনীতিবিদ যোদ্ধা নেতারা এখন
ডুবে যাক সমুদ্রের পুরুতুজ—পালসিক মলের ভিতরে,
যদিও তাদের দেশে জন্মেছিল অপরূপ নারীরাও—শঙ্খের মতন শুভ্র স্তন।

আকাশ ভ'রে

আকাশ ভ'রে যেন শিথিল বৃক্ষ ছেয়ে তারা
জেগে আছে ফুলের থেকে ফুলে ;
মানবজাতির দু' মুহূর্তের সময় পরিসর
(কেমন যেন) অধীর অবুঝ শিশুর শব্দ তুলে

কয়েকটি কবিতা

চেয়ে দেখে পারাপারের ব্যাপ্ত নক্ষত্রেরা
আগুন দিয়ে বিষম, তবু অক্ষত, স্থির জীবনে আলোকিত
ওদের চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীন হবে তবু
মানুষ আজো স্বাধীনতার মূল্য শেখে নি তো।

মানুষ যে-দিন প্রথম এই পৃথিবী পেয়েছিল
সেই সকালের সাগর স্বর্গ অনন্তজীবন
আমাদের আজ এসেছে যেই বিষম ইতিহাসে
সেখানে গ্লানি হিংসা উত্তরাধিকারের ব্যথা ;—
মানুষ ও তার পটভূমির হিসেবে গরমিল
রয়েছে ব'লে কখনো পরিবর্তনীয় নয় ?
মানুষ তবু সময় চায় সিদ্ধকাম হতে
মানে, ঢের দীর্ঘ দুঃসময়।

অনেক রক্তে

অনেক রক্তে উত্তেজিত হয়েছে সারাদিন।
অনেক লাল খুন দিয়ে ফিরে
ঝুকেছে প্রাণ মহৎ মানের অন্তরাত্মে প্রেমও
ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে মানবশরীরে।

জানি আমি ; তবুও ভালোবাসা
মানবদেহ ছাড়া
মানবাত্মা কোথাও পায় না কো
গভীর নারীশরীরে এর সাড়া।

মানবহৃদয় নির্মিত হয় তাই ;
প্রেমিক উপলব্ধি করে নিজের মনের কথা ;
ভালোবাসা, তোমাকে ভালোবাসা ;
না হলে সব জ্ঞানের নিষ্ফলতা।

যেখানে মনীষী তার

যেখানে মনীষী তার বোস দিবে ব'লে আছে রাত্রির ভিতরে
মাথার একটি চুলও (হয়ে আছে) লোহার পিণ্ডের মতো ভারি
মনপবনের চাপ খেয়ে
সকল পাহাড় নদী ডিঙিয়ে এখন তাড়াতাড়ি
সেইখানে চ'লে এসো—কাচের গেলাসে তার—জলের ভিতরে
এখনই সে দিতে যাবে নির্জন চুমুক—
যেন তার সব চিন্তা—সব ক্লান্তি—সৃষ্টির প্রয়াস
হঠাৎ দেখতে পায় প্রমত্ত কুকুরদের মুখ।

আমরা শুনেছি তার কাঁধে এই পৃথিবীর ভার—
সর্বদাই তার মনে জন্ম নিতে চায়
নতুন সমাজ চিন্তা কবিতা প্রাসাদ।
সম্মুখীন বিষয়ের মাঝখানে গিয়ে সে দাঁড়ায়
সর্বদাই অসমাপ্ত কর্তব্যের তুপে।
তবুও অমূল্য : জল ! যদিও জলের মতো দর।
চ'লে এসো মনীষীকে গেলাসের ভিতরে দেখাই
মত্ত কুকুরের মতো আমাদের দাঁতের হুগত।

এসো

এসো—(এসো—এসো—) আমার কাছে তোমার আসা
না হলে ম'রে যাবে না ভালোবাসা ;
মানুষ শুধু চায়
কখনো নীল আকাশকে কি পায়
কোনো দিনের কোনো পথের শেষে।

পাখির পালক বটের পাতা হতেছে মলিন ;
কোথায় তুমি রয়েছ এত দিন ?
সময় তোমার আমার হাতে বুঝি

কয়েকটি কবিতা

যেদে না আর যতই আমি খুঁজি
জলের মতন জলের খোঁজে ভেসে।

মন তবুও না হায় মেনে চলে
নদীর জলে—পদ্মপাতার জলে
নিজেকে ঠেলে সাজিয়ে নিয়ে মন
লাভ সাগরে ঘুরছে আজীবন
খুঁজছে আবার পদ্মপাতায় এসে।

[জীবনানন্দের যে-কয়েকটি কবিতা ওপরে প্রকাশিত হ'ল তাদের রচনাকাল ১৯৪৪-৪৫ সাল এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমকালীন ও অব্যবহিত পরেকার রচনা। তার পরবর্তীকালেই কবির 'সাতটি তারার তিমির' নামক সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। 'বনলতা সেন' ও 'মহাপৃথিবী'র পরেকার কবিতাবলীতে রচনারীতিতে যেমন একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তেমনি অনুভাবনার দিক থেকেও মনে হয়, জীবনানন্দ বর্তমান সময়, পৃথিবী ও সমাজের সাথে মিশে হয়েছেন। যে সুদূর স্বপ্নময়তার, পাখপাখালি, শিশির নদী, আকাশ ও প্রাচীন সময়ের আঘ্রাণ তার কাব্যে এতকাল বর্ণিত হয়েছে তা যেন এক রূঢ় আঘাতে বিনষ্ট হয়েছে, স্বপ্নাবিষ্টতা থেকে তাকে জেগে উঠতে হয়েছে। অনেকে যারা ইয়েটস্ এর সঙ্গে জীবনানন্দকে তুলনা করেন, তাঁরা তাঁর এ-পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও সেই তুলনার আভাষ পাবেন। অবশ্য দুই কবির বাস্তব-সচেতনতা দুই রকমের, যথাযথ সাদৃশ্য মিলিয়ে তেমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা খুঁজে বার করা দুরূহ হবে। তবে একটা সময়ে, নিয়ত কাব্যচর্চার প্রবহমানতা থেকে এক নতুন উপলব্ধির স্তরে দুজনেই উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং বর্তমান সময় ও বাস্তব পৃথিবীর পরিবেশে তাদের পারম্পরিক চিন্তার জগতে আমূল পরিবর্তন এসেছে। যদিও উল্লিখিত কবিতাগুলিতে ঘাস, ঘ্রাণ, মেহগনি-অরণ্য, শঙ্খের মত স্তন ইত্যাদির উল্লেখ পাই তথাপি 'এ পৃথিবীর রাজনীতিবিদ যোদ্ধা নেতারা এখন' জীবনানন্দের চোখে সাময়িক সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। 'মানুষ আলো স্বাধীনতার মূল্য দেখেনি তো'—

এমনতর উক্তির মধ্য দিয়ে তার চিন্তার পরিধি সহজেই আমাদের কাছে অনুমিত হয়। ইতিহাসের অতীতে শুধু জ্যোৎস্নার রাত, শিলালিপি, বা মহেঞ্জোদড়োর স্মৃতিচিহ্ন নেই, বরং

আমাদের আজ এসেছে যে বিষম ইতিহাসে
সেখানে গ্লানি, হিংসা, উত্তরাধিকারের ব্যথা ;—

এখনকার পৃথিবীর ইতিহাসে এমন এমন সব অভিজ্ঞতার প্রকাশ যা বিগত শত শতাব্দীতে কখনও কোন কবিদের কাছে কাব্যবস্তু বলে পরিগণিত হয়নি :

একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে
অস্থির পেট্রল ঘন্তে···
তিনটি রিক্সা ছুটে মিশে গেল শেষ গ্যাসল্যাম্পে
মায়াবীর মত আন্ধারে।

অথচ ভরসা এই, মায়াবীর মত আন্ধার এখনো কবির কাছে সত্য এবং সম্ভবত সেকারণেই এখনো সে কাব্যচর্চা থেকে বিরত হয়নি এবং সেই দৃষ্টিতেই, হয়ত 'কেরোসিন কাঠ, গালা, শুমটট, চামড়ার ঘ্রাণ, ডাইনামোর গুঞ্জনের সাথে মিশে গিয়ে' কবি জীবনের সত্যকে চিনে নিতে পারেন।

জীবনমানসের এসকল চেতনার স্বাক্ষর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তীকালের কবিতায় রয়েছে। উপরি-উদ্ধৃত কবিতাগুলি সেই অভিজ্ঞার কথা, চেতনা যখন বিশ্বচিন্তার সঙ্গে সমীকরণের রাস্তা খুঁজছে, ব্যক্তিমানুষ বিশ্বমানবের অংশ হিসেবে এই বিরূপ বিশ্বে নিয়ত সক্রিয়শীল এবং সেখানে ঘৃণা, দ্বেষ, লোভ ও লালসার মাঝখানেও কিন্তু কবির বিশ্বাস আছে মানবজীবন ও মানবচৈতন্যের সুস্থ সুন্দর স্বপ্নময় দিকটির প্রতি, মানুষ যখন 'সময় চায় নিজকাল হতে', এবং এখনো সে উপলব্ধি করে

ভালোবাসা, তোমার ভালোবাসা
না হলে সব জ্ঞানের বিফলতা।

অরুণ ভট্টাচার্য

দৃশ্যপট

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

অর্বাচীন বিদগ্ধতা মাঝে-মাঝে অনেকের চোখে
দেখেছে সে। দেখেছে বিদগ্ধী লোক বিষয়ের লোভে
হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। আরো দেখে খ্যাতিমান ক্ষোভে
মুহূর্তে উন্মত্তপ্রায়, অন্য কেউ এই ইহলোকে

যখন সম্মানমূল্যে প্রতিযোগী। স্বদেশী নেতাও
স্বদেশের স্বার্থে নয় স্বজনের হিতার্থে হয়ত
জাগায় বিক্ষুব্ধ ঢেউ অন্তরালে। দেখেছে অন্তত
সামান্য পেলেই ক্ষুব্ধ এমন কি হিংস্র জনতাও।

যে আখে শিল্পীর মন শুধরায় কারুন অভাবে,
সম্মান মৌখিক কিন্তু স্বর্ণমুদ্রা দূরপরাহত ;
কুমারী প্রণয় সেও পরিণত বিদ্রুপ স্বভাবে,
অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাসে লীয়মান্বিত যৌবন বিক্ষত।

যে আখে লক্ষিত সোনা লুটে নেয় কৌশলী বাজার,
দস্যুতা নিশীথে যার উদ্ধাসনে সে-ই দাসবীর ;
সজ্ঞান বিপন্ন দয়া, অসতের দাপট অবাধ,
বাসর বিক্ষুব্ধ হলে তাতে যতো পাখীদের নীড়।

সে আখে বিলুপ্ত নদী জীর্ণ সেতু গাঢ় অন্ধকারে,
পাহাড়তলিতে বনে স্তূপে স্তূপে ছায়াময় ঢেউ ;
আকাঙ্ক্ষা বিলাসী নারী, দীর্ণ হয় আজো বারে বারে,
দাবাগ্নিবেষ্টিত হৃদে আত্মঘাতী ঝাঁপ দেয় কেউ।

এইসব দেখেই সে একটি মহৎ প্রেরণায়
দীপ্যমান হতে গিয়ে বর্তিকার মতো জ্বলে' যায়॥

তাই তবে হোক

মণীন্দ্র রায়

তবে তাই হোক, তুমি
আর ভালোবেসো না আমাকে।
আমিও আমার অন্ধ ঈর্ষা অভিমানে
জড়াতে যাব না পাকে পাকে।

একদিন আমরা দুজনে
যে ইন্দ্রজালের রথে সবুজের আগে
ছুটেছি, স্বর্গের ছোঁওয়া পেয়েছি ধূলিতে—
একটি চাকায় তার কান্নার আওয়াজ
মিঁড়ে দেয় সব সুর এই হৃদয়ের।
—কী হবে বলো সে বিষাদ্যুতে?

তোমার চোখের দিকে চাই যতোবার
দেখি সেই দীর্ঘশ্বাস দীঘির নীলিমা
কেঁপে ওঠে ঢেউয়ে ঢেউয়ে। আমার স্মৃতি কি তবে কড়?
তাহলে বিদায়। তুমি ঘাটের সিঁড়িতে
থাকো শান্ত ছায়াঘন করুণা বিছিয়ে,
শোনো পিপাসার কণ্ঠস্বর॥

যুদ্ধের বিরুদ্ধে

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চলো আমরা চাঁদের দেশে যাই
চলো আমরা সবার থাকতে যে যার দেশের জাতীয় পতাকা
চাঁদের দেশের সবার চাইতে উঁচু পাহাড়টার
চূড়ায় দিই উড়িয়ে, তার মাটিকে করি সোনার চেয়ে দামী।

ঘুমের ঘর

পৃথিবীতে কোথাও আর নদী পাহাড় আকাশ
কোথাও আর ঘুমিয়ে থাকার দু'ফুট জমি নেই।
একটি পাখীর বাসা গ'ড়ে তোলার মত সামান্য আশ্রয়
একটি ঘাসের দাঁড়িয়ে থাকার মাটি
আজ আমাদের অতীত ইতিহাসের স্বপ্ন, ঠাকুরমার মুখের রূপকথা।

নিজেই মানুষ বেতারে টেলিভিশনে সাংবাদিকের গোলটেবিল বৈঠকে
পরস্পরকে নিন্দা করার উচ্ছলতায় নিজের মুখ দেখতে চায় আলো
নিজেই মানুষ নিজের দেশের নিজের বলের গর্ব করে।
আসলে তার পায়ের নিচে কোথাও আর মাটির কোন চিহ্ন নেই
হিমালয়ের চূড়ার ঊর্ধে নিশ্বাস ছাড়ে ওঠার দেশ নেই
দু-ফুট জমি মেপে নিয়ে যেখানে উপনিবেশ গড়া যায়।
চলো আমরা চাঁদের দেশে যাই
সময় থাকলে সোনার ছেলে মূল্যবান চাঁদকে দিই জাতীয় সংগীত।
অতঃপর চাঁদ ফুরুলে, ঠাকুরমার গোলোক দেখা হ'লে
আবার আমরা নতুন অঙ্ক কষবো, শনি বৃহস্পতি মঙ্গলের ভূমি
অসভ্যের মত আমরা শুষে নেবো, শান্তিকামী মানুষ :
বেঁচে থাকতে দু-ফুট জমি চাই।

ঘুমের ঘর

(সুধীন্দ্রনাথ স্মরণে)

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মাটির বুকের মধ্যে তারা
একটি ঘুমের ঘর বানিয়েছে।
আদিম পিতার কাছে
প্রস্তরের প্রতিমার কাছে
রুদ্ধ সন্তানের কাছে

উত্তরসূরী

মতভ্রান্ত হওয়ার স্বভাব থেকে আজ
চারদিকে অপার স্নেহ।

তারা প্রেমরোগ ভয় ক'রে
একটি শান্তির ঘর বানিয়েছে।

গাছ

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

জানলার পাশে
গাছটা দাঁড়িয়ে থাকে ;
আশেপাশে বন, রেল লাইন
—মোষের পিং
ঘুরছে আছে।
দু' একটা বাড়ি এদিক-ওদিক
ফাঁকা মাঠ।

দুপুরবেলা
গাছটাকে দেখি ;
কাছাকাছি কেউ কোথাও নেই
বড় একা-একা
একমাত্র সঙ্গী এই গাছ।
নির্জনতার মধ্যে এক-এক সময়
হাঁফিয়ে উঠি
গলার ভেতর কথার ভিড় ঠেলে আসে
ভয়ের সময় অন্ধকার যেন।
গাছটা আস্তে আস্তে
দু' একটা পাতা খসিয়ে দেয়
একঝলক হাওয়া।

হঠাৎ দেখি
গাছটা নড়ছে
সমস্ত গা ঝাড়া দিয়ে
কী যেন বলছে
আকাশের তারাগুলো হারিয়ে গেছে
গাছটা শুধু চেয়ে থাকে
চোখের মণিদুটো তার জোনাকীর মত দপ্‌ টপ্‌ করে।

আশেপাশে বন, রেল-লাইন
শুধু নির্জনতা,
একমাত্র সঙ্গী এই গাছ।

যে আমার দক্ষিণ শিয়রে

রাম বসু

তাকে বলি অন্তমুখ। সে আমার দক্ষিণ শিয়রে
অবিশ্রাম কল্লোলিত, শিকড়ের আকর্ষণে স্থির
রাজেশ্বরী। যোর ব্যাপ্তি প্রস্তরহীন স্তব্ধের উপরে
অনন্ত—পূর্ণিমা, শান্ত ; নীলিমায় পুষ্পিত,গভীর।

যে দিকে পড়েনি আলো সেই দিকে বিতর্ক কল্পনা
উর্ণনাভ জটিলতা, বাসী রাখা দৈবের পাশায়
বৃক্ষের মর্মর থেকে উৎসারিত অম্লান ঘোষণা
সর্বাঙ্গে বেজেছে যার মুকুলিত দ্বিময় আভায়

সে এখন প্রতিধ্বনি সমস্তের স্বচ্ছ দৃশ্যপটে।
প্রবল প্রপাত দূরে পাল তোলা নৌকার কাতার

উত্তরসূরী

মাস্তুলের মৃদু পাখী তরঙ্গের উত্তাল নিকটে
ভেসে গিয়ে অন্তরালবর্তী মৃদু মাতার আবার।

অদৃশ্য সূত্রের মধ্যে, সঞ্চারিত আকাঙ্ক্ষা শরীরে
অপর্যাপ্ত টুকরো ছায়া গেঁথে গেঁথে আমি চিরকাল
উদ্ভাসিত স্বর, সত্তা ; সময়ের কণ্টকিত তীরে
বিনীত সোপান, ঘাত ; মৃত্যুচিহ্নে উদ্দীপ্ত কপাল।

করোটির উপত্যকা উন্মীলিত, নিচভূমি নীল
হে প্রেম আমার হোক চারিদিকে শুভ্র আবির্ভাব
যেন সব বৈপরীত্য ডুবে যায় ; বিরুদ্ধ নিখিল
নিজের আলোয় বেঁচে ফিরে পায় সঙ্গতি স্বভাব।

আশ্রয়

আরতি দাস

অনেক পাঁকের তলে খুঁজেছিল, পায় নাই কিছু,
কতকাল গেছে তার নিরাকার ঈশ্বরের পিছু ;
ঈশ্বর মেলেনি, পাঁকে কোটেনি ক্ষুদ্র শতদল
অধুনা জেনেছে আজু পদ্মপাতে একফোঁটা জল ;
জড়ায় আ-শিরনখ রোগের শোকের নাগপাশ
ক্ষুধায় হেরেছে সব মূলধন, ছেঁড়াখোঁড়া তাস,
তাই ফিরে ঘরে ফেরে। পথে চোখ উপবাস বেঁধে
জলের অতলে ডোবে সব সোনা, মন ঘরে কেঁদে

আকাশে অনেক তারা দুখোশে ঢাকেনা দুখ, মন
নিরালা আকাশ দেখে, কাছে ডাকে বন্ধুর মতন।

ছোট ঘর

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

ঘর ছোট, ঘরে কার সুখ নেই, বাইরের ডাকে
যত হবে বলে কে যে বিনক্ষণ পাঁজিপুঁথি অন্ধকারে তাকে তুলে রেখে
নক্ষত্র রৌশ্যের বিন্দু গুনতে গুনতে চলে গেল, এবং পথের বাঁকে বাঁকে
পান্থশালা বহুকাল তার সেই ভবঘুরেপনা ছবি এঁকে
বোঝাতে চাইলো আরো অনেক ব্যক্তিকে যারা এল গেল, খেল কি খেল না
মদ মাংস, উপভোগ্য রমণী-শরীর,কারো কাছে সাড়া পেল কোথাও পেল না···

বলেছে সে—খাতিদীর্ঘ অনিশ্চিত দূরন্ত জীবনে
রেখে আখো নদী-জল, বহু নদী পার হয়ে গেলে,
মাথায় খড়ের চালা, পাতাভরা গাছ কিংবা পানখাটে দোকানের ছাউনিটুকু
পেলে
সাপুড়ে একটি নারী ভুলে গিয়ে কেন আরো নারীদের সঙ্গ পেতে চায়—
তোমার পিপাসা হবে গাঢ়তম উজ্জীবিত প্রাণবন্ত চপলী মায়ায়,
কখনো গাছেরই মত হতে চাইবে, কখনো আকাশ, নীল পাখি,
রোমশ জন্তুর মন বেরোবে তোমার থেকে, পরিতৃপ্ত হবে জানো তা কি···

ফিরে আসবে একদিন উল্টোপাল্টা কথা-বলা সেই ভবঘুরে
খুলিতে থাকবে তার নানান্ রঙের ছুড়ি নানান্ আকার
বুকের ভেতর যেন কথা বলবে হাজার নদীর দেশ যারা আছে ঘুরে
এবং সে বলে উঠবে—আমিও সম্রাট এক অনেক স্মৃতির 'পরে আছে অধিকার···

ঘরে যারা ছিল যারা সঙ্গে রেখেছিল সেই কাঠের লাঙল
ঘুলঘুলি অন্ধকারে ছেয়ে দেখবে বহুরঙী এক ফিরে আসে—
তারা বলবে—আমরা গভীরভাবে ঈশ্বরনির্দিষ্ট এই অশে-ভূমণ্ডল

নিজের মতন করে ভালবেসেছি যে, তাই আমাদের পাশে
একটিই নদী আছে, একটি আকাশ, গাঢ় হৃদয়ে উত্তাপ,
নিজেকে নিজেরা চিনি, আমি গাছপাতা, সোকা, ঘুণ, সহস্র সন্তাপ···

অন্তমুরে গৃহস্থের মুখোমুখি সূর্যালোকে বসে
দেখবে ওরা দুঃখেকষ্টে সূর্যমুখী ফুটে উঠছে দীপ্ত সৌররসে।

একটি সংলাপ : চারটি কবিতা

মানস রায়চৌধুরী

(এক)

হারিকেন তুলে ধরে সাদা হাত, রক্তহীনতার এক দুঃসহ আগামী
এখন চাইনা আলো, ঢের আগে চাইতাম। লণ্ঠন নেভালে জেনো আমি
কবরের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবো নীলধাস, অদেখা অঙ্কের সিঁড়ি ভেঙে
কারো চোখে জল এলে মনে ভাবি হাওয়া দিয়েছিল, ধোঁয়া কাঠের উনুনে।

সংসারে সেরোসে বন্ধ পাথরের দরজা খুলে যাবে এই চির প্রত্যাশায়
ঘুমহারা রাত্রি ছিলো আমার হুপাশে, আমি শরীরের সব অধিকার
দাঁড়িয়ে দিয়েছি এই তারকা-অঙ্কিত পথ, অনাবৃত নিশ্চল সুদূর
নৌরীর অতল ঘুরে অমূর্ত কোয়ারা পাই নিঃস্ব বুকে, গন্ধতারাতুর।

আরো বেশী অন্ধকার নিতে পারি এমন হুহাত আমি পাবো কোনখানে
ঠাণ্ডা অমহীন ঘুমে দিবসরজনী তার বিরহের স্পষ্ট অবমানে
কোটায় অটিস ফুল, চোখ খুলে নিরালোক অথচ ভীষণ পরিচিত
উদ্ভত চুলের কালো মমতায় ত্রিভুবন রেখেছে চিহ্নিত।

(দুই)

সত্তা তবে প্রেয়সীর এলো খোঁপা, আর সব স্বপ্নহীন ঘুম
এ কেমন হয়ে ওঠা—আনি অভিমান তার চির পরিচয়

তবু কি চোখের জলে চেনো তাকে প্রতিবার, কালো তিল কিম্বা ঘরময়
অসোহাল বিছানার কোনো সে থাকেনি নিজেই ?

নিশানে সন্ধ্যার আলো। এই বুঝি অযাচিত নামে অন্ধকার
খোলা বুকে হেঁটে যেও। গানের অপেই গন্ধ ফেরে বারবার
খিলানের চার পাশে—অনায়াসে যেন কত জন্মের বিষাদ
ফিরে আসে শূন্য বুকে, গত জন্মে ভালবাসা খুঁজেছিল এমনি প্রাসাদ।

(তিন)

কেন চিহ্ন রেখে যাবে, কোন চিহ্ন ? এই বাড়ীময়
শেওলার অভিশাপ ছুঁয়ে থাকে। সবুজ চেয়েছো বুঝি আগে
এখন সমস্ত তাই উদ্ভিজের অধিকারে। খালি বুকে তব
লালস করেছো যেন রক্তের কুমার এক, প্রস্তুতি কখনো
ব্যর্থ হতে পারে ? কেন বলোনি দারাটা দিন খুব কাঁকা লাগে।

এরা কি তোমার কেউ নয়, এই সামনে বাগান
ঘরপোষ হেঁটে যায় আমমনে, সাপের খোলস ঠাণ্ডা ইঁদারার পাশে
কী যেন কারণ আছে অথচ জোছনা সব এমনি বাবদান
শেষবেলা পূর্ণ করে উড়ে যায়, তারপর শূন্য চারিদিক
আমার নিজস্ব স্বপ্নে উচ্চারিত···প্রেমিকের নশ্বর প্রতীক !

এর চেয়ে বেশী চিহ্ন আমি কিন্তু রাখিনা পিছনে
হয়ত সুরভি মৃদু জ্যোৎস্নারাতের নদীতীরে হঠাৎ হাওয়ায়
নৌকার যাত্রীকে টানে অন্যদিকে, সারারাত অদৃশ্য গন্ধের অন্বেষণে
কেউ যেন গান শুনে হাট থেকে বাড়ী ফিরে যায়···
কেন চাও মমতায় অবদান, চারিদিকে ভীরু গলা শিশুর অছদ ?

(চার)

কানে কানে কথা বলে চলে যাবো, কালকে সকালে
মনে পড়ে হাসি পাবে—ওকি প্রেমিকের যন্ত্রণার প্রতিবাদ,

অবারিত পেয়েছিল দারাদিন, তবু কেন মেটেনি তার সাধ
ভালবাসা অনাবৃত শরীরের সমর্পণে তীব্রতম সহজ
অথচ মেটেনি কেন সেই ক্লান্তি, ঘুমের ভেতেও তীব্র মূর্ছার খবর ?'

আমার যন্ত্রণা আমি নিয়ে গেছি আরো তীক্ষ্ণ করে
যার দিকে চেয়ে এই জীবনের সমস্ত বাগান কুসুমিত
তুমি কি কিরালে মুখ অভিমানে, বলো খুব জোরে :
'তোমাকে বাসিনি ভালো কোনদিন, শুয়ে থাকা পাশাপাশি সব, অভিনীত…'
বুকের নিচেই ঠিক কান্না রাখি, শিশির নীহার সব আগামী জন্মের কথা ভেবে।

মৃত্তাকে

অমিতকুমার

প্রার্থনা

আলোর আকাশ ধুয়ে ধুয়ে দিক তোমার দেহ
তরুক তোমার স্বপ্ন সদ্যুক্ত মাটির স্নেহ
হাওয়ারা তোমার আনন্দ দিক স্বতঃই প্রীত
নতুন পাতার বুকে হও তুমি উল্লসিত।

প্রশ্ন

আমিনা তোমার দিন রাত্রি আর নিস্তব্ধ সময়
তোমাকে কী কথা বলে। পৃথিবীর কোন পরিচয়
হৃদয় রেখেছ তুমি এই মাটি, মাটি আর ঘাস
মানুষের আসা-যাওয়া কথা, কান্না, আমার আকাশ
কাকে দিয়েছ তুমি ? আমি শাকো শুধু আর শেষ
আমি এক অভিযাত্রী তুমি কোন মৌন মহাদেশ
অনুরক্ত এই পথ—অন্বেষীন আমার সন্ধান।

মৃতাকে

স্মৃতি : স্মৃতির পর

যখন-ই তোমার কথা মনে হয় আমার আকাশও
অবাক উজ্জ্বল হয়। মনে হয় তুমি যদি আসো
তাহলে সকল কান্না, সব ক্লান্তি, সকল ব্যর্থতা
হয়ত বা পেতে পারে কোনো এক পরিপূর্ণ কথা
আশ্চর্য পরম কিছু। আমি যার পাইনি সন্ধান
হয়ত নিরর্থ ছন্দে আমার অজস্র অবসান
শেষ হয়। যদি তুমি, তুমি যদি তাকে ভালোবাসো।

ব্যাস

তোমার চলার পথে ঝরে আছে স্বপ্নের শিশির।
অনেক রাতের ঘুম তোমার দু চোখে আজো ঢেরে—
তোমার হৃদয়ে মায়া অজানা অবাক পৃথিবীর
তোমার কথায় ওঠে যুগের হাওয়ারা গান গেয়ে॥

নিমন্ত্রণের লেখা

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

আমার বাড়ির দরজা খোলা আছে। তোমরা শুধু আসো
শীতের বেলায় খুশি, উদার সাগরে, ওড়া রোদে।
হে আমার বন্ধু, বৃক্ষ, বনস্থলী বক্ষ ঘিরে পরিচিত হাসো—
সুদূর পাখির নীলে, নিরন্তর···ভেসে যাও অপার মধুবোধে।

দেখ তোমরা, দরজা খুলে রেখেছি আমার। যদি এসে
বলতে এই শান্ত মাঠ, ঈশ্বরিত স্পষ্ট নির্বিকারে ;
ক্ষণকাল স্থির হ'তে যদি এই নক্ষত্রীশ হেমন্তের দেশে।

যাকানো রক্তের ভেজে মৃথা দূরে ঘুরছো পৌর পেরাম্বুলেটারে।

বিষণ্ণের আর্তি

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

আমার সংগীত কেন কণ্ঠে আজ বাজেনা সুরমা !
কেন যে বিশুষ্ক ম্লান মনে হয় সব দৃশ্যাবলী
একটি বিমর্ষ মুখ ভেসে ওঠে। নির্বিদ্ধ উপমা
কখন অলক্ষ্যে এসে ভরে দেয় যৌবনের দীপ্ত বনস্থলী।

কেন যে আলোর উৎস নিরুদ্ধ অক্ষম শিলাতলে
মুখের প্রতিটি রেখা স্পষ্টতই তোলে হরিনাম.
বিপুল দুঃখের ঢেলা প্রত্যহ ভাসাই এই গাঙুরের জলে
শবদেহ গলে পড়ে, মেলেনা বাঞ্ছিত দেবধাম।

শবের শিয়রে বসে কত রাত্রিযাপনের গ্লানি
সমস্ত শরীরে ! আর প্রতিদিন নরককর্দম।
শতাধিক রমণীর প্রণয়ী সম্রাট, রাজধানী
এবং স্বরাজ্য ছেড়ে হাটুজলে করে নিত্য স্মৃতির তর্পণ।

সংসারমন্থিত সুধা নিরবধি পান করো দেবতা আমার।
কণ্ঠে যে সুতীব্র বিষ ধারণ করেছি, সে আগুন
আমার সর্বাঙ্গে জ্বলছে। একরথে বিপুল সংসার,
অন্যরথে আমি একা যুদ্ধ করে নিঃশেষিত ভূণ।

সব তাঁর পুড়ে গেছে—এ বিপুল ধ্বংস করো ক্ষমা।
আমার সংগীত বুঝি কণ্ঠে আর বাজবেনা সুরমা।

অগত পিপাসা

সুধাময় চট্টোপাধ্যায়

কে তুমি ব্যথার বৃত্ত আঁকো নিত্য রিক্তদিন অকৃপন আশা
নারীর উত্তাপে যদি নির্বাচিত অন্ধকার আলোর সন্ধান
কিংবা লজ্জার তীরে ঢেউ ভাঙে আত্মহারা অগত পিপাসা
ছায়াদের সংগোপনে সমর্পিত যৌবন-যন্ত্রণা

রক্ত মেখে চিরতন মন্বন্তর কিছু কুমন্ত্রণা
প্রকম্পিত। অপমৃত্যু অহেতুক একান্তই তাঁর পরিভাষা
গঙ্গাতীরে দেহস্থিতি, মতান্তরে সাবলীল মোক্ষম নির্ধাণ
যন্ত্রণার ঘূর্ণাবর্তে তবু প্রেম আমরণ বাঁচার প্রত্যাশা।

চতুর্থ নায়িকা

অমিত দত্ত

ক্লাসের বোর্ডের তাল ধীরে ধীরে উন্মোচিত কর,
নিহিত রয়েছে তাতে জীবনের গলি রাজপথ।
নির্বিচারে ভুলে যাও অন্ধ যত মুমূর্ষু শপথ :
অনুজার শাদা শাড়ি, মা-র জ্বর, প্রাণ মর-মর।

ফেলে দাও কিছু নেই ছুরি শাণা তিন, শূন্য হাত।
এবার উঠেছে তিন বিবি অবিকল এক মুখ,
রঙের তফাৎ শুধু, সকলেই সমান কামুক ;
অকৃপণ যুবতীরা কেউ কিন্তু দেব নি আঘাত।

উত্তরসূরী

হয়তো প্রতিদিন ইশারায় ছাদে মেলে শাড়ি,
নিয়মিত দশটা পাঁচটা করে ইস্তাপদ চিড়িতন
হাতা হাতে। মন্ত্র থাকে একা কইতন, তীক্ষ্ণ মন :
মদ ছুঁয়ো কিংবা আমি, বলেছিল নিতান্ত আমাকে।

তালের দর্পণে দৃশ্য অতীত আগামী বর্তমান,
রমণীরা দেহ মাত্র, ভালবাসা মৃত্যুর সমান॥

মিলনের উপত্যকায়

শান্তি লাহিড়ী

দেখ, দীপ্ত হিরণ্ময় শিখরে শিখরে দেখ জ্বলে
কি উদার নীলিমায় স্ফটিকের মত স্বচ্ছ রোদ
তারি তীব্র স্পর্শে জাত দেওদার, পাইন, পাথর—
তুহিন রাত্রির কোলে যে ছিল জীবন থেকে দূরে।

পাহাড়ী পথের বাঁক, সোত্রহীন উচ্ছল ঝুলেরা,
স্পন্দিত তন্দ্রীতে খাড়া কিছু শুভ্র, কিছু সরু লতা,
তারি এক পাশ দিয়ে উচ্ছলিতা—নারীর শরীরে
কি অপূর্ব পদক্ষেপে হেঁটে চলে পৃথ্বলিতা ধরণী।

দেখ জ্যোৎস্নাখণ্ড কাঁপে—দূরে মতে রাতের প্রহরী,
বাইরে বিষণ্ণ দুঃখ পাথরে পাথরে কথা বলে,
ওঠা নামা কত পথ তারি মাঝে অভিজ্ঞতা বাড়ে।
কাচের আয়নায় রুদ্ধ-ঘরে রাখে প্রাণের উষ্ণতা।

ঘরের দুয়ারে কাঁদে টুকরো টুকরো কুয়াশার কুচি-
দিগন্তে পাখির মত ওরা যেন সশব্দ পাখায়

শিলঙের উপত্যকায়

সূর্যে সাঁতার কাটে। তারপর নির্জনতা আসে—
হঠাৎ আছড়ে পড়ে হাটুশোঁজা দিনের চরণে।

নিঃসঙ্গ সাতার ঘরে হাসি আসে, কান্নার হুপাশে
তারা থাকে বারোমাস। পল্লীতে পল্লীতে তাই যায়
সমস্ত রাত্তির ধরে, কাল কের সকালের আগে
শুরু হবে দৈনন্দিন কাজকর্ম—হাট বেচা কেনা।

দেখ, তীব্র আলো জ্বলে—সরজ্জল যৌবনের সিঁথি,
রক্তাভ চন্দনে সুখ দেখ ভরে গাইনে, পাথরে।
নিপুণ শিল্পের মত কাচঘর। নিবিড় সুখের
স্পর্শে জ্বলে দেখ ওই হিরণ্ময়ী পর্ব্বতের চূড়া।

দিনযাপন : অগাষ্ট, ১৯৬০

দিব্যেন্দু পালিত

১

মাঝে মাঝে মনে হয় এরা আছে, এরা বেশ আছে।

কে আমার কানে কানে ব'লে যায় : সভীর সময়
শুরু হলো ; এইবার শান্তিপ্রিয় মৃত্যুদের মুখ
একে একে ভেসে উঠবে যুবতীর যৌবনের জলে।
তাহ'লে কী বেঁচে যাবো অনায়াসে, প্রজ্ঞার কৌশলে ;—
এক মুখ ভ্রূণ নিয়ে ; পিত্ত, অম্ল, রক্তে আরো সুখ !
(শান্তি প্রসবের কথা গন্ধময় চতুর্দিকে গোল হয়ে ঘোরে।)
অ্যামিডি নির্ভুল হ'লে আগামী বছরে
আরো দুই ইঞ্চি টাক হবে।
আয়নার মুখ কিংবা যুবতীর ডিম প্রতিদিন—
আর্তনাদ ফিরে গেছে পুরনো শৈশবে !

২

তবুও মায়ের কথা মনে পড়ে রাত্রি গাঢ় হ'লে।
অন্ধকার বিছানায় যবে হয় তোমার অরাতু
ক্ষীত হলো, যেন আমি পুনর্বার সুস্থ হ'তে পারি।
আরো বেশি অন্ধকার জোনাকির মতো জ্ব'লে ক্ষয়;
জোঁকের মতন ধীরে শুঁষে নেবে বাইশের আয়ু।
বাসি কাগজের কোণে হলুদ চোখের মতো অল্প সময়।

৩

সকালে চায়ের কাপে, রেস্তোঁরায় ধনটা পাঁঠিশে
তেলে জলে অবিকল মেশে—
যেহেতু রক্তে আমি পেয়ে গেছি পঞ্চমের স্বাদ।
বেঁচে থাক কালিকাপ্রসাদ,
এখনো প্রেমের নামে চতুর্দশপদী লেখা হয়।
কিংবা, সময় হ'লে ভাবা যাবে ঈশ্বর এখনো
আত্মহত্যা করেন না কেন!
কথাটা পুরনো; কিন্তু রোমন্থন সহজ হওয়ায়—
এক প্রস্থ অন্ধকারে তিন প্রস্থ আলো মিশে যায়।

৪

মেঘ, বৃষ্টি দাও। বুকে প্রেম দাও। অন্তত বাঁচাও।
কোন চিত্রে হাত দিলে গাঢ় রক্তে স্তব্ধ শব্দ হবে!
কার বুকে সাদা হবো, কবে?
রীণা কি আমার চেয়ে অতিস্নান বেশি পড়েছিলো।
তা না হ'লে বিষাদ ছাড়াও—
আলের ওপর দিয়ে কল্যাণী কেমন ক'রে হাঁটে।
আমার নিজের নাম চকচকে বইয়ের মলাটে—
প্রেমার গলা নেড়ে প্রশ্ন করে: কেমন, ভালো তো?
অরোধন অন্ন দিয়ে পরিতৃপ্ত গৃহিণীর মতো।

৫

হয়তো বা একদিন সকাল বেলায়—
শুয়োরের মাংস হয়ে যাবো।

ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী

প্রফুল্লকুমার দাস

যিনি ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারের সংস্কৃতিকে ধারণ করে আসছিলেন তিনি আজ আর ইহলোকে নেই। গত ১২ই আশ্বিন (১৯৬০) শুক্রবারে ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী পরলোকগমন করেছেন। তিনি পরিণত বয়সে তিরোধান করলেও তাঁর মতো ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য হারানো বেদনাদায়ক।

এই ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য যে কি, সেটা যারা অল্প সময়ের জন্যও ইন্দিরা দেবীর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরাই অনুভব করেছেন। শ্রী-হ্রী-কী-সম্পন্না, জননীর ন্যায় স্নেহপরায়ণা, সাহিত্য ও সংগীতে পারদর্শিনী এবং কুলক্রমে ও স্বভাবগুণে যাকে-পর-সেই অভিজাত বঙ্গনারী বলতে যা বোঝায় ইন্দিরাদেবী ছিলেন তাই-ই। সব চেয়ে বড়ো কথা হল, তাঁর সান্নিধ্যে আসার পথে কোনোপ্রকার কৃত্রিম কৌলিন্যের বাধা ছিল না কারোই। তাই ব্যক্তিনির্বি-শেষে সকলেই তাঁর খুব কাছে যাবার অধিকার সহজে পেত। আমরাও তাঁর স্নেহ, আশীর্বাদ ও শিক্ষা পেয়ে ধন্য হয়েছি—তাঁর নানাগুণের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছি।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কন্যা ইন্দিরা মাত্র পাঁচ বছর বয়সে মাতা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ও দাদা সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিলাত যান। পরে যান সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ। বিলাত-প্রবাসকালেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইন্দিরাদেবীর স্নেহের সম্পর্ক বিশেষভাবে গড়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রস্মৃতি গ্রন্থে তিনি বলেছেন, "রাবকাকা স্বভাবতই ছোট ছেলে ভালোবাসতেন—আমাদের ভাইবোনকে ঘিরে তাঁর হাতে খড়ি হয়। বিলেতে গিয়ে আমাদের সঙ্গে সেই যে তাঁর ভাব হয়ে গিয়েছিল, সেটা শেষ জীবন পর্যন্ত অটুট ছিল।" তার শিক্ষা সমাপনান্তে অসামান্য সাহিত্যিক, পরে সবুজপত্র-সম্পাদক, শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর সহিত ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর বিবাহ হয়।

জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারের যে সংস্কৃতি ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষকে প্রভাবিত করেছিল, ইন্দিরাদেবী ছিলেন সেই সংস্কৃতির শেষ যোগ-সূত্রধারিণী। তাঁর কথায় বার্তায়, আচার ব্যবহারে, কাজে কর্মে সেই সংস্কৃতির রূপ মূর্ত হয়ে উঠত। আর ছিল রবীন্দ্রনাথের মতোই তাঁর হৃদয়ের তারুণ্য যা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি রক্ষা করতে পেরেছেন। তাই যাঁরা খুব অল্প সময়ের জন্যও তাঁর সান্নিধ্যে আসতেন, তাঁরাও এই মহীয়সী মহিলার ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হতেন। নামাজনে তিনি অলংকৃতা ছিলেন অথচ সেজন্য কোনোরূপ আভিজাত্যের লেশমাত্র ছিল না। তাঁর সদ্গুণ সম্বন্ধে আলোচনা করার সাধ্য আমার নেই। শুধু রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কিত বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমাদের যে যোগাযোগ ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল সে-সম্বন্ধে দু-চার কথা নিবেদন করব।

ইংরাজী ১৯৪১ সাল। আমরা তখন শান্তিনিকেতনে সংগীত ভবনের ছাত্র। ডিসেম্বর মাসে শুনলাম ইন্দিরাদেবী ও প্রমথ চৌধুরী এসেছেন, শান্তিনিকেতনে থাকবেন। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ গিয়ে প্রণাম জানিয়ে এলেন। অপরিচয়ের সঙ্কোচবশতঃ প্রথমে যেতে ভরসা পাই নি। পরে ক্রমশঃ যোগাযোগ হতে লাগল—তখন বুঝতে পারলাম তাঁর কাছে যাওয়ার পথে কোনোই প্রাচীর নেই। 'পুনশ্চ'র সামনের ঘরে প্রমথবাবু বসে, বাঁ দিকের টেবিলে ইন্দিরাদেবী কিছু লিখছেন—এ ছবিটি এখনও স্পষ্ট মনে আসে।

যতদূর মনে পড়ে, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কে রচে এমন সুন্দর বিশ্বছবি' সরল রাগ ও কাঁপতালের ক্রুপদাঙ্গ গানটি ইন্দিরাদেবীর কাছে আলাদাভাবে প্রথম শিখি। তাঁর ধারণা ছিল গানটি আমার গলায় মানাবে। সত্যি কথা বলতে কি, ক্রুপদ গাওয়ার মতো যোগ্যতা তখনও আমার হয় নি। কাজেই গানটি আমার কণ্ঠে আসতে যে যথেষ্ট সময় লেগেছিল, অর্থাৎ তাঁকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছিল, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আশ্চর্য ধৈর্য দেখেছি তাঁর—একটুও বিরক্ত হন নি। গান শেখানোর সময় তাঁর এরূপ ধৈর্য পরে বহুবার বহু ক্ষেত্রে দেখেছি এবং তাঁর কাছে যাঁদের গান শেখার সুযোগ হয়েছে তাঁরা সকলেই জানেন।

এক বর্ষামঙ্গলের কথা মনে পড়ে। 'বিশ্ববীণা রবে বিশ্বজন মোহিছে' গানটি গাওয়া হবে। শৈলজাদা১ বললেন, গানটি ইন্দিরাদেবী শেখাবেন।

সংগীত ভবনের মাস্টার মশায়ের ঘরে মহড়া হল—বেশ বড়ো দল। ইন্দিরাদেবী শেখাবেন। 'মোহিতে' 'জলিবা' প্রভৃতি অংশগুলির সুর কতবার করে অভ্যাস করিয়ে ঠিক করিয়ে দিলেন। তার মধ্যে 'সরল সংগীত মধুরিমা' অংশের সুরে কণ্ঠের সামান্য গরমিল আর দূর হয় না। তাঁর পরিশ্রম দেখে শৈলজাদা বললেন, মেয়েরা গাও—গাইল মেয়েরা—ঠিক আছে। পরে বললেন, ছেলেরা গাও—গাইল ছেলেরা—এখানেই গরমিলের ব্যাপারটা ঘটছে বোঝা গেল। একজনকে নির্দেশ করে ওই অংশ গাইতে বললেন। তখন গরমিলের কারণটা বোঝা গেল। ইন্দিরাদেবী পরে মন্তব্য করলেন, 'শৈলজাবাবু মাছোড়বান্দা, আদায় ঠিক বের করেছেন।'

সংগীতভবনের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে উঠে ইন্দিরাদেবীর কাছে নিয়মিত রবীন্দ্রসংগীতের ক্লাস করার সুযোগ হল। আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ তৎকালীন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসংগীতের কর্তৃপক্ষ সকলের কাছেই গান শেখার সুযোগ হয়েছিল—গোড়াতে শিখি শান্তিদার ২ কাছে, পরে শৈলজাদার কাছে, শেষে ইন্দিরাদেবীর কাছে। তাই একটি চমৎকার ঘরোয়া পরিবেশে 'পুনশ্চ'তে ইন্দিরাদেবীর কাছে আমাদের ক্লাস হত। গান শেখানোতে তিনি কখনো ক্লান্ত হতেন না। কত ছেলেমেয়ে আসত তাঁর কাছে গান শেখার আবদার-আবেদন নিয়ে—'বিবিদি, অমুক গান শিখব'। কোনোদিন 'না' বলতে শুনিনি, সময় নির্দেশ করে দিতেন। যে-সময়ের কথা বলছি তখনই তিনি বৃদ্ধা। কিন্তু তাঁর কণ্ঠে অলংকরণ ছিল পরিষ্কার ও মার্জিত। আমাদের সংগীতশাস্ত্রে 'স্খলিত' বলে একটি শব্দ আছে: অর্থাৎ কণ্ঠ ঠিক-ঠিক স্বরস্থানে না পৌঁছলে তাকে স্খলিত বলা হয়। আজকাল তো এই দোষের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তের অভাব দেখি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস, ইন্দিরাদেবী তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। আর একটি কথা, যাঁরা সংগীতের সমঝদার তাঁরা জানেন এক-একজন গায়কের কণ্ঠে সবগুলি স্বরের মধ্যে কোনো একটি বিশেষ স্বর সর্বাপেক্ষা বেশি অভিব্যক্ত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে হয়, ইন্দিরা-দেবীর কণ্ঠে শুদ্ধ গান্ধার স্বরটির চমৎকার অভিব্যক্তি হত।

একটা মজার ঘটনা বলি। ইন্দিরাদেবীর কাছে রবীন্দ্রসংগীতের ক্লাস করার কালে আমাদের মধ্যে কারো কারো পেদুকে রক্ষিত তাঁর cheese ইত্যাদি খাবারের প্রতি বিশেষ লোভ ছিল। লোভ অবশ্য সকলেরই ছিল

তবে অনেকে সেটা সমরণ করে নিত। তার মধ্যে একজন দুঃসাহসী হয়ে সুযোগ বুঝে সেই খামারের কিছুটার সদ্ব্যবহার করেছিল। কর্ত্রী যে পরে টের পান নি, এমন মনে হল না, কিন্তু কিছুই বললেন না। অন্যের ক্ষেত্রে যেটা বিরক্তির কারণ হতে পারত, স্নেহ দিয়ে তিনি তা গ্রহণ করলেন।

১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি মেয়াদী জীবিকার উদ্দেশ্যে আমাকে শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় আসতে হয়। ওই বছরের শেষের দিকে বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের রবীন্দ্রসংগীত স্বরলিপি দপ্তরের কাজে নিযুক্ত হই। অনাদিদা ৩ এ দপ্তরের প্রধান। এ সময় থেকে ইন্দিরাদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগের সুযোগ কমে গেলেও, চিঠিপত্র মারফত তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ শেষ পর্যন্ত ছিল। তাঁর উপদেশ, নির্দেশ, আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হয়েছি। এ এক বিরাট পর্ব—স্বতন্ত্রভাবে বিস্তারিত লেখার যোগ্য। সংক্ষেপে বলব, রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে তিনি আমাদের পথ-প্রদর্শিকা ছিলেন। গুরুদেবের বহু পুরনো গানের সুর-যে স্বরলিপিতে রক্ষিত হয়েছে এবং আমরা যে পুরনো গানগুলি গাইতে পারছি, এর মূল ইন্দিরাদেবী। ওই-সব গানের সুর তিনি স্বরলিপিবদ্ধ করে না দিলে আর কারো পক্ষে উদ্ধার করা সম্ভবপর ছিল না। স্বরলিপি সমিতির সভানেত্রীরূপেও তিনি শেষ পর্যন্ত স্বরবিতান গ্রন্থমালা সম্পাদনার কাজে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছেন। শান্তিনিকেতনে থাকা-কালীন একটি মোটা বড়ো বাঁধানো খাতা তাঁর কাছে দেখতাম। পরে যখন খাতাটি দেখার সুযোগ হল, দেখলাম শৈলজাদার অনুরোধে লিপিবদ্ধ পুরনো রবীন্দ্রসংগীতের স্বর-লিপির খাতা। এটিকে তিনি 'খুদির খাতা' বলতেন; আমাদের কাছেও খাতাটি ওই নামেই পরিচিত—বর্তমানে রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে।

গরমের ছুটিতে কয়েকবার ইন্দিরাদেবী জোড়াসাঁকোতে ছিলেন। একবার পুলিনদা ৪ বললেন, 'পুরনো রবীন্দ্রসংগীতের বাকি স্বরলিপি আমায় করে দাও'। স্বরলিপি পাওয়ার উৎসাহে প্রায়ই তাঁর কাছে যেতাম। বলতেন, 'অর্ধশতাব্দী আগের স্মৃতি মন্থন করে স্বরলিপি করছি। কী করে যে সব মনে আছে আশ্চর্য হচ্ছি'। বেশ রসিকতা করে বলেছিলেন, 'পুলিন আমার জোড়াসাঁকোর আটকে রেখে একগুচ্ছ স্বরলিপি করিয়ে নিল'। তত্ত্ব ও তথ্য সম্বন্ধে গবেষণার কাজ দেখলে খুব খুশি হতেন। এজন্য রসিকতা করে কামাইদাকে ৫ 'নাছোড়বান্দা' গবেষক আখ্যা দিয়েছিলেন।

'হৃদয় নন্দন বনে নিভৃত এ নিকেতনে' গানটি ইন্দিরাদেবীর কাছে শিখেছিলাম। ওঁর কাছেই প্রথমে জানতে পারি গানটি 'উত্তরবন্ধন নব আবীর মে কুমকুম', হিন্দিগান ভাঙা। এ থেকে উৎসাহ পেয়ে আরো কতগুলি মূল হিন্দিগান তালিকাবদ্ধ করেছিলাম। শান্তিনিকেতন থেকে চলে আসার পর ওঁর অন্য উৎসাহী ছাত্রীর দ্বারা তিনি তালিকাটি আরো পুষ্ট করান। পরে তিনি এই তালিকাটিকে আরো সম্পূর্ণতর করেন ও 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণী সংগম' গ্রন্থে যোগ করেন। এই গ্রন্থখানা আকারে ছোটো হলেও রবীন্দ্রসংগীত-অনুশীলনকারীদের কাছে এক বিরাট গবেষণার ক্ষেত্র হিসাবে উপস্থাপিত। গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকর্ত্রী বলেছেন :

"গানের প্রথম পংক্তি মাত্র দিলেও, আকর গ্রন্থাদির উল্লেখ থাকাতে মূলানুসন্ধান অসম্ভব না হতে পারে। সুরে তালে উভয়বিধ গান শোনার সৌভাগ্য যাঁদের হবে, তাঁরা দেখবেন যে, এর মধ্যেও তিনি (রবীন্দ্রনাথ) কতখানি মৌলিকতা দেখিয়েছেন।"

সম্প্রতি প্রকাশিত 'রবীন্দ্রস্মৃতি' গ্রন্থখানা খুব মূল্যবান মনে করি। বিশেষ করে তার সংগীতস্মৃতি ও নাট্যস্মৃতি অংশ দুটি রবীন্দ্রসংগীতজ্ঞদের পক্ষে গভীরভাবে অনুধাবন-যোগ্য। তার মধ্যে কয়েকটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না :

"আমাদের সংগীতশাস্ত্রে যাহার রাগিণীটিকে বসন্তকালের নবকিশলয় প্রকাশের উপযোগী বলে মনে করা হয়। কিন্তু রবিকাকা এই যাহার রাগিণীকে অনেক গানে মনের আবেগ প্রকাশের বাহনরূপে নতুন রূপ দিয়েছেন। যেমন 'গেল গেল নিয়ে গেল' 'রাখ্ রাখ্ কেন্ বসু' প্রভৃতি। সিন্ধুর মত করুণ কোমল রাগকেও কেমন উদ্দীপনা প্রকাশের কাজে লাগিয়েছেন সেটা 'আমার বোলো যা গাহিতে বোলো না' গানে লক্ষণীয়। অবশ্য সুর ও গায়কী দ্বারা গায়কেরও সে ভাবটা ফুটিয়ে তুলতে হবে। আমার মনে হয়, এসকল ক্ষেত্রে নাট্যরস নামক একটি নবতর রসের অবতারণা করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। আমাদের সংগীতে উদ্দীপনার অভাব রবিকাকা নানারকমে পূরণ করেছেন, ওঁর সংগীতজ্ঞগণ চেষ্টা করলে আরও এমন দৃষ্টান্ত মনে আনতে পারবেন।"

রবীন্দ্রস্মৃতি গ্রন্থের নাট্যস্মৃতি অংশে গীতিনাট্য বাল্মীকিপ্রতিভার গানবিশেষে নাচের প্রয়োগ সম্পর্কে ইন্দিরাদেবী বলেছেন :

"এইসব নামের মধ্যেই বোধ হয় রবিকাকার পরবর্তী নৃত্যকলাবিকাশের অঙ্কুর নিহিত। হয়তো পূর্বসংস্কারবশতই আমি অনেক সময়ে বলে থাকি যে, এই নৃত্যকলা অভিনয় কলার গলা টিপে মারছে। অভিনয়কলা মুখের ভাব ও কণ্ঠস্বরের উপর বেশি নির্ভর করে, আর নৃত্যকলা হয়তো বহুল নৃত্যভঙ্গির উপর বেশি নির্ভর করে। সকলেই জানেন, রবিকাকা গগনদাদা আর সিঙ্গ ঠাকুরবাড়ির শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ছিলেন। অবনদাদারও হাতরসের অভিনয়ে বিশেষ ক্ষমতা ছিল। সেজন্য আমার ভয় হয়, পাছে বর্তমান নৃত্যকলা সেই অভিনয়ের ধারা ব্যাহত করে। অবশ্য ভাবপ্রকাশ নিয়েই কথা, এবং নৃত্যও যে কলার একটি বাহন সেকথা স্বীকার না করে আমি নিজেকে নিতান্ত সেকেলে প্রতিপন্ন করতে চাই নে।"

এ রকম আরো অনেক অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত আছে। অবশ্য ইঙ্গিতগুলি ধরতে পারা চাই। যথার্থ বিচার বিশ্লেষণ করলে তবেই ইঙ্গিতগুলি বুঝতে পারা যায়। ইতিমধ্যেই কেউ কেউ ওঁর একটি উক্তির ঠিক-ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। 'রবীন্দ্রস্মৃতি'তে গ্রন্থকর্ত্রী লিখেছেন, "আমি রবিকাকার কাছে আলাদা ক'রে বসে কখনো গান শিখেছি বলে মনে পড়ে না।" এ উক্তিটি বুঝতে হলে সঙ্গে সঙ্গে "ছেলেবেলা থেকেই আমরা গান বাজনার আবহাওয়াতে মানুষ" "কেবল বাড়িময় হাওয়ায় হাওয়ায় যে গান ভেসে বেড়াত তাই শুনে শুনে শিখেছি" ইত্যাদি উক্তিগুলিও অবশ্য মনে রাখতে হবে। এই আবহাওয়ার যে কী গুণ, অবিরত সোনার যে কী গুণ তা গুণীমাত্রই জানেন—ব্যাখ্যা করা বাহুল্য। অনেক ব্যক্তিদের কাছে শুনেছি রবীন্দ্রনাথ নিজেকে ওস্তাদ বলে স্বীকার করতেন না, ওঁর লেখাতেও আছে। যিনি ওস্তাদের ওস্তাদ তিনি নিজেকে ওস্তাদ বলে স্বীকার করবেনই বা কেন? তার মানে এ নয় যে, ওস্তাদ-গায়কীদের পথ ওঁর অজানা অচেনা ছিল বা আসল আরগায় ওস্তাদের চেয়ে ওঁর দখল কম ছিল। যে উঁচুতে যেতে পারে, তার পক্ষে মৌজ-প্রতি-যোগিতায় পয়লা নম্বর হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

ইন্দিরাদেবী অনেক রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অনেক রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পী ওঁর সান্নিধ্য পেয়েছেন। ওঁদের আত্মসমালোচনার দিন এসেছে। অর্থাৎ, রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে ধারা বহন করে আসছিলেন, ওঁর রবীন্দ্রসঙ্গীত-সম্পর্কিত কর্মধারাতেও যে ধারা সার্থকভাবে রূপ নিয়েছিল, সে

যারা আমরা কতটা গ্রহণ করতে পেরেছি এবং গ্রহণ করেও কতটা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছি তা শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন। যদি সেই ধারাটি আমরা অন্তরে বাহিরে গ্রহণ করতে পারি, তারই সঙ্গে নিজের শিক্ষা ও সাধনা সম্পূর্ণ মিলিয়ে নিতে পারি, তবেই তাঁর প্রতি সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে। তাঁর কথায়-বার্তায়, আচার-আচরণে, চিঠি-পত্রে দুই শতাব্দী জোড়া সংস্কৃতির যে ছাপ অনায়াসে পাওয়া যেত, তাঁর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তার অবসান হল—এ যেন না হয়। মহৎ জীবনের ধারা যুগ থেকে যুগে জীবন থেকে জীবনান্তরে বয়ে চলে—এ ক্ষেত্রেও তার অন্যথা না হয়। স্বর্গতা ইন্দিরাদেবীকে স্মরণ আজ এই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

পরিশিষ্ট ১

সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মধ্যম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁর মাতা। ইংরাজী ১৮৭৩ সালের ২৯শে ডিসেম্বর বোম্বাই প্রদেশে বিজাপুর জেলার অন্তর্গত কালাড্‌গিতে ইন্দিরাদেবী জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৮ সালে তিনি তাঁর মাতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিলাত গমন করেন। কিছিদধিক দুই বৎসর পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে দিঘলায় অকল্যাণ্ড স্কুলে এবং পরে কলকাতা লরেটো হাউস কন্‌ভেন্টে বিদ্যাশিক্ষা করেন। ১৮৯২ সালে তিনি ফরাসী ও ইংরাজী ভাষা সহ বি.এ. পাশ করেন। ইংরাজী ভাষায় প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সরোজিনী পদক' প্রাপ্ত হন।

১৮৯৯ সালে কলকাতার বিখ্যাত চৌধুরী-পরিবারের অন্যতম সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। প্রমথ চৌধুরী-সম্পাদিত সবুজপত্রে ইন্দিরাদেবী একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

আজীবন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের সংগীতের পরিবেশে ইন্দিরা

---

১ শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার। ২ শ্রীশান্তিদেব ঘোষ। ৩ শ্রীঅমলিকুমার দস্তিদার। ৪ শ্রীপুলিনবিহারী সেন। ৫ শ্রীকানাই সামন্ত।

দেবী প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় প্রকার সংগীতেই দক্ষতা অর্জন করেন। রবীন্দ্রসংগীতের আদিযুগের গানগুলির ভাণ্ডারী ছিলেন তিনি। আনন্দসভা, সংগীতসম্মিলনী, প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট থেকে তিনি বাংলাদেশে সংগীতের প্রচার এবং শিক্ষার আয়োজন করেছিলেন।

ভারতীয় নারী-জাগরণের অন্যতম নেত্রীরূপে ইন্দিরাদেবী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন, যথা বেঙ্গল উইমেন্‌স্ এডুকেশন লীগ, অল ইণ্ডিয়া উইমেন্‌স্ কন্‌ফারেন্স, হিরণ্ময়ী বিধবাশ্রম, সংগীত-সম্মিলনী। বিভিন্ন সময়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলির সভানেত্রীর পদেও তিনি বৃতা হয়েছেন।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে ইন্দিরাদেবী শান্তিনিকেতনে স্থায়ীভাবে বাস করতে আসেন। শান্তিনিকেতন সংগীত-ভবনের সহিত প্রথমেই রূপে তিনি বহুদিন যুক্ত ছিলেন। বিশ্বভারতীর স্বরলিপি-সমিতির মাননীয়া সদস্যারূপে তিনি শেষ দিন পর্যন্ত রবীন্দ্রসংগীতের সুরক্ষার সচেষ্ট ছিলেন। শান্তিনিকেতনে এসে 'আলাপিনী' নামে মহিলাসমিতি সংগঠিত করেন এবং 'ঘরোয়া' নামে মহিলা-পরিচালিত পত্রিকার প্রকাশ আরম্ভ করেন।

১৯৪৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'সুরসরোজিনী' পদক প্রদান করেন। ১৯৫৩ সালে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তাঁর সংবর্ধনা হয়। ১৯৫৬ সালে বিশ্বভারতীর অবৈতনিক উপাচার্যপদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৫৭ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করেন।

গুরুদেবের স্নেহের পাত্রী ইন্দিরাদেবী—রবীন্দ্রসংগীত এবং রবীন্দ্রজীবনের বহু তথ্য 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণী সংগম' ও 'রবীন্দ্রস্মৃতি' গ্রন্থে পরিবেশন করেছেন। গুরুদেবের 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থের সংকলিত প্রায় সবগুলি চিঠিই ইন্দিরাদেবীকে লেখা।

২৭শে শ্রাবণ, ১৩৬৭ শুক্রবার তিনি পরলোকগমন করেন।

পরিশিষ্ট ২

রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

নারীর উক্তি,
বাংলার স্ত্রী-আচার,
রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম,

পুরাতনী,
হিন্দুসংগীত (প্রবন্ধ চৌধুরী-সহ),
রবীন্দ্র-স্মৃতি।

পরিশিষ্ট ৩

ইন্দিরাদেবীর উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথের শুভাশীর্বাদ :

দাঁড়াও সে অন্তরের শান্তিনিকেতনে
চিরজ্যোতি চিরছায়াময়।
কলহীন দ্বৈধহীন নিভৃত আলয়ে
জীবনের অমৃত আলয়।
পুণ্যজ্যোতি মুখে লয়ে পুণ্য হাসিখানি,
অন্নপূর্ণা-জননী-সমান,
মহাসুখে সুখ-দুঃখ কিছু নাহি মানি
করো সবে সুখশান্তি দান

পরিশিষ্ট ৪

ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী-রচিত একটি গান ও স্বরলিপি

মিশ্র সুরট-বাহার। একতাল

তাঁরে রেখো রেখো তব পায়,
যেথা ভবের আশা ফুড়ায় হে, ভবের আশা ফুড়ায়।
যেথা জরা নাহি আসে, মরণ নাহি গ্রাসে, শোক তাপ দূরে যায়,
সেই শীতল অমৃত ছায়।
যিনি সবারে ত্যজিয়ে তোমারে খুঁজিয়ে ফিরেছেন ধরাধামে ;
তাঁরে বিষয়-বাসনা ভুলাবে রত করিলে তোমারি কাজে।
এবে করমে ধরম, ধরমে পুণ্য, ফুরালো সে জীবন ;
আজি অমাথ মোদের কর কর তব কল্যাণ বিতরণ।

ওঁর শেষ সাধ ছিল 'বাতী যাব,' হল পূর্ণ সে আকিঞ্চন,
ওগো জগত-জননি, লভিলেম তব শান্তির নিকেতন।

কথা, সুর ও স্বরলিপি : ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী

সা সা -া II { রা মা মা । পা ধা মা । পা -া -া । (মপা রমা -া)} I -া পাপা I
ওঁ রে ০ রে খো রে খো ভ ব পা ০ র্ ওঁ০ রে০ ০ ০ যে যা

I মা পা পা । পা ধা মা । পা -া ধা । পর্সা -পধা -পা I
ত বে র আ শা ছু ড়া ০ র্ রে০ ০০ ০

I ধা পা পধা । পা দা মা । পা -া -া । -া পা পধা
ত বে র০ আ শা ছু ড়া ০ ০ র্ বে ধা০

I মা পা পা । পা পা পা । মা পা পা । র্সা র্সা র্সর্সা I
অ রা মা হি আ সে ম রণ্ মা হি ত্রা সে০

I র্সা পা ধপা । ধা পা পধা । মা পা পা । পর্সা র্সা র্সধা I
অ রা মা০ হি আ সে০ ম রণ্ মা হি০ ত্রা সে০

I পা ধা ধপা । পা মা ধা । পা -া -া । মপা রমা -া
শো ক তা০ প ছু রে যা ০ ছ্ সে০ ই০ ০

I রা মা মা । পা পধা মা । পা -া -া । সা সা -া
শী ত ল অ ঙ্গ ত ল ০ র্ ওঁ রে ০

পা পধা II { মা পা পা । পা মা মা । মা র্সা সা । র্সা র্সা র্সা
বি মি০ স মা রে তা মি রে ভো মা রে ঘু মি রে

I মা র্সা র্রা । -র্রা র্রা র্সা । পর্সা -র্রা র্সা । (-পা ধা পধা)} I -পা ধা পা I
ঝি রে ছে ন্ ধ রা মা০ ০ রে ০ বি মি০ ০ ধী রে

র
I মা রা মা । মা পা পা । মা পা ধা । -র্সর্রা র্সা র্সা I
বি ধ র মা স মা ছু পা রে ০০ ধী রে

I পা ধপা মা । পা পা পধা । মা পা পা । -র্সা দা র্সা I
বি ম০ ব যা স মা০ ভু লা মে ০ র ত

র র ম
I গা রা রা । রা পা পা । মা -পা রা । -গা পা পা
ক ঝি লে তো মা ঝি কা ০ ছে ০ "তাঁ রে"

সা সা II { রা রা রা । রা -পা পা । মা পা পমা । রা -সা সা
এ যে ক র মে ধ ন্ ম ধ র মে০ পূ ণ ণ

I রা মা মা । পা -ধা মা । পা -া -া । (মগা -রগা সা)} I -া পা পধা I
ভু রা লো সে ০ জী ব ০ ম্ আ০ ০০ হা ০ আ জি০

প
I { মা পা পা । র্সা র্সা -পা । পা ধা ধর্সা । পা ধা পা
অ মা ধ যো সে র্ ক র ক০ র ত ব

র
I রা -পা রা । পা মা গমা । রা -া -া । -া (পা পধা)} I পা -ধা I
ক ন্ লা ণ বি ত০ র ০ ০ ণ্ আ জি০ তাঁ র্

ম
I { মা পা পা । -মা মা মা । মা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা
সে ন্ সা ধ্ ছি ল মা ড়ি যা ব হ ল

I মা -র্সা রা । র্রা রা র্সা । ধর্সা -র্সা পা । (-ধা পা -ধা)} I -ধা পা পা I
পূ র্ ণ সে০ আ কিন্ চ০ ০০ ম ০ তাঁ র্ ০ ও সো

I রমা রা মা । মা পা পা । মা পা মা । -র্সা র্সর্রা র্সা I
জ০ গ ত জ ন নি ল ভি সে ন্ ত০ ব

I পা -ধা ধপা । পা মা ধা । পা -া -া । মগা রসা -া II II
পা ন্ তি০ র নি কে ত ০ ন্ "তাঁ০ রে০ ০"

[মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরলোকগমনে রচিত। সঙ্গীতপ্রকাশিকা ১৩১১ ফাল্গুন সংখ্যা থেকে গৃহীত]

ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী : স্মৃতিচিত্র

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

সংস্কৃতি বলতে কি বোঝায়, তা নিয়ে সমাজতত্ত্ববিদেরা অনেক গবেষণা করেছেন, কিন্তু আমি সংস্কৃতির একটি নিজস্ব সংজ্ঞা গড়ে তুলতে পেরেছি, মার্জিত রুচি ও মনের একটি অনবদ্য দৃষ্টান্তের সঙ্গে ব্যক্তিগত সান্নিধ্যের ফলে।

মানুষের রুচি ও মন কতখানি পরিমার্জিত হতে পারে, আমার মনে হয়, তার আদর্শ নিদর্শন ছিলেন স্বর্গতা ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী। শুধু বচনে এবং ব্যবহারে নয়, তাঁর বাড়ীতে বেশের মত কিছু দিন বাস করার অভিজ্ঞতা নিয়ে বলতে পারি, অমার্জিত চিন্তাও কোনদিন তাঁর মধ্যে স্থান পেয়েছে কি না সন্দেহ।

ইংরেজের বনেদি ভদ্রতা ও সুন্দররুচির সঙ্গে চৈতন্যের স্বজাতি বাঙালীর বিনয়বোধ ও প্রেমভাব মিশ্রিত হয়ে যে বাঙালীভদ্রতা তৈরী হয়েছিল, আজ তাকে ঘুঘুরা বলে আমরা নাক সেঁটকাতে পারি, কিন্তু সমাজবদ্ধ মানুষ পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার যাকে রাখতেই হবে, তার পক্ষে ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনের সৌন্দর্য বাড়াবার প্রধান পথ হল প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার—মধ্যবিত্ত ভদ্রতার যা একেবারে গোড়ার কথা। সেই ভদ্রতা যখন কেবল মুখোস হয়ে দাঁড়ায়, হারিয়ে যায় তার মাধুর্য, শত চেষ্টাতেও শেষ পর্যন্ত ফাঁকিটুকু ধরা পড়ে যায়। আর ভদ্রব্যবহার যখন ভদ্ররুচি মনের গভীর থেকে উঠে আসে, তখনই প্রকৃত সংস্কৃতির আভাস পাই।

মানুষের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি ও কারো মনে আঘাত না দেওয়ার যে সহজ অপ্রবৃত্তি ভদ্রব্যবহারের মূল উৎস—এই দুটিই ইন্দিরা দেবীর মধ্যে বিশেষ ভাবে অনুভব করেছি।

আমি তাঁর বাড়ীতে বাস করতাম। কর্মচারী হিসেবে, আশ্রিত হিসেবে বললেও অত্যুক্তি হয় না। সেখানে দেখেছি প্রতিটি আশ্রিত ও কর্মচারীর খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। অথচ তাদের ত্রুটি এবং ফাঁকি রোধ করবার জন্য গৃহকর্ত্রী হিসেবে তিনি সমান সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু সেদিক দিয়ে তাঁর চেষ্টা কখনই এমন প্রকট হয়ে পড়ে নি যে, কারো মনে ঘা লাগতে

পারে। মাঁদুমি ঠাকুর খেতে দেওয়ার ব্যাপারে আশ্রিত ও কর্মচারীদের প্রতি পাছে কোন অবহেলা করে, তাই আমাদের খাবার ব্যবস্থা ছিল এমন জায়গায় যেখানে বসে কোন অজুহাতে সেই সময়টা কাটানো তাঁর পক্ষে মোটেই অশোভন নয়। কখনো সেলাই করতেন, কখনো সাংসারিক হিসেবপত্র দেখতেন। পরিবেশনের দিকে তাঁর যে লক্ষ্য তা ছিল একেবারে অলক্ষ্যে।

আত্মীয় ব্যবহারের অন্তরঙ্গতা আর সামাজিকতার ফরমালিটি এই দুয়ের মাঝখানে এমন শোভন ও শালীন ছিল তাঁর সকলের সঙ্গে ব্যবহার যে, কোথাও কোনখানে চোখে বা মনে এতটুকুও আঘাত লাগত না তাতে। সকলের সঙ্গে সব অবস্থায় মিষ্টব্যবহার অন্তর থেকে উদ্ভূত হচ্ছে এমন বোধ জাগত।

আমার বিশ্বাস, এবং তাঁকে যতটুকু দেখেছি ও জেনেছি তা থেকেই এ বিশ্বাস জেগেছে যে, তিনি কারো কোন অপরাধ বা নীচতার পরিচয় পেলেও মনে তা ঠাঁই দিতেন না। অস্বীকার না করলেও অবহেলা করতেন। অন্যকে নীচু ভাবলে নিজের মনও নীচু হয়ে যায়, অন্তত সাময়িকভাবে, এমন একটা নীতির ইঙ্গিত পেয়েছি তাঁর কথায় এবং ব্যবহারে।

কিন্তু অন্তরব্যবহারের প্রকাশমান মানসিক সৌন্দর্যই ইন্দিরাদেবীর একমাত্র বৈশিষ্ট্য ছিল না। দৈহিক সৌন্দর্যে তাঁর জুড়ী সচরাচর জন্মায় না পৃথিবীতে—একথা যাঁরা তাঁকে যৌবনে একবার দেখেছেন তাঁরাই নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করেছেন। আজ তাঁর রূপ কিংবদন্তী। তবু তাঁর মুখ্য আকর্ষণ ছিল রূপে নয়, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তায়। এক কথায় তিনি ছিলেন খাঁটি ইন্‌টেলেক-চুয়াল। রবীন্দ্রনাথ আতুস্পুত্রীকে নিয়ে Hymn to Intellectual Beauty রচনা করেন নি বটে, কিন্তু সেই ইন্‌টেলেক্‌টের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল এমন বহু নিদর্শন আছে।

বীরবলের বৈঠকে যেখানে ইন্‌টেলেক্‌টের প্রচুর অনিবলক হত সেখানে তিনি জমায়েত হতেন না। তদানীন্তন প্রচলিত শালীনতা বোধে। কিন্তু যে সব সূক্ষ্ম দার্শনিক বিচার এবং মন্তব্য হত, সে সম্বন্ধে পৃথকভাবে তাঁকে আলোচনা করতে শুনেছি চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে। এবং আমার মনে হয়েছে, বিচারে তিনি যেমন ছিলেন ঋতধী তেমন ছিল তাঁর প্রজ্ঞা।

প্রমথ চৌধুরীর তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞার সঙ্গে যে ভাবে ইন্দিরা দেবীর প্রজ্ঞা মিলিত

হয়েছিল, আজকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাতে ব্যক্তিত্বের সংঘাত ছিল অনিবার্য। কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করবার দাবি কার্যকরী করেন নি ইন্দিরা দেবী, স্বামীর প্রতি সম্রদ্ধ প্রেমের জন্যই নিশ্চয়। যা কিছু সামান্য রচনা তাঁর প্রকাশিত হয়েছিল, অধিকাংশই সবুজপত্র-এ, তা থেকে বেশ বুঝতে পারা যায়, বাংলাভাষার অতিমূল্যবান ইন্‌টেলেকচুয়াল প্রবন্ধে তাঁর দান সামান্য হলেও অসাধারণ। তিনি আরো অনেক প্রবন্ধ লিখলে সাহিত্য লাভবান হত, আর তাঁর খ্যাতিও যথেষ্ট বাড়ত সন্দেহ নেই। সেই খ্যাতির স্বাভাবিক মোহ তিনি ত্যাগ করেছিলেন ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ এড়াবার জন্য। তাতে বাংলা সাহিত্যের হয় তো ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু দাম্পত্য সমন্বয়ের যে অনবদ্য আদর্শ দেখবার সুযোগ পেয়েছি আমরা, তা দেখার যদি চোখ থাকত সমাজের, তাহলে ইন্‌টেলেকচুয়াল দাম্পত্যজীবন তো দূরের কথা, সাধারণ দাম্পত্য জীবনেও আজ ব্যক্তিত্বের দাবি যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করছে হামেশা, তা থেকে হয় তো আমরা মুক্তি পেতাম।

নারী হিসেবে ইন্দিরাদেবীর নিজস্ব যে মহীয়া ছিল, যেখানে স্বামীর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াতে হত না তাঁকে, সেখানকার কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রেখে স্বামীকে তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্র ছেড়ে দিয়েছিলেন, নিশ্চয়ই জীবনের সমন্বয় প্রয়াসে। নিজস্ব রমণীয় ক্ষেত্রে, গানে, গৃহসজ্জায়, গৃহকর্মে এবং সামাজিকতা রক্ষায় ইন্দিরাদেবীর চৌকোশ দক্ষতার কোন তুলনা পাই নি।

ইন্দিরাদেবী ছিলেন নিঃসন্তানা। দুটি প্রাক্‌স্নুষিতাকে বাড়ীতে রেখে মানুষ করতেন। শুধু তাতেই নয়, বৃহৎ পরিবারের প্রতিটি অংশের প্রতিটি আশ্রিত ব্যক্তির তিনি যে মা'মা ছিলেন, তা শুধু নামে নয়, মাতৃত্বের দশভুজ মহিমায় বিরাজ করতেন তিনি। প্রমথ চৌধুরী তাকে ছিলেন 'সাহেব', কিন্তু সাহেবের স্ত্রী 'মেমসাহেব' ছিলেন না, ছিলেন মা, নিজস্ব সন্তান না থাকলেও মাতৃত্বের মহিমায় প্রোজ্জ্বল।

সূত্রধর সংবাদ

অমিয় চক্রবর্তী

সূত্রধর — "বিদ্যুৎ-কশাতে ছিন্ন শাখিত বৃক্ষের শরীর
যাযাই ঘুকের তক্তা, মাথায় পল্লব চুল নড়ে
আরণ্যিক মৃত্যুশেষে, শুধুই হিল্লোল হাওয়া লেগে।

আর সবই চুপ, আমরা শক্তির কাছুরে, পাঁজরা গুণে'
বিক্রি করি মহাদেহ, সামনে মস্ত কালি চারখানা
ওজনের মেহগনি, দামী বর্মি শালে ও সেগুনে

ভর্তি স্তরে স্তরে সব, শুভ্র, কালো ; দেখো কারখানা।"

সাকরেৎ — "অঙ্ক কষে বলা যায় গাছে গাছে কোন শতাব্দীর
প্রাণচক্র এঁকে গেছে শ্যামপ্রাণ, ছিল কবে জেগে

আদি অতীতির সাক্ষী পৃথিবীতে ঊর্ধ্বমুখ প'ড়ে।
আছে হিসেবের কাঁচ, মাপযন্ত্র, তবুও অসম
স্তোত্রসম ইতিহাস, গড়েছ যা কল্পনার শেষে

শিশুবেলা নারি নারি শিভারের ছবি দেবদারু,
অরিগনে রেড্ উড্, কাশ্মীরে চেনার, হিমালয়ে
ওষধি বনস্পতি আশ্রয়ের সহজ আনন্দে,

উত্তরসূরী

সমর্পিত ছায়া-ফেলা নারিকেল তালের মালঞ্চে,
মালাবারে ; মরীচিকা স্যালিকিক বীপের সংকেতে
আকুল সৈকত চিত্রে।"

সুধাকর "পূজ, সরু তৈবিলে তোমারে
শুদ্ধ ভরু এই ঘরে : তবু এসো দগ্ধ করি তমো
মগ্ন স্মরি শীতরাত্রে,
উনোনে আলানি কাঠে সমো
দারু বহ্নি, দারু অন্ন, দারু মুক্তি শ্মশানের ধারে।"

মায়ের মুখের স্মৃতি

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাকে দু'হাত দিয়ে মুর্তি দিয়ে একদিন ছিলে—
হয়ে গেছো বহুদিন ছায়া—
কদমকটাপার গাছ তবু আজো ফুলে ভ'রে আছে।
সে-সব ফুলের বুকে মায়ের মুখের ছবি দেখি,
কখনো আবার যেন ছায়াই তিমিরে।
একদার উচ্ছোচন কেন যে তলিয়ে যায়
অন্য এক সময়ের অতল গভীরে,
বুঝিনে, বুঝিনে।
মা, তুমি চেয়ো না আর, ঢাকো ঢাকো মুখ—
ফুলের পাপড়িরা বুজে যাবে,
গন্ধ বাষ্প হয়ে যাবে মুক্ত ক'রে ঐকান্তিক কুসুমের বুক।
স্মৃতির আক্ষেপ তবু থেকে যাবে আমাদের ঘিরে
প্রতি দিবসের তীরে তীরে।

যখন ক্লান্ত হবে

অরুণকুমার সরকার

যখন ক্লান্ত হবে ইচ্ছাগুলি
হতাশ মোমের বাতি জ্বলবে ঘরে
প্রখর মনস্তাপে পুড়বে অন্তরে,
দেয়ালে আঁকবে রূপ মায়াবী তুলি।

গভীর মনের মাঝে প্রস্ফুটিত
একটি ফুলের মুখ আনন্দিত
ছড়াবে গন্ধ তার হৃদয় জুড়ে
যখন মোমের বাতি মরমে পুড়ে।

সুখের সিকেলে তুমি পাবে যা তাকে
অথবা সকালে কোনো রৌদ্রস্নাত,
সে-ফুল থাকবে একা অনাঘ্রাত
সুদূর ঊর্ধ্বমূল অবাক শাখে।

অনেক নিবিড় রাতে যখন মনে
স্মৃতির শিল্পী তাঁতে কাপড় বোনে,
সহসা একটি ছবি ছায়ার মতো
এসেই মিলিয়ে যায় বিস্ময়রথে

এবং হৃদয়ে রেখে দারুণ ক্ষত।
প্রখর জ্বালায় যায় মনস্তাপে
হতাশ মোমের বাতি হতাশে কাঁপে
তখনই সে-ফুল হয় রক্তদন্ত।

অধীশ্বর

দিলীপ রায়

অনেকদিনের ভুলে যাওয়া বন্ধু
হঠাৎ হাজির উৎসব মণ্ডপে ;
তার চোখে চোখ রাখলাম।
হরষি দেহ অবনত, কুঞ্চিত মধু কপাল জরায় তার
আবদ্ধ মধু শুভ্রজটা চুল
তারুণ্য ঐ দেহে দিল কারুণ্য অরুপণ
তাই চকিত প্রগল্‌ভতা চমকে।
সুন্দরী ঐ সুবেশিনী অনেকে
ইতস্তত সকৌতুকে তাকাচ্ছে
লক্ষ্য ক'রছে অলঙ্কার ঝটাকে
সমবেত বেশভূষা সকলের (এবং খর যৌবন, গোপনে)
হাসছে উচ্চ কণ্ঠে হঠাৎ সখিরা
মুক্তাদন্ত মাধুর্যে উন্মুক্ত
যদ্যে অভিনেত্রী মনোহারিনী
তেমনি উচ্চ গ্রীবার কাছে মিটোল বাহু তুলে
সংযত কেশ করার অছিলায়
প্রদর্শন করে গর্বে অবয়ব।
মুক্তকর নমস্কার বিনিময়
উচ্চরব রসিকতা পুরুষদের
রক্ষা করে আড়ম্বর আড়ষ্ট,
প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের শিল্প ;
কারণ অকারণ অঘটন (ঘটে যদি)
এমনই এই সভা, ভেঙে যাবে
ঠুনকো কাঁচের বাসনের মতো ;

সতর্কতা অমতিবিলম্বেই
স্মিত বিকশিত হাসির বিতরণ।
বাত পরিচারক গলদঘর্ম
হাঁকাহাঁকি করছে কণ্ঠ কর্কশ
সুঘ্রাণের গন্ধ বাতাস বহনে
অনাহুত দায়মের প্রস্তুত
ভিখারীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা
নিরপেক্ষ অন্ধলোক নির্মম।

(২)

একদা সেই অতি প্রিয়বান্ধবী
চাইল, দৃষ্টি আজও তার লসিত
হাসল একটু, নীরবে তারপরে
চ'লে গেল বিচিত্র সেই যুবতী।
কিছুই নেই, বলার নেই, কিছুই নেই
মূকতার শব্দহীন তরঙ্গর
এমনকি এক অসতর্ক মুহূর্ত
যদি উভয় লজ্জাতেই আরক্ত
মসৃণিত লৌকিকতায় আবদ্ধ
দৃষ্টি রেখে দর্পণে অবিচল
সন্ত্রাসে মিলিয়ে যায় সম্পূর্ণ হতাশ
"ভালোবাসি" এই কথাটি বলা হোতোনা।
(অদৃষ্টকে অশেষ ধন্যবাদ)
এমন কোন অনিবার্য ট্রাজেডী
ঘটেনি এই জীবনে কখনো।
মিলনের যোলোয় প্রচণ্ড মিলন
মূঢ়তার মুহূর্তের বিষাক্ত সংঘর্ষ, নেই।
অব্যাহতি চিরকালের। মুক্ত আমি। স্বাধীন আমি
আমি আমার জীবনের অধীশ্বর।

কোনো মৃত পল্লীকের চিঠি

শুভ্রসত্ত্ব বসু

বিকেলের গোধূলিকে নদী মনে হয়।
পশ্চিমের মেঘ বুঝি সেতুর খেলনা,
অনতিক্রমনীয় নয়।
এই মাটি থেকে দূরে—প্রতিশ্রুতিময়
কোন্ রাজ্যে নিয়ে যাবে?

বিকেল, প্রান্তর, নদী—
সব ভাই মাঝে মাঝে নিতান্ত অচেনা?
সব বুঝি ভুলে যাই—
জীবনের সমুদ্র ও তোলপাড় সাগরের ফেনা?
তবুও করুণ হয়ে বীতরাগ পৃথিবী-বিমুখ
আহুতি কি দিই সব সুখ?
খুঁজি নাকি এক প্রিয় নাম,
আষাঢ়ের আকাশের সুর?

ভোরের শিশির গায়ে
আদরের টুপটাপ্ সাড়া
মৃদু উচ্চারণে কি ঠিকানা এনেছে?
কিম্বা, বেল মল্লিকা ও বকুলের বিকচ বিলাসে
কি খবর ভাসে?
অথবা, ফসল-শেষে রিক্তমাঠে, প্রান্তরে প্রান্তরে
চৈত্রের ধূলায় ধূসরে
কি খবর খুঁজি?

তোমাকে আড়াল করা বিস্মৃতির ব্যাকুল কপাটে
তোমারই ঠিকানা খুঁজি হৃদয়ের হাটে।

তরঙ্গ

চিত্ত ঘোষ

রৌদ্র সহরে খেত মিনার
কোথায় মেঘের স্বাগতা !
সূত্রে বিলীন মনোলীনার
অপাপবিদ্ধ প্রার্থনা।

অপার রাত্রি প্রগল্‌ভ
তারায় তিমিরে পুঞ্জিত,
গুহাচিত্রের সে গন্ধ
তরঙ্গময় তুষার দেশ।

চোখের প্রবাহ আবহমান—
আহা, অনন্ত লোভের দিন
শ্রাবণ স্মৃতির শিকড়ে টান
জলের মুকুরে বিম্বিত।

বৃষ্টিধারায় অতল রঙ
ক্ষুব্ধ নদীর কজ্জলে
সুদূর প্রান্ত অম্বরম্‌
তড়িৎ শিখায় চিহ্নিত।

অন্ধ এখনো অন্ধই
রবির লোকে না দিব্যাম্বর
মুক্তার যখন বন্ধই
পুরোনো প্রয়াস নিরর্থক।

কী দিয়ে ভোলাবে যন্ত্রণা
শিখায় পুড়বে পতঙ্গ
তুমি অমর্ত্য প্রার্থনা
আমাকে আলোয় তরঙ্গ ॥

তারার তিমিরে

শীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

অমাবাসে কেউ-কেউ আলোর শরীরে
যেতে পারে। যায়।

অমাবাসে কেউ-কেউ আশ্বিনের অঘ্রাণ আভার
মত হতে পারে। তারা যদি
অইবস্থ হত, তবে যেত কের স্বর্গরাজ্যে ফিরে
অক্লেশে। কেননা তারা লোভ, রক্ত, ঘৃণা,
হিংসার উপরে উঠে হতে পারে রোদ্দুরের নদী।
এখানে উল্লেখযোগ্য, আমি তা পারি না।

বস্তুত যেহেতু আমি দেবব্রত নই, সুতরাং
দীর্ঘকাল আমি এই অন্ধকারে আছি।
যন্ত্রচালিত, কিন্তু বিকলাঙ্গ, অগণন মুণ্ডহীন মাছি
যেখানে রক্তের স্রোতে ডুবেছে নীচুরে।

মনে হয়, ভুলে গিয়ে ফুল, পাখি, পরিচিত বন্ধুদের নাম
আরো কিছুকাল এই অন্ধকারে থেকে যেতে হবে।

'চিরদিন'

(শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর জন্য)

অরুণ ভট্টাচার্য

কে শুধালো জায়গা নেই, এইখানে অমিয় শহর,
ঘুরে কাছে লোকালয়, মইশীত, আকাশকে তাকি ;
প্রার্থিত যুবক কটি উর্ধ্বমেত্র, মৃত্যুতার সীম
কে গভীর অন্ধকারে তারা গুণবে, অযুত জোনাকি !

সমস্ত বিতান্ত ভুচ্ছ, অপার্থিব মুছে যদস্বপী,
সময়ের আনুবলে গ্রাম যদি বিতান্ত অচেনা,—
মিছে তর্ক, প্রত্যাশিত, কে ডাকবে কে শুনবে তার স্বর
আমরা সব কান্নাকাটি ঘর বাঁধবো বলে বেঁচে আছি ।

ছুটো শব্দ, আর্তনাদ : মানুষের ভাগ্য পরিহাস,—
বাস্তুঘুঘুদেরকো ঘর একাকার ধলিম অধ্যায় ;
গাছে গাছে ফুল ফুটবে, কাক ডাকবে তৃতীয় প্রহরে
আমি রব চিরকাল, বাঁশী বাজবে যমুনা পুলিনে ।

ক্রীড়নক

তুমি নিয়তির ফুল, চিত্রিত সুন্দর,
পুরস্কৃত শাস্তির নির্মাণ ;
কী দুর্বল ছিন্ন নিবে বাহির দুয়ারে
আমি ভীরু, একা, ম্রিয়মান ।

উত্তরসূরী

আমি মিরতির বালা। ওকোলে রাস্তায়
ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছো, নিষ্ঠুর,
আমার চারদিক ঘিরে শুভ্রতা বিরাজে
নিশিদিন অমিত অম্লান।

তুমি সুখী, শিরস্ত্রাণে উজ্জ্বল সাহিকা
আমি আর্ত, বিয়োগান্ত দৃশ্যের নায়ক ;—
অথচ বিধাতা জানে, আমরা উভয়ে
মিরতির দুর্ভ ক্রীড়নক।

একটি প্রতিশ্রুত কবিতা

(ইলা-কে)

বটকৃষ্ণ দাস

যেদিকেই চাও : সমুদ্র চারিদিকে—
প্রতিধ্বনিরা বিপত্তারিণী ;
দূর চেতনার পরিভাষা যাও শিখে,
ত্রিকোণ মরুরে মুখ দেখে নাও, আরি।

এই বালিয়াড়ি, ওই অরণ্যপথ—
যেখানেই যাও : সমুদ্র ঠিক যাবে ;
যেতে যেতে তার কলকাকে অহরহ
অন্ধকারের মন্ত্রণা কিংখাবে।

চারিদিকে দূরসারিত ছায়ার স্নেহ,
নিখিল বিশ্ব মত্তজানু অনুরাগে ;
সমুদ্রে কেন মিছে ভয়, সন্দেহ ?
সে-তো সহযোগী বন্ধুর মতো আগে।

একটি প্রতিশ্রুত কবিতা

সন্ধ্যেয় দাও শুকতারার আলো,
ওই জল হোক অঙ্গে সুনীল শাড়ি ;
সন্ধ্যে যদি কৃষ্ণের মতো কালো—
তুমিও তাহ'লে শ্রীরাধিকা হও, মারি ॥

মুক্তার জন্য

কৃষ্ণ ধর

এখন আর কিসের জন্য বসে থাকা
নদীতে যারা গেল, মাঝদরিয়ায় দামাল হাওয়ার
খোঁজ পেয়েছে ওরা : ফিরবে সেই সন্ধ্যায়
আকাশে তারা ফোটার অপেক্ষায় ;
দিনমানে কেন তবে বসে থাকা।

নদী ওদের ডাক দিয়ে দিয়ে গেছে,
জলের অপরূপ আদুতে ওরা বিস্মিত যুবক,
মন্ত্রের জগতে ওদের আনাগোনা,
ডাকলেও ওরা আর ফিরবে না এখন।
এখন আর কিসের জন্যে তবে বসে থাকা।

আমার দুঃখকে তুমি নিয়ো,
অন্ধকারে তার ছায়াগুলো দেখি,
টুপটাপ বৃষ্টির মতো নিঃশব্দে পাতা ঝরছে।
আমার সঞ্চিত ভাবনাগুলো যাদের ভাগার ওপর
জন্ম হ'তে হ'তে শিশির হয়ে গেল।
আমাকে যদি দরিয়ায় নিতে,
নদীর জলের পরিচিত গন্ধে
ওদের সব পেতাম।
আমার বধির দৃষ্টিহীন দিনগুলোকে কে পার করবে,
কোন পাড়াগিরা ॥

বোলপুরের টানে : পৌষমেলায়

বটকৃষ্ণ দে

রাত্রি দু'টো। বোলপুরের পথঘাট চুপ। শিশিরের
টুপটাপ কেবল (শোন) গাছের পাতায় ; ঘাস ফুলে
প্রেমিকের ঠোঁট রাখে। নির্জন শীতের কুয়াশায়
তিন বন্ধু, কী আশায়, মেলার পথে যে পা বাড়ায়
তারাও জানে না। তবু, ডিসেম্বরে নিদারুণ শীতে
পৌষমেলার কথা ভেবে বোলপুরে হৃদয় হারায়।

বেলা দু'টো। মৃদু মৃদু শীত বাইরে ; অল্প রোদও আছে
ডালে ডালে পাখীদের কিচিকিচি। নীচে মেলা চলে
শান্তিনিকেতনে, ঘুরের প্রাঙ্গনে ; সাঁওতালী নাচ
লাল-পাড়-শাড়ী-পরা মেয়েদের ছন্দিয়া দোঁয়াচ
মুগ্ধ করে। অগুপাশে বিখ্যাত বাউল নাচে গানে
নশ্বর জগৎ বুঝি ভুলে থাকে ; ভোলায় সবারে ;

কিছুক্ষণ আপনাকে ভুলে থাকতে, পৌষ মেলার দ্বারে,
কলকাতাকে পিছে রেখে, ছুটে যাই, বোলপুরের টানে ॥

রাত্রির সমারোহে

কমল সাহাবুদ্দীন

আকাশে রাত্রির সমারোহ, চাঁদের শরীর শুধু
ঘুরের দিগন্তে জ্বলে যেন এক নীল হুতাশিও এবং সবুজ দু দু
অরণ্যে প্রার্থিত আকাঙ্ক্ষার খেলা—মরমে সর্পিনী
এখন শিয়রে তার কম্পিত নির্জন রক্তে : উথালপাথাল বাণী

অন্ধের প্রাণের মত উন্মথিত হুতাশ চৌদিকে,
ক্রমশঃ সন্ধের রাত মন্ত্রতায় হয়ে আসে ফিকে।

ক্ষুধের শরীর থেকে অন্ধকারে কারা যেন উঠে আসে
বিকলাঙ্গ, আর্তনাদে দীর্ণ, তীব্র বিষাক্ত নিঃশ্বাসে
ভরেছে নিকষ রাত্রি,—

অথচ তারাই বাকি
স্বপ্নের প্রভাত দীপ্ত, প্রগল্‌ভ প্রমত্ত জোনাকি
আলোর স্পর্শে এনে তেজাবে মাঠ, ডোবাবে প্রান্তর—
অস্থির ইচ্ছার মত রাতভর
দলিনীর গোপন তহুতে দেবে মুহুরিত বাতাসের ঝড়।
সুদূর চাঁদের রথ যেন এক ক্লান্তিশ্রান্ত ক্ষুধার হুকুল
মেগে আছে অন্ধকারে; অযুত যোজন দূরে বিলাসের কুহকে আকুল
শঙ্খিত শিরায় তার প্রেমের কুটিল ছলা
আকাঙ্ক্ষিত রাত্রি তাকে ক্লান্তির ভিতরে শুধু করেছে বিহ্বলা
এবং কখনো স্তব্ধে মর্মরিত অজস্র কথায়
সৃষ্টির আদিমে লীন কেউ তাকে নিয়ে গেছে লাস্যময়ী লীল যন্ত্রণায়:
বিদিক শিখার মত জ্বলেছে সে, ম্লান।

অথচ কৌতুকী
রাত্রির মিছুর হাওয়া যেন এক বাসিনী হুহুরী
তাকেই ডোবাবে বিষে;

কশিক উজ্জ্বলা
উন্মার আভার মত লুপ্ত হবে, হায় নারী, সঙ্গে পথ চলা।

শিথির শঙ্খিত ঘাসে এখন রাত্রির হাওয়া খেলা করে
এবং মাটিতে প্রাচীন কুলের গন্ধ,—বহিমান মায়াবী প্রহরে
কম্পিত অরণ্য শুধু উদ্দীপিত আপন বিলাসে।

এবং দিগন্তে পাখি
তামার নির্জনে জ্বলে উদ্‌ভাস্ত, নিরন্তর অসংখ্য জোনাকি।

বিকৃত সন্ধ্যা

আলোক সরকার

ঘরে ঘরে নিবদ্ধ মানুষ কোলাহল দীপ্ত আলো মুখর বৈশাখ
উজ্জ্বল পোষাক মত্ত কৃষ্ণচূড়া রাজপথ অন্ধ পরিভ্রম।
আর অনাশ্রয়ী পাখি বিশাল ডানার সমারোহ। ভালোবাসা, তোমার উত্তাপ :
সমস্ত শরীর যেন রুদ্ধ কড় দৃঢ়মূল বৃক্ষের বিভ্রম
অথবা সূর্যাস্ত মেঘ প্রস্তুত সম্মোহ।
বারান্দায় অখণ্ড আকাশ প্রবাহিত কোন ধ্বনি নিবিড় দূরত্ব !

সাহজিক ঘরের পথের রক্তে শান্ত করি, নিরপেক্ষ সুর
প্রচলিত ব্যবহারে বেজে ওঠে। প্রত্যক্ষ জানালা
সহসা প্রণয়, কোন চন্দনের আন্দ্রকুলের সুদূরিমা
দুইটি রেখার অভিমানে দাবি করে সমর্পিত মালা
দাবি করে নির্বাচিত সীমা।
ভালোবাসা, তোমার চোখের পাতা কেন নিমীলিত, কোন রেখা অমোঘ ইঙ্গিত

সিঁড়ির প্রতিটি রেখা যন্ত্র উচ্চারিত রক্তিম দু-হাতে কেন শীত ?
তোমার শরীর উষ্ণ কাছে দেবো।
সিঁড়ির নিচের স্তব্ধ, গলির বাঁকের স্তব্ধ, জানালার গায়ের নীরব
স্বাগত বিভ্রাম। আমরা দু-জনে যাবো শ্রোৎস্নায়, তোমার দু-হাতে তুলে দেবো
রোমাঞ্চিত বটের জলের একাগ্রতা। সমগ্র সময় কীর্ণ স্তব
অন্ধকার বিকশিত একটি কমল।

সম্পূর্ণ দৃষ্টির তাপে অনাহত ঘর, দুয়োমর স্বাধীন উজ্জ্বল
একটি নদীর তীব্র তরঙ্গের মেঘের ছায়ায় স্বাভাবিক।
ভালোবাসা, চুলের বিন্যাস কেন এলোমেলো, কেন
অসহায় ক্লান্ত পদক্ষেপ দুইচোখ বিভ্রান্ত অলীক ?
উৎসবমুখর স্থির, বিস্তৃত আমরা উপনীত নদীর পাড়ের
বালির প্রান্তরে। উপরে আকাশ সেই অখণ্ড আকাশ, সহজ বিকৃত সন্ধ্যা যেন।

অমোঘ

শোভন সোম

একটা বিশ্চিত ভয় পায়ে পায়ে ঘুরছিলো, আমি শেষকালে
হঠাৎ মরীয়া হয়ে মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়ালাম
বললাম, কী চাস্ ?
উপরে উজ্জ্বল সূর্য, সম্মুখে আমারই ছায়া, ধূ ধূ চতুর্দিক
আমারই সম্মুখে আমি মুখোমুখি স্তব্ধ দাঁড়ালাম।

অন্ধকার, ফিরে যাও, তোমার শীতল সেবা চাইনে এখন
উপরে উজ্জ্বল সূর্য, মৃত্তিকার নিচে অন্ধকার
পিতৃপিতামহদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে টেনে নেবে
আমার দেহের রসে বেড়ে উঠবে শ্যাম দূর্বাদল
শিকড় মেটাবে তৃষ্ণা মেলে ধরবে প্রসারিত ছায়া
শতাব্দী প্রাচীন বৃক্ষ—উপরে জ্বলবে সূর্য : আপাতত তবু অন্ধকার
তোমার শীতল হাত ঘুরে রাখো : ভূমিষ্ঠ প্রত্যহ
অনির্বচনীয় দুঃখে কিছুক্ষণ বাঁচার যন্ত্রণা।

কান্নাকাটি ইতস্তত রক্তবাক উৎকীর্ণ পাষাণ
বধির শোকের স্রোত ; অমুনার সম্মোহন চিরদিন অনিবার্য যাবি
সমস্ত শিল্পই সেবে পলাতক সত্তার প্রতীক।
আত্মহা রে অভাজন, গোপনে সিন্ধুর সাধ খোঁজে ;
অপেয় নীলাভ সিন্ধু ; সীমাহীন অনন্ত আকাশ
এমন বিপুল বিশ্ব, নীহারিকা, গ্রহ গ্রহান্তর
একটি সামান্য সত্তা কোনোখানে রাখেনা অমর।

ঘনিষ্ঠ মৃত্তিকা খোঁড়ো, গন্ধে তার আদিম উল্লাস
কেবলমা সমস্ত সুখ দুঃখ প্রেম বিশ্বাসের স্রোত

অদ্ভুত ধারার চলছে কলুষ যথা : আর অন্ধকার
মহিষ মরাটে স্থির অনিবার্য নায়ক সম্রাট।

একটা হুরন্ত ভয় পায়ে পায়ে ঘুরছিলো, আমি শেষ কালে
মুখোমুখি ফিরে দাঁড়ালাম
বললাম, কী চাস্!

হাওয়ার প্রচণ্ড বেগ হা হা ছুটছে—দু দু চতুর্দিকে
মৃত্তিকা সংলগ্ন, চেনা, আমার আপন ছায়া বলে উঠলো ধীরে
—আলোর সমস্ত যাত্রা তিমিরের নিহিত উদ্দেশে
মৃত্তিকা গভীর শান্তি, সেবা, স্নিগ্ধ পরম শুশ্রূষা,
এবং অন্ধার দেখো পরিণত অখিলে আলোময় হীরে!

উপরে উজ্জ্বল সূর্য ম্লান হতে লাগলো ক্রমে : দীর্ঘতর ছায়া।

ঘর

প্রকৃতি ভট্টাচার্য

জ্যোৎস্নাই নিয়তি হোল। কাল রাতে অবিশ্রান্ত ঝড়ে
পড়েছে এমনি একা। নিয়তি নিবিড় প্রেমে স্তব্ধ
আকাশ ছুয়েছে তারে ; সমস্ত কার্নিশ বেয়ে নামে
জানালায় অন্ধকার, তাতে ঘুম ঘরের ভিতর।
আমার সকল ঘর জ্যোৎস্নার ফসলে ছেয়ে গেছে
চারিদিক। রূপবতী রাজকন্যা পৃথিবী আমার
মোহিনী মায়ায় স্তব্ধ। বনে বনে চাঁদ, বনস্পতি
নিশিত সংসার নিয়ে ঘর করে, মিলনে মধুর।

আমার সংসার আছে। এখনও জ্যোৎস্না পায়ে ঘরে
ঢোকে রাত। বলে 'দেখ, ভালবাস কবিতার মত
আছে কত কবকতা, নিরিবিলি জ্যোৎস্নাতে বলনা' ;—
আমার ঘুমুরা ঘরে চাঁদের হুদুরে মুখ দেখে।

শিখার অনুসরণে দুজন

তরুণ সান্যাল

ঐ যে শিখার দিকে আবিষ্ট পতঙ্গ দুটি যায়

অরণ্যে কাহারা যেন আগুনের ক্রীড়ার মাতাল,
পুড়ে যায় পলাশটী, চন্দন, অশোক, দীপ্তভাষ,
তীক্ষ্ণজিহ্বা ফুলিঙ্গের নগ্নহাস্তে তরঙ্গ উত্তাল
একটি প্রচণ্ড ইচ্ছা ভস্ম, ধোঁয়া, উদ্দাম হাওয়ায়

আরও দ্রুত গেলে তরল আলোয় দিগ্বিদিক
অনেক সুন্দর হত শিকারী স্পর্ধের চক্রতলে
অরণ্য, প্রান্তর, ফুল পর্ণ মিলে প্রশাখার ঠিক
মুগ্ধ করে দেখে নিত ঐ দুটি পতঙ্গের কোলে
অনাস্তব্ধ প্রাণস্পন্দ (কিন্তু ওরা মৃত্যুর সৈনিক)

তরুণীটি ঘুরে বসলো বহুক্ষণ আলের শিয়রে,
ঘুরে চন্দ্র অস্তে যামে, তমসার কৃষ্ণপক্ষ ম্লান,
হে যুবক এইতো সময়, ঐ অর্পনের ঘরে
এখন আগুন শুধু, অলে ঘোরো, আদিমো উদ্দাম,
চতুর্দিকে বীথিকারা বৃষ্টি হবে শয্যাতলে ঝরে

আলোর বৈভবে ওরা চলে গেলে গৌরবের ঘায়,
কি ঐ পতঙ্গরা উড়ে গেল আগুন, ধোঁয়ায় ॥

আরো একবৎসর পর, আজ

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

গৃহখানি সেই মতো। কেবল দেয়ালচিত্রে মৃত মুখখানি
প্রদোষে মলিন লাগে। জানালার প্রান্ত ধরে অনুজ্জ্বল পাখি
উড়ে গেলে চিত্রে স্থির ভ্রূ-পল্লব কেঁপে ওঠে স্মৃতির বয়সে।
কুন্তল, চিবুক, ওষ্ঠ—এ-কক্ষের যাবতীয় গোধূলি, পকাল
স্পর্শের ঘটনা পেলে, বাজে ঘণ্টা উন্মাদক অতর্কিত জোরে।

আলমারি ভেঙে সব বইগুলি কীটদষ্ট দেহ
ধূলায় শয়ন করে, ভিক্ষা করে আহার্য নয়ন।
এই গ্রন্থশালা তুমি বামে রাখো, ঘোরানো সিঁড়ির
বাঁকে বাঁকে উঠে যাও ; নিরাকার শব্দহীন ছাদ
বিস্মরণ ধরে আছে আকাশের সুকঠিন নিলাময় কোষে।

নিয়ে প্রদোষের শিখা। চিত্রশালা মৃত জ্ঞানস্থবী··
বিলম্ভ গ্রন্থের ভীড়, শব্দ করে অবিরাম পুরোনো অক্ষর।

অট্টালিকা

অনিরুদ্ধ কর

কেউ ইন্দ্রজাল জানে। সন্ধের অতীত মুখে অমিয় ভুবন
নিয়ত নির্মাণ করে, (সুখ দুঃখ ঘর প্রেম আনন্দ বেদনা
আজন্ম ঐশ্বর্যে বইলে সমস্তসুদ্ধারে যার মুক্ত প্রবেশম)
প্রতিবিম্ব দেখে ক্রুদ্ধ পাতালের দুঃখ রক্তে তোলে বিশ্রে ঝড়।

অট্টালিকা

সুবর্ণ বিলাসে মৃত বেদাশ্রুত হিরণ্যাক্ত মৃদু অট্টালিকা
সম্মোহিত অধিবাসী স্বপ্নগুলি উচ্চারিত প্রতি স্তরে স্তরে
ঘনিরাক্ত মূর্ত মুক্তে উদ্ভত রোমন্তবাসনা মত্ত চিত্তলিখা
সন্ধ্যের নৈঃশব্দ্যে বাজে, প্রতিধ্বনি অমিশ্রিত গহীন গহ্বরে।
স্থাপত্যের শুভ্রকান্তি স্পর্ধায় স্তোমে হে স্বর্গ, অন্তরাত্ম শ্রোণীতে
গৃহহীন দুঃখ বাজে উত্তরোল ধ্বনি বাজে এ যৌবন দুঃখে গৃহহীন

কেউ ইন্দ্রজাল জানে। নিরাময় আত্মমন্ত্র লগ্ন রাখে, হর্ম্যের শিরাতে
ক্ষতচিহ্ন অন্তর্হিত, অস্ফুট জ্যোৎস্নায় প্রেম চিরদিন বিরহবিহীন।
শীর্ষচিতে আশীর্বাদ বৃষ্টি করে মন্ত্রপূত আকাশের আলো
স্বর্গের সান্নিধ্যে লোভ ছদ্মবেশ ছেড়ে আসছে—শুভ্র সন্ন্যাসিনী
সুখার্ত হৃদয়ে এসে গ্রীষ্মের লক্ষিত যত সন্তাপ জুড়াল।

গৃহস্থ আমনে আঁকা স্থলেজলে আমন্ত্রিত ধ্বনির কিংকিনী।

অপরাহ্ণে

পরিমলকুমার ঘোষ

যেন ঘুরে ঘুরে কাঁটা আলোকিত ফলও রয়েছে।
ইতস্তত সত্য তবু আত্মগত কিছু কিছু দীপ—
অন্ধকারে অধিকেত, যে-প্রবাহ শিল্প রেখে গেছে
প্রতিটি প্রস্তরে তার সাধ করে এড়ায় সমীপ।

তথাপি কখনো যদি জ্বলে উঠবে বলে দীপাবলী
সব অধিকন আলো মৃত হয়, তখনি পলকে
ধরা পড়ে, সকলেই কী উজ্জ্বল অন্ত্যন্তরে আদি!
এবং কী অবিচ্ছেদ সুধাসত্ত্ব প্রবাহ ছলকে
বিবেকপ্রতীকী প্রাণে!

অপরাহ্নে, অনিশ্চিত কালে,
গভীর বিশ্বাসগুলি অনাবৃত মরুপথ থেকে
উঠে আসে লক্ষযোজন বর্ণাঢ্য ধূলির অন্তরালে।
অপার বিস্মিত আমি অনাবৃত আমরা প্রত্যেকে :
এই আলো ঘুকে, তবু পরস্পর আছি পরবাসী।

প্রতি বিন্দু আলোকিত, বিহিত বিবাহে অবিনাশী !!

আমি তো চাইনি তবু

আশিস সান্যাল

আমি তো চাইনি কোন প্রতিভাত দৃশ্যের গভীরে
প্রণত ব্যাকুল স্পর্শ। তবু কেন এনেছ আমাকে
বিস্তৃত বিজন থেকে উদ্ভোচিত পর্বের রেখায়
দূরত্বে বিপুল দৃশ্যে ! মুগ্ধতায় দেখায়েছ দূরে
দিগন্তে জলের রেখা, তটপ্রান্তে মত্ত বালুচরে
ঘুমন্ত রোদের শাড়ি উদ্ভাসিত হাওয়ায় রঙিন,
আমি তো চাইনি তবু প্রার্থনার বিমুগ্ধ প্রহরে
দিয়েছ দু'হাত ভরে স্বপ্নময় প্রসারিত দিন।

আমি তো চাইনি তবু অনুরক্ত শব্দের মর্মরে
শোনায়েছ প্রতিদিন ক্লান্তিহীন দিনের পাঁখায়
স্বগত মুখর গল্প। অতিদূর প্রত্যাশী শিখরে
দেখায়েছ ঘুমিবিড় প্রত্যাশার প্রেমিক আকাশ।
আমি তো চাইনি তবু প্রতিভাত দৃশ্যের গভীরে
দিয়েছ নিবিড় স্পর্শে অরূপণ মুগ্ধ অবকাশ।

মৃত্যুর প্রতি

শশিভূষণ ভট্টাচার্য

হে মৃত্যু, শিয়রে থাকো, এ আমার বিনীত প্রার্থনা।
অলৌকিক ক্ষণে তুমি কাছে এসো বিজন তিমিরে,
প্রচুর পরাগে গন্ধে উন্মোচিত উৎসের সমীপে,
লক্ষ শিখা বুকে নিয়ে দগ্ধ হবো তোমার শরীরে।

আর তুমি কাছে এসো, হে আমার অন্তর্গত নারী
মগ্ন হও শরীরের ঐশ্বর্যের নির্জন প্রদেশে,
চকিতে ঝলসে ওঠে আকাঙ্ক্ষার তীক্ষ্ণ তরবারী
অনির্বাণ হোমাগ্নিকে জেলে রাখো শতায়ু শিখায়।

অভিনীত রঙ্গনাট্যে আমি পার্শ্ব চরিত্র বাহক।
যাবোনো অন্তিম দৃশ্যে মিলন বা বিচ্ছেদের পরে
কাঁদবেনা আমার শোকে নিরুদ্বিগ্ন উদাসী দর্শক,
সংক্ষিপ্ত সংলাপ বলে চলে যাবো মঞ্চ অন্তরালে।

আকাশ, দর্পণে তুমি মেলে দাও নীলাঞ্জন ছায়া।
দুইচক্ষু ভরে আমি পান করি আশ্বিনের আলো,
সংঘর্ষে সন্তাপে শোকে বিচলিত সময়ের ঘরে—
আমার রক্তের স্রোতে রাত্রি তার সর্বস্ব হারালো।

আমাকে চুম্বন করো, এসো, নারী, চৈতন্যের ঘরে,
যৌবনের অপরাহ্নে শান্ত হবে দাহন, পাবক :
তৃপ্তিহীন বিদূষক সর্বশেষ দৃশ্যের গম্ভীরে
অসমাপ্ত রঙ্গনাট্যে যুবরাজ : উপান্ত নায়ক।

ক্ষরিত

কামাল মোর্শেদ

তোমার পাশেতে শুতে দাও।
এ এক বিকৃত সুখে যন্ত্রণার হর্ষ।
ক্ষতি নেই, বাসনার ক্ষয়িত চিন্তার ব্যথা টানে।

হই যদি হতে দাও উচ্ছিত কামনা
ব্যভিচার চারপাশ চক্রাকার পথ।
বঙ্কিম গ্রীবাটি ঘিরে সুন্দরের ছায়া
ধূর্ত সরীসৃপ দেহে চাপ দেয় শিরায় শিরায়।
সুখের কবর থেকে অবসন্ন প্রাণ
মোমের সবুজ রং-এ স্বকীয় আভার।
অবুঝ তবুতো প্রাণ বিশ্রাম প্রবল
যন্ত্রণা রাত্রি হোক তোর, মিশ্রিত যন্ত্রণা।

তবুতো থামেনা কান্না নির্বাক ভাষায়:
সে এক উদ্ভত দৃষ্টি চলিষ্ণু তরীমা
বিশ্রান্ত বিবর্ণ মুখে বিকেলের ছায়া।

পত্রসাহিত্য

শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীর চিঠি

[জীবেন্দ্র সিংহ রায়কে লিখিত]

ও

শ্রীপুরম, সেবাশ্রম, পাঃ সিঃ ১২।১১।৪৫

কল্যাণবরেষু,

তোমার ১লা নবেম্বরের চিঠির উত্তর দিতে এত দেরি হল বলে' আমি দুঃখিত ও লজ্জিত। কিন্তু আমার একটু রীতিরক্ষার্থ ধন্যবাদ পাওয়ার চেয়ে একজন মনস্বী লেখকের সুচিন্তিত সমালোচনা পেলে তুমি বেশি খুশি হবে মনে করে' আমি শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়কে তোমার বই পড়তে দিয়েছিলুম। ওঁর লেখাটি পেতে দেরি হওয়াই আমার বইয়ের প্রাপ্তিস্বীকার করতে দেরি হবার কারণ। তাতে আমার সম্পূর্ণ দোষ কেটে না গেলেও অনেক পরিমাণে কমন হবে।

লেখাটি এই সঙ্গে পাঠাই। জানিনে পড়ে তুমি খুশি হবে কিনা, তবে বেশ গুছিয়ে মনের কথা খুলে লিখেছে—তার চেয়ে বেশি কোন লেখকের কাছে আমরা আর কি আশা করতে পারি? আমার ত ভালই লেগেছে। তবে আমি ভাল সমালোচক নই, সেই জন্যই তোমার বই সম্বন্ধে বিশিষ্ট মতামত দিতে পারলুম না। অন্নদার মত আমিও মনে করি যে তুমি ওঁর রচনা খুব মন দিয়ে পড়েছ এবং খুব যত্ন করে বিশ্লেষণ করেছ। সে যাচাইয়ের যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমি মত দিতে অক্ষম, সেকথা আগেই বলেছি। যদি তথ্যে কিছু ভুল থাকত ত ধরে দিতে পারতুম। কেবল এক জায়গায় যেখানে বলেছ ওঁর পৈতৃক বিষয় থেকে উপার্জন হত, সে সম্বন্ধে হয়ত এইটুকু বলতে পারি যে বহু মোকদ্দমার পর হরিপুরে ওদের পৈতৃক বিষয়ের যেটুকু বাকি ছিল, সেটা সাত ভাইয়ের মধ্যে বাঁটোয়ারা হয়ে প্রত্যেকের ভাগে যে বর্তবোর মত কিছু আসত তা নয়।

...তিনি থাকলে দেখে কত খুশি হতেন তাই মনে হয়। কারণ জীবদ্দশায়

তাঁর লেখা নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়নি বলে মনে একটা ক্ষোভ ছিল তাঁর পত্রাবলী প্রকাশের উদ্যোগ উপযুক্ত লোকেরা করছেন শুনে সুখী হবে তবে এ বিষয়েও তোমার আগ্রহ আমাদের পক্ষে সুখের বিষয়। ওর লেখা সম্বন্ধে তোমার উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের জন্য আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জেনো।...

শ্রীইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী

শা: নিকেতন
৩।৬।৪৭

কল্যাণবরেষু,

সম্প্রতি তোমার চিঠিতে উদ্ধৃত স্বামী নিখিলা পড়ে পত্রপাঠমাত্র আমার দেহত্যাগ করা উচিত ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ আমি দেবী নই, আমার মানবী মাত্র; তাই এখনো সশরীরে উঠে বেঁচে বেড়াচ্ছি।

কারো লেখা ভালোমন্দ লাগা সম্বন্ধে তর্ক করবার ত কিছু নেই; কি রুচিহি লোকাঃ। ওর রচনাশৈলী একটু তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারা এবং রসও একটু অম্লমধুর, লিখনভঙ্গী সহজবোধ্য নয়—কাজেই বিদগ্ধজন ও গুণীজন ছাড়া সকলের হৃদয়গ্রাহী না হওয়াই সম্ভব। কবিতারও ভাবের চেয়ে ভাষার কেরামতীই বেশি। তবে বলা বাহুল্য তাকে 'নিরেট শ্রেণীর' বলে উড়িয়ে দেওয়ার সমালোচকের বিচারশক্তিহীনতাই প্রকাশ পায়।

আশা করি দ্বিতীয়বার অত কড়া সমালোচকের হাতে পড়বেনা। আমার আশীর্বাদ ত রয়েইছে কিন্তু এত আশীর্বাদ চারিদিকে হরির লুটের মত ছড়িয়ে থাকে যে সকল হলে পৃথিবী স্বর্গ হয়ে যেত বলেই বোধহয় বিফল হয়।

• • •

ভালো কথা এখানে একজন বিদেশী ওর উপর থীসিস লিখছেন। তিনি বিশেষভাবে জানতে চান কেন ফরাসী ভাষা শেখবার দিকে ওর প্রথম ঝোঁক হল। আমি ত বলতে পারলুম না। তুমি কি কোন সাহায্য করতে পার?

শ্রীইন্দিরাদেবী

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি

(সুশীলমাধব সেন-কে লিখিত)

বারাকপুর
Gopalnagar P.O.
২৩.১.৪৭

শ্রীতিভাজনেষু

সুশীলমাধববাবু,

অনেকদিন সংবাদ পাইনি। সেজন্য উদ্বিগ্ন আছি। বিশেষ করে খারাপ যাচ্ছে সেই জন্যে। প্রায়ই কলকাতায় যাই, সময়ের অভাব থাকায় আপনাদের ওদিকে যেতে পারিনা। আপনার সেই ইন্ডিওটি কি সেখানেই আছে? আমি ১লা ফেব্রুয়ারী পাটনা কলেজে সাহিত্য সমিতি উপলক্ষে যাচ্ছি। যদি পারি সেখান থেকে ফিরবার পথে দেখা করবার চেষ্টা করবো।

বাড়ীতে আমাদের জঙ্গলের সমারোহ খুব। রোজ রাত্রে বাঘ ডাকে পেছনের মাঠে। বেশ অরণ্য জীবন ভোগ করছি।

গত বড়দিনের ছুটিতে ১২।১৩ দিন সিংভূমের সারণ্ডা forestএ বেড়াতে গিয়ে প্রায় ৩।৪০০ শো মাইল বনাঞ্চল মোটরে বেরিয়ে নানা সুন্দর দৃশ্য দেখেছি। সাক্ষাৎ হোলে গল্প করবো ইচ্ছে রইল। ডাঃ অমিয় চক্রবর্তীর বাড়িতে একদিন বনভ্রমণের গল্প করছিলাম একটি চা-চক্রে আমন্ত্রিত হয়ে, দিন ১৫ আগে। তারপরই তিনি সোয়াখালি চলে গেলেন। আপনি সত্যিকার আর্টিষ্ট মানুষ, তাই মন হত টানে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে। কিন্তু সময়ের অভাব, এদিকে বাড়িতে কেউ নেই, আমার স্ত্রী বাপের বাড়ি, এখানে আছি, শীতের ছোটবেলা বড়দিন সত্ত্বেও আশানুরূপ দীর্ঘতর হয়নি, বুঝিলেই কালযাপন করটি জানাবেন। বৌঠাকরুণকে জানাবেন। আপনি প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

ইতি
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বারাকপুর
সোমবার

শ্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্রে আপনাদের কুশল সংবাদ পাইয়া আনন্দলাভ করিলাম। মাঝে মাঝে এইরকম পত্র দিয়া আনন্দদান করিলে সুখী হইব।

আপনার কথা আমারও মনে পড়ে। কেননা, আপনি শিল্পী, শিল্প ও সৌন্দর্য্য বিষয়ে আপনি যে আগ্রহপূর্ণ গল্পগুলি আমার নিকট করিয়াছিলেন, সে গল্পগুলির মধ্যে একটি শিল্পীমনের আত্মপ্রকাশ দেখিয়া মনে হইয়াছিল আপনি ওক্ষেত্রে আমার সগোত্র। মনের সঙ্গীই আসল সঙ্গী কিনা। বর্ষাকালে আমাদের গ্রামের বনভূমিতে কত তেলাকুচোলতা, হাকাল লতা, তিৎপল্লী, বনকলমী লতা, কত কি ফুল, কত গাছপালা। সেই মহাশিল্পীর হাতের টিহ্ন এদের মধ্যে এত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ যে সর্ব্বদাই এ বনভূমিতে তাঁর উপস্থিতি যেন দেখতে পাই। এ বনতলে সর্ব্বদাই তাঁর আসন পাতা। শুধু বন কেন বনের উপরকার সুনীল আকাশে তাঁর আসন গ্রহ নক্ষত্রে তাঁর আসন, দিকদিগন্তে সে বিরাটের আসন পাতা। যে শিল্পী হইবে, সে আগে এই মহাশিল্পীর অদৃশ্য আবির্ভাবের আনন্দকে অন্তর দিয়া অনুভব করিবে। শিল্পীর মনে প্রেরণা আসিবার ইহাই উৎসমুখ। ভগবান আপনাকে সেই অনুভবের দ্বারকে খুলিয়া দিন ইহাই প্রার্থনা করি। আপনার গল্পবলা সুন্দর হইয়াছে। তবে আমি সামান্য লোক, আমার কথা বলিবার মত নহে। কলকাতায় অনেক দিন যাই নাই। মধ্যে মেঘ-মল্লার রেডিওতে ভিমিরবরণ কর্তৃক সঙ্গীতে অনুষ্ঠিত হইল। তখন গিয়াছিলাম ২২শে তারিখে আমার একটি রেডিও বক্তৃতা ছিল, সেদিনও গিয়াছিলাম। যে দাদা হাঙ্গামা, তাহাতে কোথাও যাইবার প্রবৃত্তি হয়না। একদিন বারাকপুরে আসুন না? এ বারাকপুর নয় ব্যারাকপুর।

আপনার বৌদিদিকে ওখানে শুক্রবার রাখিয়া আসিব। ৩৪ মাস ওখানেই থাকিবেন। এখানে ডাক্তার নাই। উপযুক্ত ধাত্রী নাই, এখানে রাখিবনা। সময় মত ওখানে গিয়া আপনার বৌদিদির সঙ্গে বৌমার আলাপ করাইয়া দিবেন। আমিও মাঝে মাঝে ওখানে যাইব। সামনের রবিবার যদি আসেন সকালের দিকে (৯টার মধ্যে) ওখানেই থাকিব। সেবার আমার আতিথ্যের ত্রুটি হইয়াছিল আমার এখানে। আমি সাধারণ শ্রেণীর মানুষ। আপনাদের উপযুক্ত অভ্যর্থনা কোনদিনই করিতে পারিব না। বৌমাকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিবেন।

ইতি ভবদীয়
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমতী অরুণা সেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত

পত্রসাহিত্য

রাজশেখর বসু-র চিঠি

(পশুপতি ভট্টাচার্যকে লিখিত)

টেলিফোন—সাউথ ৩৪৯১
৭২, বকুলবাগান রোড,
কলিকাতা ২৫
২৮।১০।৫৫

শ্রীতিভাজনেষু,

আমার বিজয়ার নমস্কার জানবেন। আপনার ২৪ তারিখের পত্র আর 'বাংলার মহাপুরুষ' গ্রন্থ পেয়ে সুখী হয়েছি। শ্রীঅরবিন্দের এমন সুলিখিত সুমুদ্রিত সংক্ষিপ্ত চরিতগ্রন্থ আর দেখি নি। এই রচনা বহু পাঠকের সমাদর পাবে মনে করি।

অনেক মহাপুরুষ ব্রহ্মোপলব্ধি লাভ করেছেন (যথা—খ্রীষ্ট, সেণ্টফ্রানসিস, চৈতন্য, কবির, রামকৃষ্ণ, অরবিন্দ), অনেক মহাপুরুষ সত্যের বিভিন্ন দিক আবৃত্ত করেছেন (যথা—বুদ্ধ, শংকর, নিউটন, ডারউইন, আইনস্টাইন), অনেকে আমাদের রসানুভূতি সম্প্রসারিত করেছেন (যথা—কালিদাস, সেক্সপীয়ার, রবীন্দ্রনাথ), এবং অনেকে বিভিন্ন ভাবে সমাজের হিতসাধন করেছেন (যথা—উইলবারফোর্স, ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, গান্ধী)—এ সমস্তই বিশ্বাস করি। কিন্তু অবতারবাদ আর অলৌকিক তত্ত্ব বুঝতে পারি না। এই মানসিক বাধা সত্ত্বেও আপনার গ্রন্থ সাগ্রহে সশ্রদ্ধায় পড়েছি। আপনার বহুমুখী লেখনী সচল থাকুক এই কামনা করি।

আপনার
রাজশেখর বসু

গল্পকার পরশুরাম

রথীন্দ্রনাথ রায়

আপাতদৃষ্টিতে রাজশেখর বসু ও পরশুরাম দুই বিপরীত কোটির মানুষ। রাজশেখর বসু চলন্তিকা অভিধানের সংকলয়িতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা ও বানান সমিতির উদ্যোক্তা, রামায়ণ-মহাভারত-মেঘদূতের অনুবাদক, মননশীল প্রবন্ধকার : আর পরশুরাম হলেন অসাধারণ হাস্যরসিক : গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া, লালিমা পাল (পুং), কেদার চাটুজ্যে, জটাধর বক্সী বিরিঞ্চিবাবা, ভারিণী কোবরেজ প্রভৃতি অসংখ্যচরিত্রের অসামান্য স্রষ্টা। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে যে নিগূঢ় ঐক্য আছে, তাই হলো রাজশেখরের শিল্পী ব্যক্তিত্বের উৎসমূল। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র, রসায়ন তাঁর অর্জিত বিদ্যা, তাঁর অবাধ ছাড়পত্র রসের উদ্ভুক্ত প্রাঙ্গণে। রস ও রসায়নের তাত্ত্বিক-তাত্ত্বিকে সম্পর্ক যাঁরা রক্ষণশীলতার সঙ্গে মেনে থাকেন, তাঁদের যুক্তি-বুদ্ধি সবই বিভ্রান্ত হয়ে যায় অঘটনঘটনপটিয়সী প্রতিভার সামনে দাঁড়িয়ে। পরশুরামের 'গড্ডলিকা' পড়ে তেমনি চমক লেগেছিল সেদিনের জ্ঞানীগুণী অনেকেরই।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মতো বিতর্কজ্ঞ মনীষীও বাদ পড়েন নি। পরশুরামের 'গড্ডলিকা' রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা অর্জন করেছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর প্রিয়শিষ্যের সাহিত্যিক খ্যাতিতে শঙ্কিত হয়েছিলেন—বুঝি রবীন্দ্রনাথের প্রশংসায় তাঁর তৈরী এই রাসায়নিকটি হাতছাড়া হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথকে অভিযোগ করে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন, তা প্রণিধানযোগ্য :

সম্প্রতি দেখিতেছি আপনি সত্যই আমার ক্ষতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। "গড্ডলিকা"র প্রথম সংস্করণ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন দেখি সাহিত্যসম্রাট স্বয়ং তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন অচিরে পর পর বারো হাজার কপি যে বিক্রয় হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেদিন গ্রন্থকার পরশুরামকে আমি বলিলাম, এ-প্রকার সৌভাগ্য কদাচিৎ কোনো লেখকের ঘটিয়া থাকে। এখন তাঁহার মাথা না বিগড়াইয়া যায়। তিনি আমারই হাতের তৈয়ারী একজন রাসায়নিক এবং আমার নিদিষ্ট কোনো কার্যে বহুদিন যাবৎ ব্যাপৃত। কিন্তু এখন তিনি বুঝিলেন যে তিনি সাহিত্য-

ক্ষেত্রেও একজন "কেষ্ট-বিষ্টু"! সুতরাং আমাকে অসহায় রাখিয়া ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন।

এর জবাবে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'আমার মনের কথা যদি বলেন— আপনার চিঠি পড়ে আমি অপ্রস্তুত হইনি, সরল মনের মধ্যে একটু ভরসা হয়েছে। এখন কিন্তু ভাবচি স্বামী সচ্চিদানন্দের মতো গুহার কাজে লাগব, যে সব জন্তু সাহিত্যিক গোলেমালে ল্যাবরেটরির মধ্যে ঢুকে পড়ে জাত খুইয়ে বৈজ্ঞানিক হাটে হারিয়ে গিয়েছেন, তাঁদের কের একবার জাতে তুলব।···যাই হোক আমি বল ঘাচাইয়ের নিকষে ঘাঁচড় দিয়ে দেখলেম আপনার বেঙ্গল কেমিক্যালের এই মানুষটি একেবারেই কেমিক্যাল গোল্ড নয়, ইনি খাঁটি খনিজ সোনা।')

বৈজ্ঞানিক ও কবির এই মতানৈক্য পরশুরামের প্রতিভার স্বরূপ নির্ণয়ে অভ্রান্ত প্রত্যয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রফুল্লচন্দ্র আশংকা করেছিলেন তাঁর তৈরী বৈজ্ঞানিক বোধ হয় হাতছাড়া হয়ে গেলেন, আর রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন 'অন্যসাহিত্যিক গোলেমালে ল্যাবরেটরির মধ্যে ঢুকে পড়ে জাত খুইয়ে বৈজ্ঞানিক হাটে হারিয়ে গিয়েছেন।' পরশুরাম প্রমাণ করেছেন যে বৈজ্ঞানিক কবি উভয়ের আশংকাই অমূলক। সত্যি কথা বলতে গেলে, সাহিত্য ও বিজ্ঞান কোনো ক্ষেত্রেই তিনি স্বধর্মচ্যুত হন নি। তিনি বৈজ্ঞানিকের মন নিয়ে সাহিত্যরচনা করেছেন, কোথাও কোনো বিরোধ ঘটে নি, তাঁর রসকে রসায়ন বলেও কেউ ভুল করেন নি। বৈজ্ঞানিকের আশংকা ও কবির অভিযোগকে অতিক্রম করে পরশুরামের তীক্ষ্ণধার কুঠার অঘটনঘটনপটিয়সীর লীলাকে আর একবার বিদ্যুৎ বহ্নিশিখায় উদ্ভাসিত করে তুলেছে।

পরশুরাম শুধু বিজ্ঞানের ছাত্র ও রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ছিলেন, এটুকু হলো তাঁর নিতান্ত বাইরের পরিচয়। এর চেয়েও বড়ো কথা হলো তিনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক মনের অধিকারী। বৈজ্ঞানিক মনের সবচেয়ে বড়ো লক্ষণ হলো অনাসক্তি। বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে অনাসক্ত বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় নিতান্ত দুর্লভ বললেই হয়। জীবনের অজস্র বৈচিত্র্যকে তিনি দেখেছেন অনাসক্ত মোহমুক্ত দৃষ্টিতে, তেমনি মোহমুক্ত দৃষ্টিতে করেছেন বিচার ও বিশ্লেষণ। তাদের অস্পষ্ট কুয়াশা ও চিন্তার অস্বচ্ছতায় কোথাও তাঁর সত্যান্বেষী শুদ্ধ ও নির্মল দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যায় নি। তাই পরিণত বয়সে যখন তিনি কলম ধরলেন, তখনই পাকাহাতের লেখা লিখতে পারলেন।

কারণ তার আগেই তাঁর বৈজ্ঞানিক মনের পাকাপোক্ত ভিত্তি তৈরী হয়েছিল, তারদামা হারানোর কোনো সম্ভাবনা দেখানে ছিল না। তাঁর শেষ জন্মদিনে তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়েছিলেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

বাঙলা আর বিদেশী সাহিত্যে আমার জ্ঞান অতি অল্প ; সে কারণে আমি সাহিত্যিক নই। আসলে আমি আধা-মিস্ত্রী আধা-কেরানী। অভিধান তৈরী ও পরিভাষা বানান ইত্যাদি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি মিস্ত্রীর কাজ। আর রামায়ণ মহাভারত কেরানীর কাজ। ধাতুকা বিষয় নিয়ে কিছু কিছু লিখেছি বটে, কিন্তু আধুনিক বাঙলা ভাষায় যাকে বলা হয় 'শয়নঘরী সাহিত্য' তার মধ্যে আমার রচনার স্থান হয় নি।

উক্তিটির মধ্যে বিনয় থাকলেও, সত্যও অনুপস্থিত নয়। তাঁর মনের গঠনটি যে বৈজ্ঞানিক সে বিষয় এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর লাইসো-টাইপ নিয়ে গবেষণা ও বানান-পরিভাষা সম্পর্কিত চিন্তার মধ্যেও বৈজ্ঞানিকের অতন্দ্র সাধনাই অনুযুক্ত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক মনের আর একটি বিশেষত্ব হলো প্রিমিতিবোধ। রামায়ণ মহাভারতের সারানুবাদে তিনি সে পরিচয় ভালো-ভাবেই দিয়েছেন। কোথায় সংক্ষেপ করতে হবে, কতটুকু বাদ দিতে হবে, কোথায় সবটুকুই রাখতে হবে—এই বিচারে তিনি অসাধারণ সামঞ্জস্যজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। মহাকাব্যের বিপুলায়তন বৈচিত্র্যবহুল কাহিনী থেকে সারাংশটুকু উদ্ধার করা সহজ কথা নয়। রাজশেখর এই মহৎ কাজ করেছেন কত সহজ ও কত সুন্দরভাবে! বৈজ্ঞানিক সামঞ্জস্যবোধই তাঁর এই সারানুবাদকে সুখপাঠ্য করে তুলেছে। তাঁর এই দুটি মহৎ কাজকে মহুন সৃষ্টি বললেও খুব বাড়িয়ে বলা হবে না।

বৈজ্ঞানিক রাজশেখর যখন হাস্যরসিক পরশুরাম হয়েছেন, তখনো তাঁর মনের কাঠামোর বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটে নি। যে অনাসক্ত মোহমুক্ত দৃষ্টি নিয়ে তিনি লাইসো-টাইপের গবেষণা করেছেন, বানান-পরিভাষার বিষয় চিন্তা করেছেন, রামায়ণ মহাভারতের সারানুবাদ করেছেন, সেই দৃষ্টিই তাঁর ছোটগল্পগুলিকে উচ্চতর আর্টে পরিণত করেছে। বৈজ্ঞানিক অনাসক্তি ও মোহমুক্ত দৃষ্টিই তাঁকে সিদ্ধ হাস্যরসিক করে তুলেছে। আকস্মিক অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্সের চমৎপথ দিয়ে যখন তাঁর গল্পের প্রবাহ শেষতম বিন্দুতে এসে উপস্থিত হয়, তখন তাঁর মজলিশের শ্রোতারা সশব্দ হাসিতে ফেটে পড়েন,

কিন্তু কখনের মুখে হাসি নেই—তিনি তেমনি নির্লিপ্ত ও অনাসক্ত। তিনি প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী বাঙালীকে দামাজাবে হাসিয়েছেন, কিন্তু নিজে হেসেছেন কদাচিৎ। পরশুরামের হাস্যরস মানবরসের নরনারীকে বিশ্লিষ্ট ও বেপরোয়া করে তুলেছে, কিন্তু এর কেন্দ্রে যিনি বসে আছেন তিনি মুক্তস্ত্র, সংযত ও সুগম্ভীর। রাজশেখর ও পরশুরামের দ্বৈত ব্যক্তিত্বের বিচিত্রলীলা তাঁর গল্পগুলিকে অসাধারণ শিল্পকর্মে পরিণত করেছে। বিজ্ঞানবুদ্ধির অভিনব উদ্ভাবনে রসজগতের এক একটি অনাবিষ্কৃত উৎস বৈচিত্র্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। তাই তাঁর ক্লাসিক ছোটগল্পগুলি দ্বৈতব্যক্তিত্বের লীলানন্দনে অপরূপ—রাজশেখর ও পরশুরাম এখানে পার্বতী-পরমেশ্বর একাত্মতায় অচলপ্রতিষ্ঠ।

॥ ২ ॥

পরশুরামের তীক্ষ্ণধার বুদ্ধিদীপ্ত কুঠার বাংলাসাহিত্যে এক নতুন রসের সন্ধান দিয়েছে। বুদ্ধির অসাধারণ দীপ্তি, নতুন আবিষ্ক্রিয়ার চাতুর্য ও অভিজাত মুক্তস্ত্র শালীনতাবোধ পরশুরামের হাস্যরসকে অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। উইট্, কাম্, স্যাটায়ার ও উইটরসের বিচিত্রমিশ্রণে এই হাস্যরস বিচিত্রিত। অথচ অযাচিত উপদেষ্টা ও সংস্কারকের ভূমিকাও তিনি গ্রহণ করেন নি। লোকরহস্যের বঙ্কিমের হাতের চাবুকও এখানে নেই, হুতোমের মতো সামাজিক জীবনের নকসা রচনা করাও তাঁর উদ্দেশ্য নয়। পরশুরামের হাস্যরস সৃষ্টির সাফল্যের মূল কারণ হলো এ হাসি উদ্দেশ্যমূলক নয়, "অপ্রয়োজনের আনন্দ" পরিবেষন করাই এই হাসির একমাত্র লক্ষ্য। অবশ্য শেষ জীবনের কোনো কোনো গল্পে তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন। বলাবাহুল্য সেই সব ক্ষেত্রে গল্পগুলির শিল্পমূল্যও তেমন নয়। মানবজীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা অসংগতির কৌতুককর চিত্রণ তাঁর গল্পগুলির প্রাণ, সংস্কারকসুলভ নীতি-বাচনের প্রয়াস সেখানে অনুপস্থিত। পরশুরাম মুক্তস্ত্র সংযত হয়েও উপদেষ্টা নন, সমাজ জীবনের নানা অসংগতি দেখেও সমাজ সংস্কারক নন, সবচেয়ে বড় কথা রাজশেখরের বিচিত্রমুখী পাণ্ডিত্য পরশুরামের এলাকায় প্রবেশ করে পাণ্ডিত্যের উপদ্রব শুরু করে নি, অথবা এই দ্বৈত ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষে হাস্যরস কোথাও বিপন্ন হয়ে ওঠে নি—এসব করেই মনীষী রাজশেখর ও হাস্যরসিক পরশুরাম অক্ষতদেহে বেঁচে আছেন।

উদ্ভট পরিবেশ ও বিচিত্র সংস্থানসৃষ্টি পরশুরামের গল্পগুলির প্রাণ—তাঁর অধিকাংশ গল্পকেই এক প্রকার Comedy of Circumstances বলা যায়। ঘটনা সাজানো ও ঘটনাচনার কৌশল হাস্যরসকে বহুক্ষেত্রেই অনিবার্য করে তুলেছে। আমাদের এই প্রথাবদ্ধ ও অতিনিবদ্ধ জীবনের মধ্যে যে হাস্যরসের প্রচুর উপাদান আছে, লেখক তাঁর বিচিত্র ঘটনাবিন্যাসে তারই এক একটি রুদ্ধদ্বারকে যখন উদ্‌ঘাটিত করেন, তখন তার বিস্ময়কর সজীবতায় ও কৌতুককর অসংগতিতে চমক লাগে। পরিবেশ সৃষ্টির অসাধারণ চাতুর্যের সঙ্গে সমন্বিত হয়েছে নাটকীয় চমৎকারিত্ব—ক্লাইম্যাক্স ও অ্যান্টিক্লাইম্যাক্সের বিপরীত দোলায় তাঁর প্রতিটি গল্প স্পন্দিত। পরশুরামের চরিত্রসৃষ্টি সম্পর্কেও এ কথা বলা চলে। এক বিশ্লেষণ-নিপুণ ও পর্যবেক্ষণ-তৎপর দ্বিতীয় বিধাতার কাছে মানবচরিত্রের ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংগতি এক মুহূর্তেই ধরা পড়ে। গণেশীরাম বাটপারিয়া, কেদার চাটুজ্যে, বিরিঞ্চি বাবা, খবিদং স্বামী, জটাধর বক্সী, জিগীষা দেবী, খুলনার ডায়িনী কোবরেজ, হনুমামা, সরলাক্ষ হোম—এমনি বিচিত্র ও উদ্ভাবনক্ষম মানুষের কৌতুককর সন্নিবেশে পরশুরামের গল্পগুলি বিচিত্র মানুষের মিলনতীর্থ। এরা সকলেই আমাদের কাছের মানুষ, একটু রঙ চড়িয়ে লেখক যখন তাদের আমাদের সামনে তুলে ধরেন তখন তাঁদের আচার-আচরণ, কথাবার্তা ও ব্যক্তিত্বের অদ্ভুতরস প্রবল হাস্যরসের সঞ্চার করে।

এক অসাধারণ বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও বুদ্ধিদীপ্ত জীবন সমালোচনা পরশুরামের হাস্যরসকে নিজস্ব মহিমা দিয়েছে। লেখকের জীবিতকালেই তাঁর এক একটি উক্তি স্মরণীয় প্রোচোক্তিতে পরিণত হওয়া কুশলী শিল্পীর পক্ষেই একমাত্র সম্ভব। পরশুরামের বহু উক্তিই আজ চালিতে পরিণত হয়েছে—অথচ এগুলো সংগত ও অসংগত কথার বিচিত্র গ্রন্থন নয়, এর মধ্যে আছে মনঃপূত বুদ্ধিদীপ্ত জীবন-সমালোচনা। যত উদ্ভটই শোনাক না কেন, উক্তিগুলির মধ্যে জীবনের অভ্রান্ত সত্যই উদ্ভাসিত হয়েছে। শব্দের খেলা ও অর্থের বিচিত্র কৌশল তিনি দেখিয়েছেন, কিন্তু জীবনসমালোচনার অভ্রান্ত বিশ্লেষণও সেখানে অনুপস্থিত নয়। তাই পরশুরামের বহু আপাত উদ্ভট বাগবিন্যাসও প্রোচোক্তিতে পরিণত হয়েছে। "গন্ধমাদন-বৈঠক", "ঠোঁটের সিঁদুর অক্ষয় হোক", "ভবলডিমের রাধাবল্লভী আর বুগির ফ্রেঞ্চ মালপো", "হয়, কিন্তু Zমতি পায় না", "বেনারসী বকল", "সব বস্তুকই তমসুক দাখা", "কাইআরী

শোক", "ডিরেকটর অফ মংকি ডিপোর্টেশন"—প্রভৃতি উক্তি বিচিত্র উপাদান-জাত, কিন্তু অর্থহীন নয়—এই শ্লেষোক্তিগুলির মধ্যে সমকালীন জীবন, সমাজ ও লোকচরিত্র সমালোচনার অভ্রান্ত ব্যঞ্জনা আছে।

পরশুরামের হাস্যরসের মাধ্যম ছোটগল্প। অতিকথন ও পুনরুক্তি দোষ হাস্যরসসৃষ্টির পক্ষে সবচেয়ে বড় অন্তরায়। পরশুরাম এই দুটি দুর্লক্ষণকে সযত্নে পরিহার করেছেন। বাক্‌চাতুর্য, সূক্ষ্মচতুর বুদ্ধির চকিতদীপ্তি, আবেগহীন সংক্ষেপিত তীক্ষ্ণাগ্র মন্তব্য ছোটগল্পের দ্রুতসঞ্চারী গতিবেগকে অধিকতর নাটকীয় করে তুলেছে—অনেকগুলি ছোটগল্প একাংকিকার লক্ষণাক্রান্ত। সত্যমিথ্যার নিপুণগ্রন্থনে মানবীয় দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছেন লেখক। রসের দরবারেও লেখক নিপুণ রাসায়নিক—সত্যমিথ্যার মিশ্রণ তাই এমন স্বাভাবিক ও সহজ। মিথ্যাকথার আর্টকে বিশ্বাসযোগ্য করতে হলে কিছু কিছু সত্য কথাও বলতে হয়। এমনি করেই তিনি সত্যমিথ্যার জাল বুনে চলেন।

পরশুরামের হাস্যরস আধুনিক রুচি ও মনন মিয়ে সমৃদ্ধিলাভ করেছে। তাঁর ন'খানি গল্প-সংকলনের মধ্যে হাস্যরসের নানাবৈচিত্র্য আত্মপ্রকাশ করেছে। কতকগুলি গল্প পুরাণ নিয়ে লেখা হয়েছে। এই গল্পগুলিতে পুরাণকে অবলম্বন করে নতুন সৃষ্টি করে আধুনিক জীবন সমালোচনা করেছেন। "হনুমানের স্বপ্ন", "ভরতের ঝুমঝুমি", "রেবতীর বরলাভ", "তৃতীয় দ্যূতসভা" "তিনবিধাতা" "গন্ধমাদনবৈঠক", "পঞ্চস্রিয়া পাঞ্চালী"—প্রভৃতি গল্পে স্বর্গ ও মর্ত্যের ঘাতপ্রতিঘাত হাস্যরসসৃষ্টির মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত, রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদক রাজশেখরের পুরাণের প্রতিটি অলি-গলি নখদর্পণে। —তাই এই সব ক্ষেত্রে পরশুরামের অবাধ প্রবেশাধিকার—আবার আধুনিক জগতের জটিল সমস্যা ও জটিলতর লোকচরিত্র সম্পর্কে তাঁর গভীর অভিজ্ঞতা —এই দুয়ের উদ্ভট মিশ্রণ তাঁর অনেকগুলি গল্পের মৌলিক উপকরণ। পরশুরামের হাতে দেব-দেবী-রাজরাজড়াদের চূড়ান্ত দুর্গতি হয়েছে—তাঁদের আর কৌলীন্য নেই। আধুনিক জগতের রাজপথে এসে তাঁরাও কৌতূহলী জনতার পাশে দাঁড়ান, আবার কখনও নিজেরাও আগন্তুক জালে জড়িয়ে পড়েন।

ধর্ম নিয়ে ভণ্ডামি, খুন ব্যবসায়ী বুদ্ধি, ভাবপ্রবণতার আতিশয্য, অশিক্ষিত পটুত্ব, আত্মীয়তোষণ নীতি, রক্ষণশীল জাতির আচরণ, আধুনিকতার নামে যথেচ্ছাচার প্রভৃতি নানাপ্রকার অসংগতি পরশুরামের হাস্যরসকে উপাদেয়

করে তুলেছে। এই সব বিষয় নিয়ে ক্লান্তিকর ও হাহুতাশপূর্ণ বক্তৃতা না দিয়ে পরশুরাম তাঁর কতকগুলো কৌতুককর অসংগতি ও সকলের মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন রস আবিষ্কার করেন। সাধারণ জীবনের মধ্যে উদ্ভট আতিশয্যের গোপন রন্ধ্রপথগুলি পরশুরামের নখদর্পণে—তাই তাঁর হাস্যরস এত স্বতঃস্ফূর্ত ও অবলীলাকৃত। বিশ্লেষণবুদ্ধি পরশুরাম অনাসক্ত শিল্পী সকলের অসংগতি জাগিয়ে তিনি হাস্যরস সৃষ্টি করেন, কিন্তু নিজে কোথাওও ধরা দেন না। এই অনাসক্ত বস্তুলীনতা তাঁকে রসিক সত্তার অনন্তস্থান নির্দেশ করেছে।

॥ ৩ ॥

দু'খানি গল্পসংগ্রহে প্রায় একশোটি গল্প সংকলিত হয়েছে। পরশুরামের এই গল্পগুলিতে আঙ্গিক ও উপকরণের বৈচিত্র্য কম নয়। তিনি নানাজাতীয় পাত্রপাত্রীর আশা আকাঙ্ক্ষার রস পরিবেশন করেছেন। 'কাম্' থেকে আরম্ভ করে 'জাটাধার' পর্যন্ত হাস্যরসের বিবিধপর্যায় চরিত্র-বৈচিত্র্যে ও ঘটনা সমাবেশের কৌশলে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নিছক কৌতুকরস সৃষ্টিতেও পরশুরাম অদ্বিতীয়। গড্ডলিকার 'চিকিৎসা সংকট', 'দক্ষকর্ণ', কজ্জলীর 'স্বয়ংবরা', সুন্দরী মায়ার 'রটন্তীকুমার', নীলতারার 'অযহরির জেত্রা', আনন্দীবাঈ-এর 'আনন্দীবাঈ', 'বটেশ্বরের অবদান', 'চিঠিবাজি', চমৎকুমারীর 'যশোমতী' প্রভৃতি গল্পগুলিতে নির্মল কৌতুক ও রঙ্গরস অনাবিল ধারায় উৎসারিত হয়েছে।

'চিকিৎসা সংকট' বিশুদ্ধ কৌতুকরসের শ্রেষ্ঠগল্প। নন্দী শিতার একমাত্র পুত্র, বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী মধুবাবু ব্যক্তিত্বহীন, নিরীহ গোবেচারী, সর্বোপরি তিনি মৃতদার। লেখক চরিত্রটির এই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। ট্রাম থেকে পড়ে যাওয়ার সুযোগকে তার স্বচতুর বন্ধুবান্ধবেরা এমনভাবে ব্যবহার করেছে যে, ঘটনাচক্রে এক বিচিত্র চিকিৎসা-সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। চিকিৎসকগণের ব্যবস্থাপত্রের মধ্যে অতিরঞ্জিত চিত্রণের বিপুল প্রয়াস আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ মিথ্যার উপরে তিনি একটি অতিরঞ্জিত কাহিনীর জাল বুনেছেন, এ কথা বলা যায় না। চিকিৎসকদের বিচিত্র চরিত্র ও উদ্ভট ব্যবস্থাপত্রগুলির মধ্যে গভীর সত্য আছে। মানুষের নানা মত কিভাবে চিকিৎসা বিভ্রাট সৃষ্টি করে তার একটি কৌতুককর চিত্র পাওয়া যায়। ব্যঙ্গাত্মক চরিত্রচিত্রণ ও ঘটনাচক্রের কৌতুককর সন্নিবেশে গল্পটি শিল্পসমুজ্জ্বল।

'লম্বকর্ণ' গল্পে বিশুদ্ধ কৌতুকরসের সঙ্গে রঙ্গের সমন্বয় ঘটেছে। ছোটগল্প হিসেবে গল্পটির বাঁধুনি একটু শিথিল—পারিপার্শ্বিক অংশের বর্ণনাই দীর্ঘতর। মূলগল্পের সঙ্গে বিচিত্র প্রসঙ্গের গ্রন্থনই গল্পটির সরলতার অন্যতম কারণ। বংশলোচনের দাম্পত্যকলহ, সান্ধ্যবৈঠকের নিয়মিত সভ্যদের বিচিত্রচর্চা, পাঁঠাকে কেন্দ্র করে দাম্পত্যকলহের জটিলতা সৃষ্টি, পাঁঠার নির্বাসন, চাটুজ্যের পাঁঠা ব্যাঘ্রে পরিণত হওয়ার অপূর্ব কাহিনী, ব্যাঘ্র-মাষ্টার লাটুবাবুর দুর্ভাগ্য, কড়বৃষ্টিতে বংশলোচনের ঘরবন্ধা ও লম্বকর্ণের মাধ্যমে তার উদ্ধার লাভ, সর্বশেষে রায়বাহাদুরের দাম্পত্যকলহের মিলন-মধুর উপসংহার—এই কৌতুক-কর ঘটনা-পরম্পরাই হাস্যরসের উদ্রেক করে। তবে পাঁঠার ব্যাঘ্রে রূপান্তরিত হওয়ার কাহিনীটি সত্যব্যভার সীমা লঙ্ঘন করেছে, সন্দেহ নেই।

'বরবরা' গল্পটির কথক সুবিখ্যাত কেদার চাটুজ্যে। সত্যমিথ্যার জাল বোনার কাজে চাটুজ্যে মশাইয়ের দক্ষতার তুলনা নেই। বংশলোচনবাবুর সান্ধ্য আড্ডার অনুকূল পরিবেশটিকে গল্পটির ভূমিকা হিসেবে যোগ করে দেওয়া হয়েছে। প্রেমকামনায় দুটি মস্তপ সাহেব ও একজন লম্বুচিত্ত মেমের কৌতুক-কর প্রেমকাহিনী গল্পটির ভিত্তি রচনা করেছে। গল্পটির উপসংহার এই কাহিনীর সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ভূমিকা ও উপসংহার না থাকলে গল্পটি যেন ঠিক মতো জমতোই না। আধুনিক প্রেমের লঘুচপল ও অসংগত দিককেই তিনি কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন।

'কচিসংসদ' গল্পটিতে কচিসংসদ ও তার বিচিত্রধরণের সভ্যদের পরিকল্পনার মধ্যে লেখকের চমৎকার নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কচিসংসদে সদস্যদের নামকরণ ও সাজসজ্জা হাস্যোদ্রেক করে। কিন্তু গল্পটির গঠনরীতির মধ্যে শিথিলতা আছে। কেষ্টর সঙ্গে পঙ্কর বিবাহকাহিনীর সঙ্গে কচিসংসদ-বৃত্তান্ত যেন ঠিক খাপ খায় নি। কেষ্টর বিবাহঘটিত কৌতুককর কাহিনীই আসলে গল্পটির মূল কাহিনী, মাঝখানে কচিসংসদের উপকাহিনী সংযুক্ত হয়ে মূল গল্পটিকেই যেন বিঘ্নগ্রস্ত করেছে। শুধু ব্যঙ্গাত্মক চিত্র ছাড়া কচিসংসদ-বৃত্তান্ত মূল গল্পের পক্ষে অপরিহার্য নয়। তবে এই ব্যঙ্গচিত্রটির যে একটি নিজস্ব মূল্য আছে সে কথা অস্বীকার করা যায় না। ভাবপ্রবণতার আতিশয্যও পৌরুষবিরোধী বেতসবৃত্তিকেই লেখক তির্যকদৃষ্টির সাহায্যে রূপায়িত করেছেন।

'অচিন্ত্যবাবা' গল্পটির কথকও চাটুজ্যে মশাই। চাটুজ্যে মশাইয়ের অধিকাংশ

গল্পের মতো এই গল্পেও তর্ক-বিতর্কমূলক একটি ভূমিকা আছে। কিন্তু মূলগল্পটি আসলে একটি উদ্ভট, অতিরঞ্জিত ও অলৌকিক কাহিনী। ব্যাঙদেবতার কল্যাণে বকুলাল দত্তের ভাগ্য পরিবর্তন ও পরিশেষে ব্যাঙে পরিণত হওয়ার উদ্ভট কাহিনী একেবারে অবাস্তব। কিন্তু এই অবিশ্বাস্য কাহিনীও 'নিপুণ কথক চাটুজ্যে মশাইয়ের বর্ণনার গুণে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। বলাবাহুল্য এই কৌতুককর গল্পটি নিতান্ত পালগল্পই। 'ঘুঙুরী মালা' (ঘুঙুরীমালা) গল্পটিও পালগল্প পর্যায়ের। লেখক নিজেই গল্পটির প্রকৃতিনির্দেশ করে বলেছেন 'দুই যুগোর রূপকথা।' উদ্ধব পাল ও জগবন্ধু সাহুলী এই দুই বন্ধুর জীবনের অলৌকিক কাহিনীর মাধ্যমে লেখক জীবনের এক গভীর সত্য উদ্ঘাটিত করেছেন। যৌবনের জন্য যে দীর্ঘশ্বাস ও গভীর অনুশোচনা ব্যক্তিজীবনে, শিল্পে-সাহিত্যে নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে পঞ্চষট্টি বছরের বৃদ্ধ উদ্ধবপালের নবযৌবনলাভ করার করুণ কামনার মধ্যে মানবহৃদয়ের সেই চিরন্তন আকাংখাই রূপায়িত হয়েছে। একটু অসংগত শোনালেও উদ্ধব বার্ধক্যের জন্য যে ভাবে দুঃখপ্রকাশ করেছে তার মধ্যে গভীর সত্য আছে। বার্ধক্যের সপক্ষে যুক্তি দেখালে জগবন্ধু গভীর বেদনায় উত্তর দিল: 'আমলে কেন বলে যাও না। মেয়েরা সব দাদু জ্যাঠা মেসো বলে, যুগোদের দিকে আড়চোখে তাকায় না, আমরা যেন ইট পাথর গরু ছাগল।' বৃদ্ধের এই যৌবনকামনাকে এক আজগুবি কাহিনীর মধ্যে রূপ দেওয়া হয়েছে। ব্যাঙমা ব্যাঙমীও ঠিক রূপকথার বিহঙ্গদম্পতি নয়, রূপকথার কল্পজগৎ তাদের বিচরণক্ষেত্র নয়, তারাও এই সূর্যালোকিত পরিচিত জগতের অধিবাসী, আধুনিক পৃথিবীর খবরাখবর তাদের সম্পূর্ণরূপেই অধিগত। রাজকুমারী শশিহন্দার আখ্যায়িকাংশটি কাহিনীটির মধ্যমণি। আপাতদৃষ্টিতে 'ঘুঙুরীমালা' আজগুবি কাহিনী, কিন্তু আড়ালে কঠিন সত্যের মেরুদণ্ড আছে।

রটন্তীকুমার' (ঘুঙুরীমালা) একটি নির্দোষ ও নিটোল গল্প। রটন্তীকুমার চরিত্রের সরলতা ও অনভিজ্ঞতাই গল্পটির মূল আকর্ষণ। শেষ পর্যন্ত মাদিকের মায়ের ছল-চাতুরী তার সরলতার কাছে পরাজিত হয়েছে। পরশুরামের ছোটগল্পে রটন্তীকুমারই একে কিশোর চরিত্র। কিশোরকে তিনি কিশোরই রেখেছেন, তাকে ক্যারিকেচারে অতিরঞ্জিত করে পাকিয়ে তোলা হয় নি। 'অবহিত্থির ক্ষেত্রা' (নীলতারা) গল্পটির কৌতুককর সংস্থান শেষপর্যন্ত

মিলনাত্মক উপসংহারে পরিণত হয়েছে। জয়হরির ক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত বেতালী চাকলাদারের দর্পচূর্ণ করেছে ও জয়হরি-বেতালীর মিলনের পথকে সুগম করে দিয়েছে। 'আনন্দীবাঈ' (আনন্দবাঈ) গল্পে শেঠ বিক্রমদাসের ত্রিবার্ষিকক দাম্পত্যজীবনের জটিল সমস্যা এক প্রবল অ্যান্টিক্লাইম্যাক্সের আঘাতে হাস্যকর পরিণতি লাভ করেছে। আইনে যার সমাধান হলো না, আনন্দীবাঈয়ের দশগাছা চুড়ির আঘাতে তার অনায়াসে সমাধান হলো। মরহুমলালী রাজহংসী ও কলকাত্তাবালী বলাঙ্গীর চরিত্র পরিকল্পনায় লেখকের কলাকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। 'বটেশ্বরের অবদান' (আনন্দীবাঈ) সঙ্গীত ডাক্তার ও তার স্ত্রী অসিলার বস্তুময় ঔপন্যাসিক বটেশ্বরের গল্পের মোড় ফিরিয়ে দিল। গল্পটির কৌতুককর পিতৃস্নেহের নির্দোষ হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। 'পঁচটাকা' গল্পটিও নিছক কৌতুকরসের। সুখাত ও সুমন্তার পত্রবিনিময় দুজনের মিলনকে ত্বরান্বিত করেছে। শিবরাত্রের সঙ্গে বিল্বিমধুর রোমান্সের সমন্বয় ঘটেছে।

॥ ৮ ॥

পরশুরামের অনেকগুলি গল্পের কেন্দ্রমূল ব্যঙ্গবিদ্রূপ। সামাজিক জীবনের নানা অসঙ্গতিকে তিনি তির্যক দৃষ্টিতে দেখেছেন। পরশুরামের কুঠার সেখানে তীব্রদ্যুতিতে ঝলসে উঠেছে। সমাজজীবনে মিথ্যাচার, ব্যবসায়ীর অসাধুতা, ধর্মের নামে ভণ্ডামি, আদর্শবাদের দোহাই দিয়ে নানা জোচ্চুরি, ভাব-বিলাসিতার আতিশয্য, দেশপ্রেমের নামে আত্মতোষণ প্রভৃতিকে তিনি সুকৌশলে আঘাত করেছেন। জীবনের ক্ষেত্রে যেখানেই তিনি বাড়াবাড়ি দেখেছেন, সেইখানেই তাঁর কুঠার নির্মম বিদ্রূপে তীব্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অথচ কোথাও উদ্দেশ্য সুপ্রকট হয়ে শিল্পকর্মে বিঘ্ন ঘটায় নি, আক্রমণের নির্মমতা কৌতুককটাক্ষের অন্তরালে সুকৌশলে আত্মগোপন করেছে।

'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড্' (গল্পলহরী) গল্পটি পরশুরামের সর্বপ্রথম গল্পরচনা। লিমিটেড্ কোম্পানির মধ্যে যে কতবড় জোচ্চুরি লুকিয়ে থাকে তিনি তার মুখোশ খুলে দিয়েছেন। কারবারের অন্যতম ধরাধিকারী শ্যামবাবুর চরিত্রে ব্যবসায়গত অসাধুতার সঙ্গে ধর্ম নিষ্ঠে ভণ্ডামির সুন্দর মিশ্রণ ঘটেছে। গণেশিরাম ঘটপারিয়া পরশুরামের অসাধারণ সৃষ্টি। বাংলাসাহিত্যের এই অবিস্মরণীয় বক্রিমাঙ্ক চরিত্রটি রচয়িতার অনন্যসাধারণ কলানৈপুণ্যের পরিচয়

দেব। গণ্ডেরিরাম নিজের সুবিধামুযায়ী পাপ-পুণ্য, সুনীতি দুর্নীতির মানদণ্ড রচনা করেছে, তারও পাপ-পুণ্যের বোধ আছে, কিন্তু সে বোধ নিতান্তই সুবিধাবাদীর জীবনদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়। ঘিয়ের জোচ্চুরি ব্যবসায় পাপ হয় কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে এই জোচ্চোর ব্যবসায়ীটি যে উত্তর দিয়েছিল, তা বাংলাসাহিত্যে ক্লাসিক হয়ে থাকবে :

"গণ্ডেরি। পাঁপ? হামার কেনো পাঁপ হোবে? বেবসা তো করে কাসেম আলি। হামি রহি কলকত্তা, বই বসে হাবরদমে। হামি না খাঁখসে দেখি, না সাবসে শুংখি—হনুমানজী কিরিয়া। হামি তো সির্ফ মহাজন আছি—ঘিসমা সে কম্ খালাস। সুদ্ লি, মুনাফার আধা হিস্সা ভি লি। যদি হামি টাকা না দি, কাসেম আলি দুসরা ধনীসে লিবে। পাঁপ হোবে তো শালা কাসেম আলিকা হোবে। হামার কি?"

গল্পটির উপসংহারে জোচ্চোর অংশীদারেরা তাদের সব দুষ্কর্মের বোঝা ত্রিদণ্ডিবাবুর ঘাড়ে চাপিয়ে তাদের হাত পরিষ্কার করেছে। লিমিটেড কোম্পানির আড়ালে অসাধুতা ও তঞ্চকতার উৎসকে তিনি নগ্নভাবে উদ্ঘাটিত করেছেন, কিন্তু হাস্যরসের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহটি কোথায়ও অবরুদ্ধ হয় নি।

'ত্রিদণ্ডিবাবা' (কল্পনী) গল্পটিতে ধর্মসম্পর্কিত ভণ্ডামিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। ধর্মসম্পর্কিত দুর্বলতা ও গুরুবাদের আতিশয্য আমাদের দেশে নতুন বিষয় নয়। কিন্তু পরশুরাম এই পুরাতন বিষয়টির মধ্যেই এমন অভিনবত্ব সঞ্চারিত করেছেন, যাতে গল্পটির মধ্যে সজীবতার আস্বাদন অনুভব করা যায়। মূলগল্পের যে দীর্ঘ ভূমিকা আছে, তা গল্পটির পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক নয়। চৌদ্দশত ছাব্বিশীসাগ্রাম লেনের মেসে নিস্তারণ-পরমার্থ-নিতাই-সত্যব্রতর তর্ক-বিতর্ক নিতাইয়ের ধর্মান্ধতাকে কেন্দ্র করে। শিল্পিকবাবুর শিল্পপ্রতিভার কৌশলটি ছিল অভিনব। কালকে তিনি অনায়াসে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনি অনাদি পুরুষ; অন্নপূর্ণেঠের মাতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন, তুলসীদাসকে তিনি প্রবৃত্তি-মার্গের দীক্ষা দিয়ে মানসিংহে রূপান্তরিত করেছিলেন, যীশুর সঙ্গে ঝগড়া করেছিলেন, তিনি চন্দ্রসূর্য নিয়ন্ত্রণের অধীশ্বর। এই মহাবড়িবাজ ভণ্ড গুরুটি মিথ্যাভাষণের সম্রাট—বৈবস্বতের প্রসঙ্গেও সমান মুখর :

"বৈবস্বত বললে—মানুষ তো সৃষ্টি করলুম, কিন্তু ব্যাটারা দাঁড়াবে কোথা খাবে কি?—চারিদিকে জল থৈ থৈ করছে। আমি বললুম—ভয় কি বিনু,

আমি আছি, স্বর্গবিজ্ঞান আমার মুঠোর মধ্যে। স্বর্গের তেজ বাড়িয়ে দিলুম, চৌ করে জল শুকিয়ে গেল, বসুন্ধরা ধর্মঘাতে ভয়ে উঠল। চন্দ্রসূর্য চালাবার ভার আমারই ওপর কিনা।"

বিরিঞ্চিবাবার 'কালস্তম্ভে'র কাহিনী অতিরঞ্জিত ও অবিশ্বাস্য। তবুও তাঁর এই অতিরঞ্জিত কাহিনীগুলি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। গণেশমামা, মিষ্টার সেন, বঙ্কিমদিদি, ছোট মহারাজ, কেবলানন্দ প্রভৃতি চরিত্র পরিবেশটিকে হাস্যমুখর করে তুলেছে। বিরিঞ্চিবাবার ভণ্ডামি দূর করতে গিয়ে যে ষড়যন্ত্রের অবতারণা করা হয়েছে, তার ফাঁকে সত্যব্রত ও দুর্চকীর প্রেম জমে উঠেছে। ভণ্ডদন্ন্যাসীর কুকীর্তিকে উদ্ঘাটিত করতে গিয়ে এক প্রণয়-মধুর কৌতুকহাস্যের অবতারণা করা হয়েছে—কোথায়ও আঘাতের জ্বালা নেই।

'বদন চৌধুরীর শোকসভা' (মুক্তবেণী মালা) গল্পটির ক্যারিকেচার নির্ভর। কিন্তু যতই অতিরঞ্জন প্রয়াস থাকুক না কেন, এর আড়ালে একটি নিগূঢ় সত্য আছে। মৃত ব্যক্তির শোকসভা অবলম্বন করে ভাবপ্রবণতার বাড়াবাড়ি ও সেই মুহূর্তে সম্ভব অসম্ভব নানাপ্রকার প্রতিজ্ঞা করে বসা, আমাদের প্রায় প্রাত্যহিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। যম, যমদূত, চিত্রগুপ্ত, প্রেতাত্মা প্রভৃতিকে গল্পটির মধ্যে নিয়ে এসে কৌতুককর পরিস্থিতিকে জমিয়ে তুলেছেন। সামান্য-তম বিশ্বাস্য উপাদানের উপরে কুশলী শিল্পী পরশুরাম অবলীলাক্রমে অতিরঞ্জনের রাজপ্রাসাদ তৈরী করতে পারেন।

'দুই সিংহ' (আনন্দীবাঈ) গল্পে আধুনিককালের সাহিত্যিক দলাদলিকে তির্যকদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। দামোদর দশকর ও বটেশ্বর সিকদার সাহিত্যক্ষেত্রে এই দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে কেন্দ্র করে দুটি বিরুদ্ধদলের সৃষ্টি হয়েছে। তাদের ইতরজনোচিত আচরণকে রঙে-ব্যঙ্গে রসিয়ে তোলা হয়েছে। কোথাও কোথাও অতিমাত্রায় রঙ্ কলানো হয়েছে বটে, কিন্তু সাহিত্য ক্ষেত্রের এই দলাদলির ছবি দেখে এর যাথার্থ্য উপলব্ধি করতে অসুবিধে হয় না। সাহিত্যের দলাদলি যে কতদূর গড়ায় সোরাচাঁদের উক্তিই তার প্রমাণ :

"সোরাচাঁদ বললে, এই কথা? ওহে ভূপেশ রাজেশ অবনী মুকুন্দি মহাকেষ্ট, এগিয়ে এস তো। আমরা ছজন ছোট-গাল্পিক, বড়-গাল্পিক, রম্য লিখিয়ে, কবি, নভেলিক, সমালোচক—আমরা নিখিল বাঙালী সাহিত্যিকবর্গের প্রতিনিধিরূপে অদ্য সভার অগ্নিন মুহূর্তে শ্রীযুক্ত বটেশ্বর সিকদার মহাশয়কে

উপাধি দিলাম—অপ্রতিদ্বন্দ্বী গল্পশিল্প সম্রাট। তার সাহস আছে সে আপত্তি করুক। আমার ভক্তানা নেই, এই বাঁ পায়ের নোঙ্গাটা খুলে চ্যালেঞ্জ করছি, আমার সঙ্গে যে লড়তে চায় সে নোঙ্গা তুলে নিক। সব তাতে আমি রাজী আছি—ঘুষি, গাঁট্টা লাঠি, খান ইট, যা চাও।"

এইভাবেই রঙ্গ কৌতুক ব্যঙ্গের অন্তরালে পরশুরাম সমাজজীবনের অসৎ-গতিগুলিকে উদ্ঘাটিত করেছেন। তাঁর শেষদিকের গল্পে সামাজিক ব্যঙ্গ বিদ্রূপের সুরটি আরও ক্যাকোলো হয়ে উঠেছে। 'মাৎস্য ন্যায়' (চমৎকুমারী) ও 'উৎকোচতত্ত্ব' (চমৎকুমারী) জাতীয় গল্পে পরশুরামের বিদ্রূপাত্মক মনোভঙ্গি তীক্ষ্ণতর রূপলাভ করেছে। গল্পটির মধ্যে রূপক আছে। দরিদ্র দিবাকর বসু গণপতির কাছ থেকে মাৎস্যন্যায়ের দীক্ষা নিয়ে কিভাবে 'সতর্ক কঠোর সাধনার ফলে মাৎস্য সমাজে শীর্ষস্থানীয় হয়ে উঠল'—তার একটি ব্যঙ্গাত্মক চিত্র পাওয়া যায়। রজনীকান্ত চৌধুরী-বেণী দিবাকরেরা আমাদের অচেনা নয়, কিন্তু পরশুরাম যখন অব্যর্থ রেখায় আমাদের পরিচিত লোকেরই ছবি আঁকেন, তখন এই সমস্ত চরিত্রের ভয়াবহতায় চমকে উঠতে হয়।

'উৎকোচ তত্ত্ব' গল্পে উৎকোচের এক অভিনব পদ্ধতি বিবৃত হয়েছে। জেলা জজ লোকনাথের ঘ-কলমে লেখক উৎকোচের নানা সূক্ষ্ম প্রকারভেদের কথা জানিয়েছেন। উৎকোচের ব্যাপার কত জটিল পথ বেয়ে বক্রগতিতে অগ্রসর হতে পারে গল্পটি তার একটি চূড়ান্ত উদাহরণ। 'সরলাক্ষ হোম' (কৃষ্ণকলি) গল্পটিতেও সরকারের আত্মীয়তোষণ নীতির প্রতি ব্যঙ্গাত্মক কটাক্ষ আছে। তাবী শ্বশুর গদাধর ঘোষের সরকারী মহলে অসাধারণ প্রতিপত্তি; তারই জোরে বরুণ বিশ্বাস 'ধামরা-নির্বাসন অধিকর্তা' হয়েছে। পরিকল্পনার মোহাই দিয়ে যে কত অর্থব্যয় হচ্ছে, তারই কৌতুককর কাহিনী লেখক শুনিয়েছেন। লেখকের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে তাঁর বক্তব্যের জন্য কাহিনীর রস নষ্ট হয়নি। বরুণ বিশ্বাস-সরলাক্ষ হোম-মাতঙ্গী ঘোষকে নিয়ে তিনি রীতি-মতো একটি কৌতুকস্নিগ্ধ প্রেমের ত্রিভুজ রচনা করেছেন। সরলাক্ষ হোম এ যুগের সুযোগসন্ধানী ছেলে, যেন-তেন প্রকারেণ সে কার্যসিদ্ধি করতে পারে।

॥ ৫ ॥

পুরাণকে অবলম্বন করে পরশুরাম অনেকগুলি গল্প লিখেছেন। বলাবাহুল্য

পুরাণকে আশ্রয় করে গল্পগুলি রচিত হলেও, তার রস পৌরাণিক নয়। কারণ তিনি পুরাণকে ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনার দ্বারা লঘু করে তার হাস্যকর অসঙ্গতিগুলিকে আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু পুরাণাশ্রয়ী গল্পরচনায় তিনি এইখানেই থামেন নি। তিনি পুরাণের মন্দাকিনী ধারাকে আধুনিকতায় পরিণত করেছেন, আধুনিক জগতের কলকোলাহলের মধ্যে পৌরাণিক কাহিনীগুলি তাদের আভিজাত্য হারিয়েছে। দেব-দেবী অপ্সরা—মহর্ষিরা তাঁদের চরিত্রগত সমস্ত গৌরীয় হারিয়ে সাধারণ নর-নারীর মতো দোষ-ত্রুটি স্খলন পতনের অধিকারী হয়েছেন। পৌরাণিক কাহিনীগুলির মাধ্যমে প্রকারান্তরে সাধারণ মানুষের দুর্বলতা ও অসঙ্গতিকেই ব্যঙ্গ করা হয়েছে। পুরাণোক্ত দেবদেবী মহর্ষিদের ত্রুটি বিচ্যুতি স্বভাবতই হাস্যোদ্রেক করে, কিন্তু আমাদের সংস্কার-বোধ কোথাও আহত হয় না।

দেব-দেবী চরিত্রের অসঙ্গতি নিয়ে হাস্যরস রচনার পদ্ধতি নতুন নয়। কিন্তু পরশুরামের এই শ্রেণীর গল্পগুলির এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যা তাঁর মননদীপ্ত জীবন-সমালোচনার পরিচয় দেয়। সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের ফলে ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীগুলি ছিল তাঁর নখদর্পণে। তিনি সেইসব কাহিনীগুলিকে নিজের খুশীমতো সাজিয়েছেন, পুরাণে যার উল্লেখমাত্র আছে তাকে অতিরঞ্জিত করেছেন, আবার কখনও বা করেছেন অতিপল্লবিত। আবার কখনও পৌরাণিক কাহিনীর সম্ভাব্য সূত্র ধরে অনেকখানি কাহিনীর জাল বুনেছেন। পুরাণকে আধুনিক জগতের সঙ্গে মেলাতে গিয়ে তিনি এমন এক-একটি যুক্তিধর্মী ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যার মৌলিকত্ব বিস্ময়কর। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ঘটনাবিন্যাসের চাতুর্য, ব্যঙ্গাত্মকতা, পৌরাণিক হিমাচল থেকে লৌকিক সিন্ধুভূমিতে অবতরণ, ক্লাইম্যাকস-অ্যান্টিক্লাইম্যাক্সের দ্রুতসঞ্চারী গতি গল্পগুলির মধ্যে অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছে। পুরাণাশ্রয়ী গল্পগুলির মধ্যে কখনও কখনও রূপকের সূক্ষ্ম আবরণ থাকায় গল্পগুলি অধিকতর উপভোগ্য হয়েছে।

'আবাদি' (কজ্জলী) এই শ্রেণীর গল্পগুলির মধ্যে কালগত দিক থেকে সর্বপ্রথম। পৌরাণিক পরিবেশ ও চরিত্রগুলিকে লঘু করা হয়েছে। বাল্মীকি রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে আবালি চরিত্রের যে ক্ষীণ প্রসঙ্গ আছে, পরশুরাম সেই সূক্ষ্ম সূত্রটিকে অবলম্বন করে একটি নতুন কাহিনী রচনা করেছেন। সুতরাং গল্পটিকে সম্পূর্ণভাবেই উদ্ভাবন বলা যায়। কিন্তু এই উদ্ভাবন মূলহীন

নয়। রামায়ণের রাম-জাবালি সংবাদটিই পরশুরামের বুদ্ধিপ্রদীপ্ত মনকে নতুন সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বোধিত করেছিল। রামায়ণের জাবালিকে রামচন্দ্র তিরস্কার করেছিলেন, কিন্তু পরশুরাম জাবালিকে এক সংস্কারমুক্ত যুক্তির মনের অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন। জাবালি নির্ভিক যুক্তিবাদী, কোনপ্রকার আবেগ বা সংস্কার তাঁকে পরাজিত করতে পারে নি। বালখিল্যদের প্রায়শ্চিত্তবিধান, ঘৃতাচীর মোহমদির নৃত্য, নরকদর্শন, ঋষিদের কোপদৃষ্টি কোনো কিছুই জাবালিকে প্রতিহত করতে পারে নি। একে যাবলম্বী, যুক্তমতি যশোবিরথ লোকায়ত দর্শনের অন্যতম প্রবক্তা হিসেবেই চিত্রিত করেছেন। দেহ-মনের বলিষ্ঠতায় জাবালি চরিত্রটি অসাধারণ। গল্পটির মধ্যে বালখিল্যদের কাহিনী ও ঘৃতাচী উপাখ্যান হাস্যরসের উদ্রেক করে। কিন্তু গল্পটির ফলশ্রুতি হাস্যরস নয়। হাস্যরস এখানে উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য নয়। তাই হাস্যরসের লঘুতরল জলাভূমির ঊর্ধে জাবালি চরিত্রের মহিমাই অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে।

'হনুমানের স্বপ্ন' (হনুমানের স্বপ্ন) গল্পটির সঙ্গে 'জাবালি' গল্পটির একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে। দুটি গল্পেই মহৎ চরিত্রের মহত্তর মহিমা পারিপার্শ্বিক লঘুতা ও চপলতার ঊর্ধে আত্মপ্রকাশ করেছে। গল্পটির মধ্যে দাম্পত্যতত্ত্ব সম্পর্কে যে কৌতুককর অংশ আছে, তা বিশেষভাবে উপভোগ্য। সত্তরোর্ধ্ব জর্জরিত লোমশমুনিকে বহুপত্নী বিব্রত একজন বিশেষত্বর্জিত জীর্ণবৃদ্ধে পরিণত হতে দেখে হাস্যসংবরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। কিচ্ছটরাজ্যের চিলিপিল্লা কাহিনীও লেখকের উচ্চট উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেয়। 'জাবালি' ও 'হনুমানের স্বপ্ন'—দুটি গল্পই সিরিয়াস। কৌতুক-নির্ঝরের কলোচ্ছাস গল্পের উপসংহারে সাত্ত্বিক গাম্ভীর্যে পরিণত হয়েছে।

'পুনর্মিলন'কে (হনুমানের স্বপ্ন) গল্প না বলে রেখ বলাই সঙ্গত। পুরাণ নিতান্ত লৌকিক কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। 'প্রেমচক্র' (হনুমানের স্বপ্ন) কাহিনীর সঙ্গে পুরাণকাহিনীর বিন্দুমাত্র সংযোগ নেই। পৌরাণিক চরিত্র ও পরিবেশ নিতান্তই কাল্পনিক। প্রেমচক্রের পরিকল্পনায় অভিনবত্ব চিত্রসংযুক্ত হয়ে কৌতুকরসকে গাঢ় করে তুলেছে। কাহিনীবিন্যাস ও পরিকল্পনায় মৌলিকত্ব যে হাস্যরসকে কতদূর স্বতঃস্ফূর্ত করে তুলতে পারে, এই গল্পটি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরশুরামের হাস্যরসসৃষ্টির জন্য অনেক সময় তেমন কিছু উপকরণের প্রয়োজন হয় না।

'প্রেমচক্র' লেখার দীর্ঘ দশবছর পরে পরশুরাম লিখলেন 'দশকরণের বানপ্রস্থ' (হনুমানের স্বপ্ন)। পূর্ববর্তী গল্পগুলির গল্পরস আছে, কিন্তু এখানে গল্পরসের বিচিত্রপ্রবাহ শুষ্কপ্রায়। সেই দীর্ঘ গল্পধারার মধ্যে একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে বক্তব্য সুপ্রকট হয়ে উঠেছে। এতকাল গল্পের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহের মধ্যে ও কৌতুকরসের উদ্দামতার মধ্যে যার আভাস-ইঙ্গিত মাত্র পাওয়া যেতো, এখন সেই প্রবাহ যখন শুকিয়ে এলো, তখন আকস্মিকভাবে চোখে পড়লো মননশীলতার দীপ্তরশ্মি, বক্তব্যের নিগূঢ় অভিপ্রায়। 'দশকরণের বানপ্রস্থ' একটি রূপকথাকাহিনী। দর্ভবতীরাজ দশকরণ পঞ্চাশোর্ধে বানপ্রস্থে গিয়েছিলেন। দশগুণ ইন্দ্রিয় ও একমন, দশগুণইন্দ্রিয় ও দশটি মন নিয়ে দশকরণ তৃপ্ত হতে না পেরে ব্রহ্মার কাছে তাঁর পূর্বদেহ পূর্বমন প্রার্থনা করেছিলেন। বৃহত্তর মানবসংসারের সেবার মধ্যেই তিনি তার মুক্তি খুঁজে পেলেন।

'তৃতীয় দ্যূতসভা' (হনুমানের স্বপ্ন) গল্পটিতে উদ্ভট কল্পনা ও গল্পরসের মধ্য দিয়ে আধুনিক রাজনৈতিক কৌটিল্যকে তীব্র শ্লেষাঘাত করা হয়েছে। গল্পের প্রথমেই মহাভারতের ঘটনা ও শ্লোক উদ্ধার করে তিনি পাঠকের বিশ্বাস জমিয়ে তুলেছেন। দুটি দ্যূতসভার মহাভারতীয় বৃত্তান্ত শুনে যখন পাঠক-চিত্ত গ্লানিকর আবিষ্ট, সেই অবসরে লেখক মিথ্যা কথার উপকরণ অনায়াসে তার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। মহাভারতের মহিমান্বিত চরিত্রগুলিকে লেখক বর্তমান যুগের উপযোগী করে তুলেছেন। এক যুধিষ্ঠির ছাড়া কোনো চরিত্রেরই মহাভারতের মর্যাদা রক্ষা করা হয়নি। মৎকুনি চরিত্রটির পরিকল্পনা অভিনব —তার পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণের এমন একটি উৎকট অসঙ্গতি আছে, যা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই হাস্যোদ্রেক করে। তৃতীয় দ্যূতসভার বর্ণনার মধ্যে মহাভারতের যুগজীবনের সামান্যতম আভাসমাত্র নেই। শ্যামোদ্ভূত বলরামের শকুনিকে চপেটাঘাত করা, ঘুঘুর কীটের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্রের সভয় প্রশ্ন—'কামড়ে দিয়েছে?' ঘুঘুরগর্ভ ও গোধিকাগর্ভ অক্ষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া গল্পটিকে সরস করে তুলেছে। মৎকুনি ও বলরামের মুখে আধুনিক রাজনীতির কূটকৌশলের প্রসঙ্গ অবতারণা করা হয়েছে। নিটোল গল্পাংশের মধ্যেও লেখকের শ্লেষাত্মক মনোভঙ্গি লক্ষণীয়।

॥ ৬ ॥

'ভিন্নবিধাতা' (গল্পকল্প) গল্পটিও কোনো পুরাণোক্ত কাহিনী নয়।

শরদিন্দুর পুরাণাশ্রয়ী কাহিনীর মধ্যে দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। কতকগুলি গল্পে পৌরাণিক কাহিনীর কীলকমাত্র অবলম্বন করে নতুন কাহিনীর অবতারণা করেছেন বা নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আবার কতকগুলি গল্পে স্বপরিকল্পিত কাহিনীকেই পুরাণের ছদ্ম আবরণে মণ্ডিত করেছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর কাহিনী রূপকধর্মী। 'ত্রিবিধাতা' দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। আধুনিক যুগের রাজনৈতিক জীবনে বিশ্বসমস্যা মীমাংসার জন্য বিভিন্নদেশের শীর্ষস্থানীয় নেতারা মিলে 'হাই লেভেল টক'-এ মিলিত হন। ব্রহ্মা, গড্ ও আল্লা সমবেত হলেন এক 'শীর্ষ সম্মেলনে'। স্থান, হিন্দুকুশপর্বত। আধুনিককালে শীর্ষস্থানীয় নেতাদের যেমন একজন পি-এ থাকেন তেমনি ত্রিবিধাতারও পি-এ ছিলেন যথাক্রমে নারদ, সেণ্ট পিটার আর পীরসাহেব। বাসুকির রথে জামবৃক্ষের ফল খাওয়ার বিবরণটি কৌতুককর। শয়তানের সঙ্গে ত্রিবিধাতার চুক্তিও আধুনিক জগতের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। রাষ্ট্রবিধাতাদের খুশী করার জন্য শয়তানের মক্কেলদেরও চেষ্টার অন্ত নেই। শয়তানের মুখেই শোনা যাক:

"আপনাদের খুশী করবার জন্য তাঁরা প্রচুর খরচ করবেন। মন্দির গির্জা মসজিদ মঠ আশ্রম বানাবেন, হাসপাতাল রেডক্রস স্কুল কলেজ টোল মাদ্রাসায় এবং মহাপুরুষদের স্মৃতিরক্ষার জন্য মোটা টাকা দেবেন, বুভুক্ষুদের খিচুড়ি খাওয়াবেন, শীতার্তকে কম্বল দেবেন। আপনার মানসপুত্রদের বংশধর কে কে আছেন বলুন, তাদের বড় বড় চাকরি আর মোটরকার দেওয়া হবে। এই সবের পরিবর্তে আপনারা আমার মক্কেলদলকে নিরাপদে রাখবেন।"

বলাবাহুল্য পৌরাণিক ছদ্ম আবরণের অন্তরালে আধুনিককালের ব্যঙ্গাত্মক চিত্রই অভিপ্রেতার্থ রূপে অঙ্কিত হয়েছে।

'ভীমগীতা'কে (গল্পকল্প) ঠিক গল্প বলা যায় না। ভীম শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাঁর ক্রোধ ও পৌরুষের কথাই কীর্তন করেছেন। হাস্যরস স্বতঃস্ফূর্ত নয়, যেটুকু আছে তাও পারিপার্শ্বিক বর্ণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। 'ভরতের মুখমুনি' (ভূতরীয়ারা) গল্পের শেষাংশটুকু বাদ দিলে নিছক রঙ্গ-কৌতুকের গল্পেই দাঁড়ায়। জগদীকেশ তীর্থের গঙ্গাতীরের ধর্মশালায় দুর্বাসার প্রবেশ এক কৌতুককর সংস্থানের সৃষ্টি করেছে। দুর্বাসার ময়লা কাঁথিতে ছারপোকা নির্ভয়ে বিচরণ করছে, তাতে ডিডিটি স্প্রে-করার প্রসঙ্গ হাস্যরসের সৃষ্টি করে। পুরাণপ্রসিদ্ধ দুর্বাসা ও মেনকার কাহিনীতে পুরাণের গন্ধটুকুও নেই। দুর্বাসার

সম্পর্কে পৌরাণিক ধারণা ওখানে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। তাঁর চকল প্রকৃতি ও অন্যান্য গালাগালি সার্কাসের জোকারের মতোই আমাদের মনে কৌতুকের সঞ্চার করে। শকুন্তলা নাটকের একটি অলিখিত কাল্পনিক অধ্যায় লেখক লৌকিক জীবনের তরলতায় মণ্ডিত করেছেন। মেনকাও তেমনি, দীতল টিপুতে টিপুতে দুর্বাসার সামনে উপস্থিত হয়েছেন। লাজুকমুখী 'মেনকা একপায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে বোঁ করে ঘুরে গেল।' মেনকা এখানে অপোক্তেয় কাহিনী স্বর্গদূতী নয়, তাকে ঘিরে রোমান্টিক সৌন্দর্যবয়ও দুকূলিত হয়ে ওঠে না। মেনকা যখন দুর্বাসার সঙ্গে কথাবার্তা বলে তখন দিব্যাঙ্গনাদের সম্পর্কে আমাদের কল্পনারঞ্জিত মোহমদির ধারণা ধূলিসাৎ হয়। আমাদের রঙীন চশমা ভেঙে যায়, দুর্বাসার সঙ্গে আমরাও কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে পারি: 'অপ্সরাই বল আর দিব্যাঙ্গনাই বল, মেনকা আসলে হ'ল স্বর্গবেশ্যা।' এই নির্মোহদৃষ্টিই গল্পটির প্রাণবস্তু। দুর্বাসার দ্বারিত্র অরণ্যে ভরতের ঘুমঘুমি হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপার চমৎকার সিচুয়েশানের সৃষ্টি করেছে। গল্পটির শেষদিকে ঘুমঘুমির উত্তরাধিকারী দ্বিখণ্ডিত ভরতরাজ্যের দুই রাষ্ট্রপতির প্রসঙ্গ চমৎকার অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্সের সৃষ্টি করেছে:

"তারপর মট্ করে ঘুমঘুমিটি ভেঙে বললেন, একজনকে দেব এই খোলটা যাতে পাখরকুচি কাছে, নড়লে কড়রমড়র করে। আর একজনকে দেব এই ডাঁটিটা,, ফুঁদিলে সিসি করে। দাও তো গোটা দশ টাকা রাহাখরচ।" দ্বিখণ্ডিত ভরতরাজ্যের একটি 'খোল', আর একটি 'ডাঁটা'—তীক্ষ্ণ ও বিদ্যুৎগর্ভ ব্যঙ্গাত্মক অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স।

'রৈবতীর পতিলাভ' গল্পটির বিন্যাস, প্রচুর বৈচিত্র্য ও কৌতুককর ঘটনা সন্নিবেশ হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। পৌরাণিক চরিত্রকে নিয়ে ক্যারিকেচার করার প্রয়াস এখানে নেই। সুচতুর লেখক সত্যযুগ থেকে একেবারে কলিযুগে অবতরণ করেছেন। ব্রহ্মলোকে রৈবত-নারদের অহংশান্ত সম্পর্কে মন্তব্য হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। সত্যযুগের উনিশ হাত কণ্যাকে লাঙলের কলায় আকর্ষণে তিনহাত মানবীতে পরিণত করা সিচুয়েশান হিসেবেও অত্যন্ত সুন্দর। একাল হলো মাপিয়ে নেওয়ার যুগ। তাই বলরাম ও রেবতী পরস্পরকে 'অ্যাডজাস্ট' করে নিয়েছেন।

'অগস্ত্যযাত্রা' (দুক্করীমামা) গল্পটি কোনো প্রচলিত পুরাণ কাহিনী বা

ঐতিহাসিক কাহিনীর ব্যাখ্যানুকৃতি নয়। এই পুরাণকাহিনী পরশুরামের স্বকপোলকল্পিত। বিদ্যা ও অগস্ত্য সম্পর্কিত কাহিনী একটি বহুশ্রুত পৌরাণিক গল্প। এইটুকু সত্যের উপরে লেখক এক নবোদ্ভব কাহিনীর সৌধ তৈরী করেছেন। পৌরাণিক যুগের পটভূমিকা ও আবহাওয়াকেও সুকৌশলে সঞ্চারিত করা হয়েছে। কলিঙ্গরাজ কনকবর্মা ও বিদর্ভরাজ বিদ্যাধসেন অগস্ত্যাশ্রমে উপস্থিত হয়ে কে আগে যাত্রা অতিক্রম করবেন, এই কলহে প্রবৃত্ত হলেন। দুই বিদূষকের মন্ত্রণায় দুইরাজা তাদের বিপরীত রাজ্যে প্রবেশ করলেন। এর ফলে দুইরাণীর কাছে দুজন যে কিভাবে অপমানিত হলেন তারই কৌতুকরসোজ্জ্বল কাহিনী এখানে বর্ণিত হয়েছে। বিদূষক কোহণ্ডভট্ট ও বিক্রমদেবের ভূমিকা সবচেয়ে জীবন্ত। ঘটনার বৈচিত্র্যে গল্প জমে উঠেছে।

দুস্তরীমায়ার সেবগণ 'গন্ধমাদন-বৈঠক' ও পুরাণের ছদ্মবেশে আধুনিক যুগের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা। সাতজন চিরজীবী পুরাণপ্রসিদ্ধ। তার পরের কাহিনী উদ্ভাবিত। এখানে গল্পরস দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। চরিত্র প্রধান বা শিচুয়েশানপ্রধান না বলে গল্পটিকে বক্তব্যপ্রধান বলা যায়। পরবর্তীকালের রাজনৈতিক নেতাদের কাহিনী ও কীর্তিকলাপ এঁদের নখদর্পণে। তাই বিভীষণ বলেছেন: 'জয়চাঁদ, বীরজাফর, সাতাল আর কুইসলিংএর দলে আমাকে ফেলেছে।' ব্যাসদেবের মুখে প্রোটোপ্লাজমের কথা শোনা যায়। পৃথিবীর নানা অত্যাচার-অনাচার যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। পরশুরাম ঘুমপান করে বলেছেন: ও সব চলবে না বাপু, আমি এখন বিষ্ণুর কাছে যাচ্ছি। তাঁকে বলব, আর বিলম্ব কেন, কল্কীরূপে অবতীর্ণ হও, ভূভার হরণ কর, পাপীদের নির্মূল করে দাও, অলস অকর্মণ্য দুর্বলদেরও ধ্বংস করে ফেল, তবেই বসুন্ধরা শান্ত হবেন। আর তোমার যদি অবসর না থাকে তো আমাকে বল, আমিই না হয় আর একবার অবতীর্ণ হই?'—এ কোন্ পরশুরামের উক্তি?

'পক্ষিরাজ পাকাশী' (কৃষ্ণকলি) গল্পটি ঘটনাবৈচিত্র্যের উপরই নির্ভরশীল। পঞ্চপতির প্রতি অভিমান করে দ্রৌপদী তাঁদের সঙ্গে একমাস বাক্যালাপ বন্ধ করেছেন। তাঁর মানভঞ্জন করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যে অভিনব কৌশল অবলম্বন করেছিলেন তাই রসিয়ে বলা হয়েছে। হাস্যরস এখানে তেমন স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত নয়। 'বালবিলাসপের উৎপত্তি' (কৃষ্ণকলি) গল্পে পরশুরামের

কঠিন ও নির্মম শ্লেষ পরশু রসিকতাকে আচ্ছন্ন করেছে। পুরাণোক্ত বালখিল্য-দের মাধ্যমে অকালপক্কতাকেই ব্যঙ্গ করেছেন। মাতৃগর্ভ থেকেই ভূমিষ্ঠ হয়েই এরা বিদ্রোহের ধ্বজা তোলে, দানাবয়সের জোগাম আওড়ায়। এক অপরিণীম তিক্ততা পরশুরামের ব্যঙ্গকে নাস্তাত্মক রকম কুটিল করে তুলেছে। সরল কৌতুকের স্থান অধিকার করেছে নির্মম বিদ্রূপ। 'যযাতির জরা' গল্পটির মধ্যেও প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ আছে। যযাতির যৌবন গ্রহণ করার জন্য একহাজার জরাগ্রস্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হস্তিনাপুরে এসেছিলেন—যৌবনকে ফিরে পাওয়ার কি প্রচণ্ড বাসনা! মুহূর্তরাজকন্যা মনোহরার কাহিনী থেকে মানুষের আদিম আকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। মহাভারতের বিশ্রুতকীর্তি পুরু মনোহরাকে পাওয়ার জন্য পিতৃআজ্ঞাপালনের অজুহাত দেখালেন। কাহিনীর এই অংশে লেখকের প্রচ্ছন্ন কৌতুকভঙ্গি লক্ষণীয়।

'নির্মোক মুক্তা' (আনন্দীবাঈ) পরশুরামের একটি অসাধারণ গল্প। এই গল্পের দুটি দিক আছে—বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ। গল্পটির বহিরঙ্গে আধুনিকযুগের স্থূলরুচিবোধকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। কিন্তু এর চেয়েও গভীর কথা আছে কাহিনীর নিগূঢ় মর্মমূলে। পরশুরাম এখানে অনাসক্ত দার্শনিক। উর্বশী স্বর্গবিচ্যুত, কারণ স্বর্গে সকলকেই জয় করা হয়েছে—দেবতাদের চাটুবাক্য তার কাছে একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। তার চেয়ে মর্ত্যকবির রসনাও তার কাছে অধিকতর কাম্য মনে হয়েছে। ইন্দ্র উর্বশীর গর্ব চূর্ণ করার জন্য ত্রিভেদ্রিয় ত্রিশ ঋষিকে নিমন্ত্রণ করে আনলেন। উর্বশীর ট্রিপ-টীজ নৃত্য শুরু হলো। পর্বত ও কর্ণিক ঋষি যথাক্রমে উত্তরীয় ও উত্তর্বাস উন্মোচিত হতে দেখেই সংযম হারিয়ে ফেললেন। সমস্ত আবরণ ও আভরণ মুক্ত হয়ে উর্বশী যখন যথার্থই 'কুম্ভস্তন নগ্নকান্তি' হলেন, তখন একমাত্র দন্তোদ্রিয় কুতুকঋষি রইলেন অবিচলিত। কুতুকের কাছে উর্বশীর নগ্নসৌন্দর্যের কোনো মোহ নেই, সত্যসন্ধানী কুতুকের নির্মোহ দৃষ্টিতে উর্বশীর নগ্নকান্তির কোনো মূল্য নেই:

"মহামুনি কুতুক ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আমাকে প্রতারিত করবার জন্য এখানে ডেকে এনেছে? এই উর্বশী একটি অন্তঃসারশূন্য জন্তু, ছাগদেহের সঙ্গে ওর দেহের প্রভেদ কি? ওহে পর্বত, ওহে কর্ণিক, চল আমরা যাই, এখানে দেখবার কিছু নেই।"

কবি বলেছেন 'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা।' কিন্তু সত্যসন্ধানী

অনাসক্ত বৈজ্ঞানিকের কাছে ছাগদেহের সঙ্গে নারীদেহের কোনো পার্থক্যই নেই। উর্বশী একটির পর একটি নির্মোক মোচন করেছেন। সত্যানন্ধ কুতুকের সম্মুখে এক-একটি করে রোমাঞ্চের যবনিকা উন্মোচিত হয়েছে, সত্যের নিপুঢ় রহস্যলীলাই যেন তিনি আবিষ্কার করতে চান। কুতুক জাবালিরই পূর্ণতর সংস্কর। গুতাচী শাত্রয়েন্দ্র ভেদ করে জাবালি আবিষ্কার করেছিলেন যার্থক্যের যদিরেখা। তবু গুতাচী যে বিগতযৌবনা তার ইঙ্গিত আগেই দেওয়া হয়েছে। উর্বশী সম্পর্কে এ প্রশ্ন আসে না। কুতুকের পরীক্ষা আরও কঠিন, তাঁর সিদ্ধান্তও নির্মমতর। কুতুকের সত্যানন্ধানী কঠিন দৃষ্টির সেপথ্যে বিজ্ঞানী পরশুরামের অনাসক্ত দৃষ্টি, অষ্টাভিবর্ষদেশীয় স্থিতপ্রাজ্ঞ শিল্পীর এক জ্যোতির্ময় নির্মোহ প্রত্যয়।

॥ ৭ ॥

অবিশ্বাস্য উদ্ভট পরিস্থিতি ও চরিত্রকে পরশুরাম অনায়াসে তাঁর শিল্পের বিষয়বস্তুতে পরিণত করেছেন। উদ্ভট কাহিনীর সঙ্গে বাস্তব-জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু কৌতুকশিল্পী যখন রসের তুলি দিয়ে এই ছবি আঁকেন, তখন এর সঙ্গে আমরা এক অদ্ভুত অন্তরঙ্গতা অনুভব করি। 'ভুশণ্ডীর মাঠে' (গল্পলিকা) গল্পটিতে ভৌতিক জগতের এক উদ্ভট কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। কিন্তু প্রেতলোকের কোনো রোমাঞ্চকর শিহরণ বা আতঙ্কপাণ্ডুর ভীতিপ্রদতার লেশমাত্র স্পর্শ নেই। ভৌতিক কাহিনীতে যে জাতীয় ঘনকৃষ্ণ-কারী পরিবেশের সঙ্গে আমরা পরিচিত, তাকে যেন পদে পদে ব্যঙ্গ করাই হয়েছে। এ যেন সূর্যালোকিত পরিচিত বাস্তব পৃথিবীরই এক বিচিত্র কৌতুক নাট্য। ভুশণ্ডীর মাঠের বর্ণনাও যেন কৌতুক রেখায় আঁকা ব্যঙ্গচিত্র :

"ফাল্গুন মাসের শেষবেলা। গঙ্গার বাঁকের উপর দিয়া দক্ষিণা হাওয়া ঝির-ঝির করিয়া বহিতেছে। সূর্যদেব জলে হাবু-ডুবু খাইয়া এইমাত্র তলাইয়া গিয়াছেন। বেটু ফুলের গন্ধে ভুশণ্ডীর মাঠ ভরিয়া গিয়াছে। শিমুল বেলগাছে নূতন পাতা গজাইয়াছে। দূরে আমন্ত্র বোপে গোটাকতক পাকা ফল ফুটি করিয়া ফাটিয়া গেল, একরাশ তুলার আঁশ হাওয়ায় উড়িয়া মাকড়সার কঙ্কালের মত ঝিকমিক করিয়া শিমুল গাছে পড়িতে লাগিল। একটা হলদে রঙের প্রজাপতি শিমুল বৃক্ষ শরীর ভেদ করিয়া উড়িয়া গেল। একটা কাল ভমরা গোকা জন্তু করিয়া শিমুলকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল।"

বলাবাহুল্য এর মধ্যে কোনো অবাস্তব অতিলৌকিকের আবেদন নেই। বরং ছোট ছোট বর্ণনার মধ্যে কৌতুক-কণিকা ছড়ানো আছে। কাহিনীর শেষে শিবুর তিনজন্মের স্ত্রী ও মৃত্যুকালীর তিন জন্মের স্বামী এক উৎকট দাম্পত্য সমস্যার সৃষ্টি করেছে। গল্পটির শেষে তখনকার সাহিত্যে নীতিবোধ ও শ্লীলতা সম্পর্কে যে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল, তার আভাস দিয়েছেন। কারিয়া পিয়েত, নাদু মল্লিক পরশুরামের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। প্রেতলোকের মধ্যে তিনি বাস্তবজগতের রঙ্গ-কৌতুক সঞ্চারিত করে মূর্ত শিল্প সৃষ্টি করেছেন। এই গল্পটি পড়ে প্রমথ চৌধুরী যথার্থই বলেছিলেন :

'ভূশণ্ডীর মাঠে'র তুলনা নেই। এ ছবিটি আগাগোড়া কল্পনাপ্রসূত, কিন্তু কি আশ্চর্য রকম realistic। আমি ভূতকে বেজায় ভয় করি, কিন্তু ভূশণ্ডীর মাঠের যদু নাদু মল্লিকের সাক্ষাৎ পেলে তাকে very pleased to meet you sir না বলে থাকতে পারতুম না।'

'যদু ডাক্তারের পেশেন্ট' (মুক্তরীমায়া) গল্পটির ভূমিকায় ক্যালকাটা ফিজিসার্জিক ক্লাবের সান্ধ্যবৈঠকের তর্ক-বিতর্ক নানাজাতীয় অদ্ভুত গালগল্পের অবতারণা করতে হয়েছে। ডাক্তার যদুমধুন গড়গড়ির অলৌকিক কাহিনীকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য এই জাতীয় আড্ডার প্রয়োজন ছিল। বিয়োর বাবা ও পক্ষী-অটিরামের কাহিনী প্রকৃতপক্ষে একটি রোমাঞ্চকর ব্যাপার, বয়হীন দুই হিয় হুহুর বীভৎসতাও কম নয়। গঙ্গার ধারে লোকালয়হীন নির্জনতার মধ্যে বিয়োরবাবার আশ্রম—তার মধ্যে প্রেমিক-প্রেমিকার দুটি বয়হীন হুহু, সে দুই হুহু আবার প্রয়োজন হলে কথা বলে, নানারকম মন্তব্য করে। এই আধাভৌতিক উদ্ভট কাহিনীর মধ্যেও কৌতুকরসের অভাব নেই। পক্ষীর পূর্বস্বামী রমাকান্তর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য প্রেমিক প্রেমিকার সবকলেবর হল—পক্ষীর হুহুতে লাগানো হলো অটিরামের বয়, অটিরামের হুহুতে লাগানো হলো পক্ষীর বয়—এক উদ্ভট সমাধান। গল্পটির শেষে কৌতুককর অ্যান্টিক্লাইম্যাক্সের ধাক্কা গোটা কাহিনীটিকে জমিয়ে তুলেছে : 'পক্ষী তার মস্তিউলার মদ্দা হাতে একটা লম্বা কুড়ুল নিয়ে কাঠ চেলা করছে, অটিরাম রোয়াকে বসে একটা সিঁদ্দিতে আলপনা দিচ্ছে আর কোলের ছেলেকে মাই খাওয়াচ্ছে।'

'শিবস্বপ্নী চিন্তাটে' (নীলতারা) গল্পটিও অদ্ভুতরসের। এর নায়ক কিশোর

ঝিন্টু। ছয় শিশুর অন্তরতম মনের দুর্বলতাকে লেখক সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন। রোমাঞ্চকর ডিটেকটিভ গল্প পড়ে অন্তরতম মনিষে ঝিন্টু তার পিশাচসিদ্ধ তান্ত্রিক পূর্বপুরুষের তোরঙ্গ থেকে পিশাচমুখী চিমটে আবিষ্কার করেছে। চিমটের আজ্ঞাবাহী পিশাচ চুণ্ডুদাস চণ্ড খালাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের জীনের মতো তার বালক মনিবটির সমস্ত আজ্ঞাপালন করেছে। এর সঙ্গে ঝিন্টুর পিসীমার সম্ভাব্য পাত্রদের কাহিনী যুক্ত হয়ে গল্পটি সরস হয়ে উঠেছে। আজগুবী কাহিনীর অলৌকিক মুখোশটি খুলে ফেলে লৌকিক-জগতের সামনাসামনি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পরশুরামের চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতা অসাধারণ। গল্পগুলি পড়ে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছিলেন: 'বইখানি চরিত্র চিত্রশালা। তিনি মূর্তির পর মূর্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন। এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে, মনে হইল ইহাদিগকে চিরকাল জানি।' পরশুরামের অসাধারণ চরিত্র সৃষ্টি একটি দুটি নয়, অসংখ্য। কিন্তু ভীড়ের মধ্যে থেকেও তাদের অনায়াসে চেনা যায়! তার কয়েকদের মধ্যে দুটি চরিত্র সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে; কেদার চাটুজ্যে ও জটাধর বকশী। যশোলোচনবাবুর বৈঠকখানা ও নতুন দিল্লীর কালীবাবুর বিখ্যাত দোকান ক্যালকাটা টি ক্যাবিন যথাক্রমে তাঁদের গাল-গল্প করার ক্ষেত্র। এই ধরণের মজলিশি আবহাওয়ায় এই দুটি অসাধারণ পুরুষ তাঁদের মিথ্যাকথার জাল বয়ন করেন। মজলিশি খোশগল্পের এই মেজাজটি বাংলা হাস্যরসাত্মক গল্পের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। ত্রৈলোক্যনাথের বিচিত্র-কথক ডমরুধর, প্রমথ চৌধুরীর নীল-লোহিত ও ঘোষালের পাশে চাটুজ্যে মশাই ও জটাধর অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। রঙ্গ-কৌতুক, খোশগল্প, পদিপ দিয়ে গল্পকে জমিয়ে তোলার কৌশল ত্রৈলোক্যনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু চৌধুরী মহাশয়ের নীললোহিত ও ঘোষাল দীর্ঘকাল একই মেজাজে কথা বলতে পারেন নি—নতুন উদ্ভাবনীশক্তি কমে এসেছে হাস্যরসের উৎসও এসেছে শুকিয়ে। ডমরুধর এ বিষয়ে অদ্বিতীয়—স্বর্গ-মর্ত্য-রসাতল ব্যাপী তার উদ্ভাব কল্পনার স্বচ্ছন্দগতি। এবিষয়ে কেদার চাটুজ্যের স্থান ঠিক তার পরেই।

'হনুমানের স্বপ্নে'র পর থেকেই পরশুরামের গল্পগুলিতে একটি সুর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। রঙ্গ কৌতুকের সহজ স্বাচ্ছন্দ্যের স্থান অধিকার করেছে

তিক্ততা ও মানসিক গ্লানি। গল্পরসের ধারা অনেকখানি শুকিয়ে এসেছে যেন, তার স্থান অধিকার করেছে বক্তব্য। এবার থেকে পরশুরামের রঙ্গকৌতুকের আসর আর তেমন জমে ওঠে না, কারণ মাঝে মাঝেই মননশীল চিন্তানায়ক রাজশেখর বসুকে দেখা যায়। তাই পরশুরামের শেষদিকের অনেকগুলি গল্প লক্ষণাক্রান্ত, কতকগুলি গল্প শুধু সামাজ বিবৃতি অথবা যৎকিঞ্চিৎ সংলাপের উপরে গড়ে উঠেছে। রঙ্গের যবনিকা মাঝে মাঝে সরিয়ে ফেলে এ যুগের নানা ব্যাধি, গ্লানি, অসুস্থতার কথা বলে ফেলেন—পরশুরামের সরস কুঠার প্রাবন্ধিক রাজশেখরের ধারালো কলমের আশ্রয় খোঁজে। তাই গল্পকার পরশুরাম পূর্বাপর একই মেজাজ রাখতে পারেন নি সত্য, কিন্তু একথা আরও সত্য যে পৌরাণিকযুগের মতো এ যুগেও পরশুরাম একজনই ছিলেন—যাঁর নিপুণ কুঠারের ধারালো রেখায় চিত্র ও চরিত্রের বিচিত্র কারুকার্য, যাঁর রঙ্গ-ব্যঙ্গ কৌতুকের অজস্র ঐশ্বর্যে সারস্বত সাধনার পূর্ণসিদ্ধি।

রাজশেখরের গ্রন্থপঞ্জী : (১৮৮০-১৯৬০)

(ক) গল্প সংগ্রহ :

১। গড্ডলিকা ১৩৩২ বঙ্গাব্দ। ২। কজ্জলী ১৩৩৪ ৩। হনুমানের স্বপ্ন ১৩৪৩। ৪। গল্পকল্প ১৩৪৭। ৫। দুস্তরীমায়া ১৩৪৯। ৬। কৃষ্ণকলি ১৩৬০। ৭। নীলতারা ১৩৬৩। ৮। আনন্দীবাঈ ১৩৬৪। ৯। চমৎকুমারী ১৩৬৬।

(খ) শব্দকোষ : ১০। চলন্তিকা ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ।

(গ) সংস্কৃত হইতে অনূদিত : ১১। কালিদাসের মেঘদূত ১৩৫০ বঙ্গাব্দ। ১২। রামায়ণ ১৩৫৩। ১৩। মহাভারত ১৩৫৬। ১৪। হিতোপদেশের গল্প ১৩৫৭।

(ঘ) প্রবন্ধ : ১৫। লঘুগুরু ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ। ১৬। বিচিন্তা ১৩৬২। ১৭। চলচ্চিন্তা। ১৩৬৫।

(ঙ) বিবিধ : ১৮। কুটির শিল্প ১৩৫০ বঙ্গাব্দ। ১৯। ভারতের খনিজ ১৩৫০।

সমৎকুমার গুপ্ত কর্তৃক সংকলিত

নবম শতকের জাপানী গীতিকবিতা

কাই নো আকিমিন

আমি ঠিক জানি, আমার প্রিয়জন
গ্রীষ্মের এই দূরন্ত পাহাড়ে
এসেছে,
তাই তো কোকিলের কণ্ঠ
এমন উচ্চকিত।

যদি জীবন এবং মৃত্যু
আমাদের ইচ্ছেমত চলত
তাহলে বল,
কি মাধুর্য থাকত
বিরহের বেদনায় ?

অনামা কবি

স্রোতের ঘূর্ণিতেও থাকে
একটি স্থির বিন্দু,
কিন্তু আমার ভালবাসায় তা নেই।
আমার প্রাণের বিনিময়ে
যদি পেতেম তোমার প্রেম
তাহলে মৃত্যু হত কি সহজ।
বসন্তের আগমনে
যে তুষার গলে যায়
পেছনে কোন চিহ্ন না রেখে

তোমার হৃদয় তার মত
আমার দিকে ঝুঁকে আসুক না।
এই পৃথিবী, এই পুরনো পৃথিবী
চিরদিনই ছিল কি বিষণ্ণ,
না আমার একাকীত্ব
তাকে এমন করেছে?

অনুবাদ : অশোক মুখোপাধ্যায়

রাইনের মারিয়া রিল্‌কে

মৃত্যু

মহত্ত্বের মৃত্যু যেন মৃত্যু—যিনি হাসি মুখরাত
মহত্তের আবরণে, মোরা যার রক্ষণাধিকারে।
তাঁর কান্না, কী আশ্চর্য, আমাদের বুকের গভীরে
বাজে, যবে বীর সত্তা খুঁজি মোরা জীবন-নিষ্ফলে।

রিল্‌কের "Death is great" নামক কবিতার অনুবাদ।

বরিস পাস্তেরনাক

আবাহন

মাথার উপরে ঊর্ধ্বাবৃষ্টি, অন্তরীপেতে ঝড়।
লোনা জলধারা দুষ্টি হননে, এবং শুকালো কান্না।
শয়নাগারে অন্তর্তমসা, মননেতে চাঞ্চল্য
স্ফিংক্সের মুখ ব্রাস্থলে কাল লাহারায় পাতে ধৈর্যে।

মোমবাতি গুলি পুড়িলো আর মনে হ'লো শেষ বৈতরণী
রক্তে হিমের স্পর্শ এবং বাড়তি আকাশী হাত
উপচালো ঠোঁটে। রাত্রির শেষ। জোয়ারে ভাঁটার পর

উত্তরসূরী

ঠিক সে সময়। মরুকোন থেকে চপল পক্ষ বায়ু
আলোড়ন দিল সমুদ্র বুকে, বইলো মরুর ঝড় :
দেবদূত দিল ঠাণ্ডার ঘুমে দ্রুতগতি নিঃশ্বাস।
মোমবাতি গুলি পুড়লো, "প্রত্যাশিত" পাণ্ডুলিপি
শুকালো এবং গাঙ্গের ঘুমে ঘুললো তোরের দ্বার।

পাস্তেরনাকের Variation No. 3 নামক কবিতার অনুবাদ।

অনুবাদ : বিমল চক্রবর্তী

টি এস এলিঅট

টমাস এর স্বগতোক্তি (Murder in the Cathedral থেকে)

এখন আমার পথ পরিষ্কার, সাধ্যও তো সহজ এখন :
এইভাবে পুনর্বার আসবেনা কোনো প্রলোভন।
শেষ প্রলোভন—শ্রেষ্ঠ বিশ্বাসভঙ্গতা :
অন্যায়ের অনুরোধে ন্যায়কর্ম সাধনে ব্যগ্রতা।
স্বাভাবিক শক্তি থাকা কমাই পাপকে
এই তো উপায় আছে আমাদের জীবনের আদি প্রারম্ভকে।
তিরিশ বছর আগে সব পথ করেছি সন্ধান
আমন্ত্র, উন্নতি, আর সাধার বিনাশ।
আমন্ত্র—ইন্দ্রিয়ে, আর বিভাব, চিন্তায়,
সঙ্গীতে, দর্শনে, কৌতূহলে,
তামাটে শালিকে, আর লাইলাক গাছের পাখায়,
ছোরা-খেলায় মহদানে, আর দাবাখেলার কৌশলে।
উদ্যান-প্রিয়তা, যন্ত্র-সহযোগে গান,
সবেতেই ছিল ঝোঁক, আগ্রহ সমান।
যৌবনের শক্তিক্ষয়ে আকাঙ্ক্ষা জন্মায়,
তখন তো সব কিছু করবার সম্ভাব্যতা দূর হয়ে যায়।
শুভ অনুষ্ঠান লাভে যাতে পাপ, ইংলণ্ডে রাজার
আইন বহাল ক'রে তাঁর চওলাদের রণে

জিতেছি ব্যারণগণে তাদেরই কৌশলে, আর
আমাকে ঘৃণিত যারা ভেবেছে, তাদের ঘৃণা করবার শক্তি ছিল মনে,
অসংস্কৃত অভিজাত, নিজেরই মনের সাথে ওরা উপনেব,
আমি তো রাজার সাথে একপাত্রে আস্বাদ করেছি ভোজ্য শেষ,
কখনো করিনি ইচ্ছা—আমি হবো ঈশ্বর সেবক।
সুযোগ রয়েছে ব'লে ঈশ্বরের সেবা করে অনেক পাতক
অনেক দুঃখও পায়, যা করে না, যা পায় না রাজকর্মচারী।
যেহেতু মহৎ ব্রত করে যারা ব্রতও তাদের আজ্ঞাকারী,
তথাপি তাদের পথে। আর রাজনীতিকের সাথে প্রচেষ্টায়
সে ব্রতকে করে তোলে রাজনীতি, নয় শুধু কাজের ধারায়,
নিজেদের সত্তার স্বরূপে। আমি জানি
এখনো হয়নি উদ্ঘাটিত শেষ আমার যেটুকু ইতিহাস
অনেকের মনে হবে সবই নিষ্ফলতার প্রয়াস,
পাগলের বোধশূন্য আত্ম সংহনন,
পৌড়ার গর্বিত বাসনার উৎসারণ।
আমি জানি ইতিহাস সকল সময়
নিয়ে আসে সুদূরবর্তী কারণের অত্যাশ্চর্য ফলের সঞ্চয়।
কিন্তু প্রতি অ-হিত, এবং প্রতি পাপের লক্ষন,
অপরাধ, অন্যায়, পীড়ন, কিংবা কুঠারের তীক্ষ্ণতাতর্পণ,
অবজ্ঞা, লুণ্ঠন, এ সবের জন্যে তোমরাই, শুধু তোমরাই
এবং তোমরা সবে শাস্তি পাবে ঠিক এমনি করে তোমরাই।
আমার কাজের শেষ, দুঃখ শেষ, আর নয় খড়্গের প্রয়াস।
এখন হে দেব দূত ঈশ্বর প্রেরিত
আমার অভিভাবক, খড়্গ দুখে পক্ষদ্বয় করো বিধুনিত।

অনুবাদ : গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

"শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার"

জাতির পরিচয় তার রঙ্গমঞ্চে। পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, সবদেশে সব সময়ে নাট্য-কলার মধ্য দিয়েই জাতির সংস্কৃতির আভাস ফুটে উঠেছে। প্রাচীন ইউরোপে নাট্যশালার জন্ম হয় নানা রকম ধার্মিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানকে আশ্রয় করে। মিশরেও খৃষ্টপূর্ব দুই হাজার বৎসর আগে বিভিন্ন ধর্ম অনুষ্ঠানকে ভিত্তি করেই নাট্য-কলার বিকাশ হয়। কিন্তু ধর্মের গণ্ডী থেকে মুক্তি লাভ করে নাট্য-শিল্পের পরিপূর্ণতা লাভ করতে দীর্ঘ সময় কেটে যায়। ধর্মের সংকীর্ণ বন্ধন যতই ছিন্ন হতে লাগল নাট্য-কলা ততই নূতন পরিকল্পনার আশ্রয় নিয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হল। নাট্য-শিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলেই ইউরোপে দেশে দেশে Shadow Play, Opera, Miracle Play, Passion Play ইত্যাদির সৃষ্টি হল।

আমাদের দেশে কিন্তু নাট্য-কলার সূচনা হয় ইউরোপীয় নাট্য-কলার জন্মের অনেক পরে। ৫০০ থেকে ৮০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতীয় নাট্য-কলার বিকাশ ঘটে। সেকালের হিন্দুরাজাদের আনুকূল্যেই এইসব অভিনয় রাজ-প্রাসাদেই সাধারণতঃ অনুষ্ঠিত হত। সেখানে কিন্তু কোন রঙ্গমঞ্চ বা দৃশ্যপট দেখা যেতনা। হিন্দুরাজত্ব অবসানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এদেশে নাট্য-কলার অগ্রগতি স্তিমিত হয়ে এল। পরবর্তী দীর্ঘ এক হাজার বৎসরের মধ্যে নাট্যশালা তো দূরের কথা, এদেশে উল্লেখযোগ্য নাট্যসাহিত্যেরই সৃষ্টি হয়নি।

আগেই বলেছি, দেশের শিক্ষার এবং সংস্কৃতির বাহন হচ্ছে মঞ্চ। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে রেণেসাঁসের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে নাট্যকলার পূর্ণতম বিকাশের সূচনা হয়। ইংলণ্ডে তখন এলিজাবেথীয় যুগ—ইংরাজী শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের 'স্বর্ণযুগ'। এইযুগে ইংলণ্ডের নাট্যশালা উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল। উনিশ শতকেও যখন বাংলাদেশে নবজাগরণের ঢেউ লেগেছিল তখন সমাজে, সাহিত্যে, বুদ্ধিতে এবং ভাবে যে উদ্দীপনা এসেছিল তারই অনিবার্য পরিণতি হিসাবে বাঙলা রঙ্গমঞ্চের প্রদীপ জ্বলে ওঠে।

সংস্কৃত প্রভাবের আওতায় বেড়ে-ওঠা বাঙালির প্রাথমিক সাহিত্য প্রয়াসের

কুসংস্কারমুক্ততা ইংরেজ ইতিহাস কোম্পানীর আমল থেকেই ভাঙতে শুরু করে। সেই প্রচণ্ড ভাঙনে বাঙালি সমাজে যে প্রবল আলোড়ন ঘটে গেছে, তার তরঙ্গভঙ্গের গর্জন কান পাতলে আজো শোনা যায়। এই আলোড়নের ফলেই বাঙলার লোককাব্য, পাঁচালী, যাত্রা, কবিগান প্রভৃতির প্রাচীন গায়কী শীঘ্র থেকে ক্ষীণতর হয়ে এলো। যে জমিদার একদা যাত্রা পাঁচালী মঙ্গলচণ্ডীর উৎসব উপলক্ষ্যে দুইহাতে টাকা ছড়াতেন, তাঁদের আনুকূল্যে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাতে হল বাঙলা নাটকের গোড়াপত্তন। এর মূলে ছিল হিন্দু কলেজীয় শিক্ষা, এইখানেই শেক্সপিয়রের সঙ্গে বাঙালির প্রথম পরিচয়। বাঙালির চিত্তে সংস্কৃতির যে পলিমাটি সঞ্চিত ছিল, তাই এ-যুগে তার সাংস্কৃতিক জীবনের ক্ষেত্রকে উর্বর করে রেখেছিল। পাশ্চাত্যশিক্ষার বীজসম্পদের ফলে সেখানে সৃষ্টি হল নূতন সাহিত্য, নূতন জাতীয়তাবোধ; আর বিদেশীর অনুকরণে স্থাপিত মঞ্চ জাতীয় নাট্যশালায় রূপান্তরিত হল।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের, ৭ই ডিসেম্বর, শনিবার। জাতির ইতিহাসে ও নাট্যশালার বিবর্তনে একটি স্মরণীয় তারিখ। ঐদিন কয়েকটি উদ্যোগী বাঙালির প্রচেষ্টায় প্রথম সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গিরিশচন্দ্রকেই আমরা এই নাট্যশালার জনক বলি। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরকাল বাঙলা রঙ্গমঞ্চের উপর ছিল গিরিশচন্দ্রের নিরঙ্কুশ আধিপত্য। গিরিশচন্দ্র ও তাঁর সম্প্রদায়ের অভিনয় বাঙালি দর্শকের রুচি ও চিন্তাধারায় প্রথম বিপ্লব এনেছিল এবং বাঙলার মঞ্চই যে সংস্কৃতির এক প্রধান বাহক, একথা সেদিন স্বীকৃত হয়েছিল।

গিরিশচন্দ্র একাধারে ছিলেন নট ও নাট্যকার, রঙ্গালয়ের স্রষ্টা ও পালক। তাঁর যুগে নাটক ও নাট্যশালার প্রচুর উন্নতি হয়। কিন্তু প্রযোজনার ক্ষেত্রে গিরিশযুগের যথেষ্ট অসম্পূর্ণতা ছিল। অভিনয়ের যে একটি সামগ্রিক রূপ ও আবেদন আছে, সে কথা তখনকার দিনের প্রযোজক বা দর্শক কেউ উপলব্ধি করার চেষ্টা করেননি। সার্থক প্রযোজনাশিল্পীর অভাবে গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর একযুগের মধ্যেই বাঙলা মঞ্চের দ্রুত অবনতি ঘটল। যুগ পাল্টাল, দর্শকের রুচিরও পরিবর্তন হল, কিন্তু মঞ্চের ধারা বদলাল না। গিরিশযুগের ব্যর্থ ও বিকৃত অনুকরণে দীর্ঘ রাত্রিব্যাপী সুড়ঙ্গ, গীত, বাদ্য আর মনমাতানো দৃশ্যপট,

---

গিরিশকুমার ও বাংলা থিয়েটার : মণি বাগচি। জিজ্ঞাসা।

চোখঝলসানো সাজ-সজ্জা এবং অতিনাটকীয় স্থূল অভিনয় নিয়েই বাঙলার রঙ্গমঞ্চ কোনরকমে টিঁকে রইল। বাঙলা মঞ্চের এই ঘোর দুর্দিনে একটি ক্ষুলিঙ্গ প্রতিভা পাদ-প্রদীপের সামনে এসে দাঁড়ালেন নূতন আলোকের সন্ধান দিতে। মুগ্ধ বিস্ময়ে বাঙালি চেয়ে দেখল তিনি নাট্যাচার্য শিশিরকুমার। বাঙলা মঞ্চে নবযুগ প্রবর্তন করবার মত বিবিধ শক্তি নিয়েই শিশিরকুমার আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর মধ্যেই বাঙালি দর্শক একাধারে প্রথম শ্রেণীর নট ও প্রযোজককে প্রত্যক্ষ করেছিল। তাঁর অভিনয় ও নাট্যপ্রয়োগ কৌশলের মধ্যে বাঙালি প্রথম দেখল 'ইমোশনের' সঙ্গে 'ইমটেলেক্টের' সমন্বয়, কৌশল অপেক্ষা কলার প্রাধান্য। আর তা শুধু দর্শকের বিস্ময়সৃষ্টি করল না, পৌঁছে দিল অনুভূতির উচ্চ স্তরে। শিশিরকুমারই প্রথম দেখালেন সংলাপ স্বাভাবিক ভাবে বলেও কি অপূর্বভাবে নাটকের নাটকীয় মুহূর্ত বজায় রাখা যায়, স্থান বিশেষে অভিনেতার মূক অভিব্যক্তিও দর্শকের মনে কি গভীরভাবে রেখাপাত করে। এর পরেই আসে তাঁর কণ্ঠস্বরের কথা। সে কথা শুধু দেশে কেন, বিদেশে পর্যন্ত একবাক্যে স্বীকৃত হয়েছে—মঞ্চে সে ছিল এক প্রচণ্ডতম বিস্ময়। নাট্যাচার্যের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল বাঙলার মঞ্চকে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক গৌরবের বস্তু করে তোলা। রবীন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উন্নীত করেছিলেন, শিশিরকুমারও বাঙালীর নাটককে বিশ্বের সাংস্কৃতিক দরবারে মর্যাদার আসনে উপস্থিত করেন।

শিশিরকুমারই প্রথম রবীন্দ্রনাথকে অভিনয় করলেন নাট্যকার হিসেবে, তাই তিনি ছিলেন বিশ্বকবির পরম স্নেহাস্পদ। ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রকে তাঁরই জন্য নাট্যকার হতে হয়েছিল। শরৎসাহিত্যের বহু চরিত্রের সঙ্গে তিনি বাঙালির নূতন করে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমে। শিশিরচন্দ্র-সৃষ্ট রঙ্গমঞ্চ যখন যোগ্য-প্রতিভার অভাবে ব্যর্থতার পাঁকে ডুবতে বসেছে তখন তাকে পুনরুদ্ধার করে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, নূতনতম আঙ্গিকের প্রয়োগে নাট্যধারার যুগান্তর নিয়ে এসেছেন, অভিনয়কলার আশ্চর্য রূপান্তর সাধন করেছেন। অথচ সেই শিশির প্রতিভার অস্তিমকাল কী বেদনাদায়ক! নিদারুণ দারিদ্র্য আর চরম অর্থকষ্টে দীপ্ত প্রতিভার এই শোচনীয় পরিণতি একদা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি মাইকেলের জীবনে। অমূল্য ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল বাঙলাদেশে তার পুনরুক্তি ঘটে গেল। শুধু কি তাই?

রবীন্দ্রনাথের নাটককে যিনি একদিন বাঙালির মর্মকলে পৌঁছে দিয়েছিলেন সেই শিশিরকুমার মাত্র সাত হাজার টাকার জন্য 'ঘরে বাইরে' মঞ্চস্থ করতে পারছেন না—এই কথাটি বিশিষ্ট সংবাদপত্রের প্রতিনিধি তাঁরই মুখ থেকে শোনবার পরও এক লাইন লিখবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি।

গর্ডন ক্রেগ তাঁর Henry Irving গ্রন্থে লিখেছেন :

"I have never known of, or seen, or heard, a greater actor than Irving. ....No one thought of the stage as Irving did; no one felt about it that it should be reformed altogether; only Irving determined to reform it as much as one man possibly could do." আর আর্ভিং প্রসঙ্গে আর্চার লিখেছেন : "Irving was the greatest actor England has ever given birth to." শিশিরপ্রতিভা সম্পর্কে মন্তব্য দুটিই সমান প্রযোজ্য। অথচ তাঁকেই আমরা শেষজীবনে অবহেলা ও অনাদরের অন্ধকার গহ্বরে ঠেলে দিয়েছি।

মনে পড়ে দশ বৎসর পূর্বে বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মাইকেল মধুসূদনের ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয়। পিতা রাজনারায়ণকে উদ্দেশ্য করে মাইকেল-রূপী শিশিরকুমারকে যখন বলতে শুনেছিলাম : "সাগরদাঁড়ি গ্রাম থাকবেনা। তোমার দত্তবংশ থাকবে না, যদি থাকে, থাকবে এই বিদেশী পুত্র মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম"—তখন মনে হয়েছিল যুগদ্রষ্টা কবির পক্ষে যে কথা বলা সম্ভব, নূতন যুগের নূতন মাট্যধারার প্রবর্তক এক অসাধারণ নটের পক্ষে কি ঠিক সেই কথা এমন দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলা সম্ভব? সাহিত্য প্রতিভা ও অলৌকিক রসসৃষ্টির সঙ্গে একটা স্থায়ী, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপাদান মিশে থাকে, তাই সার্থক সাহিত্যিকের মৃত্যুর পরও এমন একটা কিছু থেকে যায় যার মধ্য দিয়ে ভাবীকালের মানুষ তার সৃষ্টিকে নূতন করে আবিষ্কার করে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়। শেক্সপীয়রের মৃত্যুর প্রায় পাঁচশ বৎসর পরে তার সৃষ্টির মূল আবেদনটি আজও আমাদের শাশ্বতলোকের সামনে ধরা দেয়। কিন্তু অতীতের সমস্ত মহাভিনেতা যাদের অভিনয়ে শেক্সপীয়রের নাটক একদা প্রাণবন্ত হয়ে উঠত আজকের মানুষের কাছে তারা চির নীরবতার কোন অতল গহ্বরে তলিয়ে গেছে। কিন্তু এক অসাধারণ নট ও নাট্যব্যবস্থাপককে তাঁর জীবিতকালেই দেশ অবহেলায় ভুলতে বসেছে এমন দৃষ্টান্ত বোধকরি একমাত্র বাঙলা দেশেই সম্ভব। তাই মনে হয় আগামী পঁচিশ বৎসরের মধ্যে নাট্যাচার্যের

অলৌকিক অভিনয়-প্রতিভা যদি জনপ্রবাদের মূলে অত্যধিকতায় বিলীন হয়ে যায় তাহলেও হয়তো আশ্চর্য হবার কিছুই থাকবে না।

কিন্তু বাঙালি মাত্রই যে 'আত্মবিস্মৃত' বা অকৃতজ্ঞ নয় তার প্রমাণ 'শিশির-কুমার ও বাংলা থিয়েটার' গ্রন্থের প্রকাশ। সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে সুপরিচিত, নাট্যানুরাগী সাহিত্যিক যদি বাপটি ইতিপূর্বে অনেকগুলি জীবন-চরিত লিখে বিদগ্ধ পাঠকদের প্রশংসা অর্জন করেছেন। বর্তমান গ্রন্থে লেখক পত্রাদ্যুপতিক জীবনচরিত লেখেন নি, বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পটভূমিতে যুগপ্রবর্তক নটের প্রতিভার সার্থক পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। একখানি গ্রন্থের মাধ্যমে নাট্যাচার্যের অনুপম অভিনয় প্রতিভার কতখানি যে ধরে রাখা যায় শ্রীবাপটির লেখা পড়ে সে কথা বোঝা গেল।

লেখক যথেষ্ট পরিশ্রম সহকারে শিশিরকুমার সম্পর্কে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করেছেন। শিশিরকুমারের আদর্শনিষ্ঠা, সংকল্প উৎসর্গীকৃত জীবন মহিমার পরিচয় দিয়ে ও তাঁর অভিনয় দক্ষতার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে নাট্যাচার্যের লোকোত্তর প্রতিভাকে পাঠকের অনুভূতির সীমানায় নিয়ে এসেছেন। আশা করি বিদগ্ধ বাঙালি মাত্রই শ্রীবাপটির এই সার্থক প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাবেন।

শিশিরকুমারের মধ্যে বাঙালি দর্শক একাধারে প্রথমশ্রেণীর প্রযোজক, নট ও নাট্যশিক্ষককে প্রত্যক্ষ করেছিল। আলোচ্য গ্রন্থে শিশিরকুমারকে প্রযোজক ও নটরূপে আমরা যতখানি দেখতে পেলাম নাট্যশিক্ষক হিসাবে তাঁর ততখানি পরিচয় পাওয়া গেল না। নাট্যাচার্য তাঁর অভিনয় শিক্ষা কৌশলে বহু অপরিচিত ও অশিক্ষিত নট-নটীকে বাঙলার মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁরই শিক্ষায় শিক্ষিত অনেক নট নটী তাঁকে ছেড়ে অন্যমঞ্চে যোগদান করেছে, অনেকে অকালমৃত্যু বরণ করে তাঁর আগেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে—বার বার তাঁর থিয়েটারের তরী হাটে ভাঙন ধরেছে। কিন্তু প্রতিবারই অখ্যাত অপরিচিত নূতন অভিনেতা অভিনেত্রীদের তাঁর অপূর্ব শিক্ষায় শিক্ষিত করে সার্থক অভিনয়ের আয়োজন করেছেন। শ্রীবাপটি যদি এত পরিশ্রম ও নিষ্ঠা সহকারে শিশিরকুমার সম্পর্কে সমস্ত জ্ঞাতব্যতথ্য সংগ্রহ করে তাঁর বিপদ আলোচনা না করতেন তাহলে নাট্যশিক্ষক হিসাবে শিশিরকুমারের যেটুকু পরিচয় তিনি আমাদের দিয়েছেন হয়তো সেটুকুই যথেষ্ট হোত। কিন্তু লেখক যখন গ্রন্থটি এত তথ্যসমৃদ্ধ করবার চেষ্টা করেছেন, তখন মনে হয় নাট্যাচার্যের

অভিনয় নাট্য-শিক্ষাপ্রণালী সম্পর্কে আর একটু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন ছিল। মনে হয় সেই একই কারণে শিশিরকুমারের সমসাময়িক বাঙলা থিয়েটারের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় প্রতিভার আর একটু পরিচয় দিলে ভাল হোত। শিশিরকুমারের সমসাময়িক তিনিই একমাত্র নট যিনি শিশিরসম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ বহির্ভূত হয়েও বাঙলা মঞ্চে বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। শিশিরকুমারের পরেই বিভিন্ন নাটকে নায়কের ভূমিকায় দীর্ঘদিন অভিনয়ের গৌরব একমাত্র তিনিই লাভ করেছিলেন। অথচ তাঁর প্রতিভার সুষ্ঠু আলোচনা ত দূরের কথা বাঙলা মঞ্চের তারুণ্যের প্রতীক সেই দুর্গাদাসের কোন ছবিও আলোচ্য গ্রন্থে নেই।

শ্রীবাগচি শিশিরপ্রতিভার অনুরাগী, ভক্ত; কিন্তু তাঁর রচনা কোথাও ভাবাবেগের অতিশয্যদোষে দুষ্ট নয়। লেখকের ভাষা স্বতঃস্ফূর্ত, সমালোচনা ও বিশ্লেষণ যুক্তিনির্ভর। পরিশিষ্টটি গ্রন্থের একটি মূল্যবান সম্পদ। এই বিষয়ে লেখকের পরিশ্রম অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী রাখে।

অমূল্যধন দাশশর্মা

"বাংলার লোকপ্রকৃতি"

ভারতবর্ষের অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়েই ইদানীং নৃতত্ত্ব পড়াবার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ অধ্যাপক ও ছাত্রের মধ্যে বা রচনায় ভারতবর্ষের বিশেষ সংস্কৃতি সম্বন্ধে কৌতূহল বা জিজ্ঞাসা নেই। আর আমাদের মতো সাধারণ মানুষ তো এখনও নৃতত্ত্ব বলতে মানুষের আকৃতি সংক্রান্ত গবেষণাই বুঝে থাকে এবং মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে এই গবেষণার অবকাশ নেই কোম্ আমলের বই ফ্রেজারের "স্বর্ণশাখা"তেই আবদ্ধ বলে জানি। এই পরিপ্রেক্ষিতে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রণীত "বাংলার লোকপ্রকৃতি"-র প্রকাশ রীতিমতো উল্লেখযোগ্য ঘটনা, এবং স্বদেশী সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান প্রতিটি শিক্ষিত বাঙালীর ঘরে এ-বই এক কপি করে থাকা উচিত।

বাংলা বারো মাসে তেরো পার্বণের দেশ। এই সমস্ত ব্রত, পার্বণ, অনুষ্ঠান, লৌকিক দেবদেবীর পূজা ও মঙ্গলাচরণের বহিরঙ্গ এখনও অনেক বাঙালীর ঘরেই পালিত হয় বটে, কিন্তু শিল্পকেন্দ্রিক সভ্যতার চাপে লোক-সংস্কৃতির

একদা-সমৃদ্ধ ঐতিহ্য সম্প্রতি অবক্ষয়ের মুখে। এসব লোকাচারের তাৎপর্য ও এসবের মাধ্যমে বাংলার জন-জীবনের যে-পরিচয় জানা সম্ভব সেটাই তো বাঙালীর ইতিহাসের প্রকৃত ভিত্তি।

রবীন্দ্রনাথ যাঁকে "হাল বাংলার সিদ্ধিদাতা গণেশ" বলেছেন সেই রবীন্দ্রনাথই অবশ্য এক্ষেত্রেও সিদ্ধিদাতা: তিনিই সর্বপ্রথম বাংলার লোক-সংস্কৃতির প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর পরে রামেন্দ্রসুন্দর, দীনেশ সেন, যোগেশ বিদ্যানিধি, ক্ষিতিমোহন, মনসুরউদ্দিন, অন্নদাশঙ্কর রায়, বিনয় ঘোষ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সেই ধারার অন্যতম কৃতী পথপ্রদর্শক আশুতোষ ভট্টাচার্য। তিনি একান্ত একনিষ্ঠ-ভাবেই লোক-সংস্কৃতির শব্দে নতুন নতুন তথ্য-সংগ্রহ এবং তত্ত্ববিচারের মাধ্যমে বাঙালীর লৌকিক চিৎপ্রকর্ষের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয়েছেন। শিবের গাজন, পাট পুজো, দামড়ার ধর্মঠাকুর, কালভৈরব হুমলা, লাউকুড়ি, ভাদু পুজো, ভিরকুমার, ওলাইচণ্ডী, শুভকালী, বকা পক্ষী প্রভৃতির ঐতিহাসিক স্বরূপ, এগুলি পালনের বিশেষ প্রকরণ ও প্রথার বিশদ ও জীবন্ত বিবরণে বইটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক: এসব অনুষ্ঠান বাংলাদেশের পক্ষেও সর্বজনীন নয়, বরং আঞ্চলিক, এবং আলোচ্য দেবদেবীগণ অনেকেই গত গ্রামের দেবদেবী: আবার অনেক অনুষ্ঠানই অবলুপ্তির পথে।

ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছে ধুঁইকোঁড় শিক্ষাভিমানী শ্রেণী কতটা ঋণী বোধ করবেন জানিনে, কিন্তু আমার মতো সাধারণ মানুষরা এ-বই পড়তে বসে নিশ্চয়ই অভিভূত হবেন। আমাদের সংস্কার, প্রচলিত রীতি-প্রথার মাঝে যে এত গূঢ় অর্থ ও তাৎপর্য লুকিয়ে আছে তা আমরা জানতামই না, তিনি আমাদের আত্মবিস্মৃতির খানিকটা অন্তত ভাঙতে পেরেছেন এবং আশাকরি এপথে তিনি আমাদের অজ্ঞতা আরও দূর করবেন।*

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

শ্রীশ্রীভগবদ্গীতা ও চণ্ডীর পার্থক্য

গীতায় যিনি শ্রীকৃষ্ণ, চণ্ডীতে তিনি মহামায়া। গীতায় যা' আছে, চণ্ডীতে

---

* বাংলার লোকসংস্কৃতি: আশুতোষ ভট্টাচার্য। পুরোগামী প্রকাশনী, কলিকাতা-৯

তা'র বিকাশ। তাবমন সচ্চিদানন্দ কর্মময়ী চণ্ডী। ফলতঃ গীতার জ্ঞানবিজ্ঞানের কার্যে প্রকাশ শ্রীশ্রীচণ্ডীতে :

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

চণ্ডীতে শ্রীশ্রীদেবী বলেছেন—

"যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদা অবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥"

গীতায় শ্রীশ্রীভগবান্ বলেছেন—

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।

চাতুর্বর্ণ্যের চরম বিকাশেই ধর্মরাজ্যের মোক্ষার্থ সিদ্ধ হয়।

চণ্ডীতেও দেখতে পাই, জ্ঞানের সিদ্ধ অধীশ্বর ভারতের ধী ও জ্ঞানশক্তির চরম বিকাশস্বরূপ যোগবল মেধস ঋষি ক্ষত্রিয়বীর সুরথ ও বৈশ্য সমাধিকে চরম রহস্য বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছেন। বাহুবল রাজা সুরথে বিশ্রব্ধাবিত এবং ধনবল বৈশ্য সমাধিতে প্রতিফলিত। যোগবলের সহায়তায় বাহুবল রাষ্ট্র-পরিচালনে পুনর্বিযোজিত হলো, যদিও পুনর্জন্মে সূর্যের ঔরসে সবর্ণার গর্ভে হলো সুরথের উৎপত্তি। প্রাণবল-সমন্বিত সমাধির হলো ব্রহ্মজ্ঞান লাভ।

যিনি কৃষ্ণ, তিনি কালী। পরব্রহ্মই শ্রীকালিকা। দেবীভাগবত মহামায়াকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবতী নামে অভিহিত করেছেন। রুদ্রযামলের মতও তাই—মহামায়াই পরব্রহ্ম। যথা, "ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা।" বাঙালী সাধকগণও এই তত্ত্ব অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেন। যথা, রামপ্রসাদ বলেন—

"কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "যিনি ব্রহ্ম, তিনি কালী।" পরব্রহ্মের সঙ্গে কালীর যা' পার্থক্য, শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার সঙ্গেও শ্রীশ্রীচণ্ডীর মৌলিক ঐ পার্থক্য—অর্থাৎ উভয়েই এক—পরব্রহ্মের রূপবর্ণনা মাত্র। একটিতে ভাব, অন্যটিতে কর্ম।

যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে : জন্ম শতবার্ষিকী

হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বকালে রাগসঙ্গীতের সৃষ্টি ধারায়,—ধ্রুপদ ও খেয়ালের, চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। মুঘল শাসনের পর থেকে নানা

কারণে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রসার ও প্রচার কমে যেতে থাকলো। শত দুঃখ বহন করে যদিও দেশীয় রাজন্যবর্গ একে বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন, এবং বিশিষ্ট ঘরানার ওস্তাদগণের,—আগ্রা, গোয়ালিয়র, লক্ষ্ণৌ, দিল্লীর—জীবনভর সাধনার কথা যদিও এপ্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়, তথাপি যেন অনেকটা নিশ্চিতভাবেই ধ্রুপদ ও খেয়ালের স্বাভাবিক মৃত্যু হচ্ছিল। এমন সময় এক শিক্ষিত আদর্শবাদ মারাঠী পণ্ডিত ও সঙ্গীতপ্রেমিক ভারতবর্ষের অবলুপ্ত সঙ্গীতধারাকে পুনরুজ্জীবিত করার দৃঢ় পণ গ্রহণ করলেন। সমস্ত জীবনব্যাপী দুরুঠোর সাধনা, চরম আত্মত্যাগ ও সুমহান কর্তব্যবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি একক প্রচেষ্টায় যা করলেন তা বহু যুগ ধরে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল জনসাধারণ স্মরণ করবেন।

১৮৬০ সালের ১০ই আগষ্ট বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন সঙ্গীতকেন্দ্র ঘুরে, সকল ঘরানার ওস্তাদদের সঙ্গে দিনের পর দিন থেকে অক্লান্ত পরিশ্রমে সেসকল ঘরানার বিখ্যাত বাণী ও অন্তরা উদ্ধার করেন ও স্বরলিপি করে গানগুলিকে রক্ষা করেন। এই পরিশ্রমের ফলস্বরূপ ছয় খণ্ডে "ক্রমিক পুস্তক মালিকা" প্রকাশিত হল। তারপর সঙ্গীতশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ "সঙ্গীত পদ্ধতি" এবং সংস্কৃত গ্রন্থ "অভিনব রাগমঞ্জরী" ও "লক্ষণ সঙ্গীত" প্রকাশ করেন। বিষ্ণুবলকে শুদ্ধ ঠাট স্বীকার করে সকল রাগগুলিকে দশটি ঠাটে বর্গীকরণ করেন। জনসাধারণের মনে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রুচি গঠন করবার জন্য লক্ষ্ণৌ, দিল্লী বেনারস, গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থানে সঙ্গীত সম্মেলনের প্রবর্তন করেন। লক্ষ্ণৌতে ভাতখণ্ডেজী 'সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। রাগের কূটতত্ত্ব বিশ্লেষণে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল বলে তাঁকে সকলে "চতুর পণ্ডিত" আখ্যা দিয়েছিল। বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদ নাসিরুদ্দিন খাঁ ও ওস্তাদ কৈয়াজ খাঁকে তিনি ধ্রুপদ ও খেয়ালের দুই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভূ মনে করতেন। আগ্রা ঘরানার খেয়াল গান সম্পর্কে তাঁর সবিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ সালে তিনি দেহত্যাগ করেন।

এই বৎসর তাঁর জন্মশতবার্ষিকী। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুরাগী সকলেই তাঁর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে ও শতবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে যথাযোগ্য অনুষ্ঠান করবেন আশা করি। এই বৎসর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুরাগ ও আদরে তাঁর

জীবনী ও সঙ্গীতের অবদান সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেন্দ্রীয় সরকারকেও এবিষয়ে যথাযোগ্য স্মারক অনুষ্ঠান করবার অনুরোধ জানাই।

মাইকেল মধুসূদন ও মেঘনাদবধের অভিনয়

মাত্র কয়েকদিন আগে (৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬০) মহাজাতি সদনে নবনাট্যম-অভিনীত মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদবধের কয়েকটি নির্বাচিত দৃশ্য দেখতে দেখতে একথাই বার বার মনে হয়েছে যে বর্তমান বাংলা সাহিত্যের, বিশেষত কবিতার, ক্ষেত্রে মাইকেল আবার নতুন করে অবশ্য পাঠ্য কবি হওয়া উচিত এবং সর্বাগ্রে। কারণগুলি সংক্ষেপে এই :

(১) বাংলা কবিতায় যথেচ্ছ শব্দ ব্যবহারকে সংযত করা প্রয়োজন

(২) শব্দের যথোপযুক্ত অর্থ উদ্ধারে আরো সচেষ্ট হওয়া উচিত

(৩) চিত্র-পরিকল্পনায় প্রকৃত শিল্পীর নির্মোহ দৃষ্টি আবশ্যক এবং

(৪) কবিতা কোন না কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়

এবং এবিষয়ে মাইকেল যতটা সাহায্য করবে, বাঙ্গালা কবিদের মধ্যে আর কেউ এতটা সংযম ও অভ্যাস আমাদের শেখাতে পারবেনা।

নাট্যরূপের দিক থেকে বলতে পারি, দৃশ্যাবলীর কল্পনায় নবনাট্যম মধুসূদনের কল্পনাকে কোথাও খাটো করেননি। যে গাম্ভীর্য এবং উচ্চ চিন্তা বইটির আগাপোড়া ব্যাপ্ত তাকে রূপদান করা সহজ নয়। এজন্য নবনাট্যমের পরিচালক কুশলী নট ও সুলেখক দেবব্রত সুরচৌধুরী ধন্যবাদার্হ। অভিনয়ে সরজিৎ বাবু তাঁর সহজসিদ্ধ দক্ষতা দেখিয়েছেন ও মকরাক্ষের ভূমিকায় মাখন মিত্রের অভিনয় খুঁটির অভিব্যক্তিব্যঞ্জক হয়েছে। নৃত্যপরিকল্পনার জন্য সুশীল বাবুকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। মহাজাতি সদনে যে তিলধারণের স্থান ছিলনা তা যুগপৎ নবনাট্যমের সুনাম ও মাইকেলের জনপ্রিয়তার কথা স্মরণ করায়।

পেঙ্গুইনের পঁচিশ বছর

ইংরেজীতে মাত্র দুটি শব্দে পেঙ্গুইন প্রকাশনীর বিবরণ দিতে হলে আমি বলতুম, এ হচ্ছে romantic adventure ; শুধুমাত্র দুঃসাহসী নয়, এর পেছনে যে আদর্শবাদ রয়েছে, জ্ঞানপ্রচারের স্পৃহা আছে তা কারুর নজর এড়ায়না।

পঁচিশ বছর পূর্বে মোট ১০০ পাউণ্ড নিয়ে যারা ব্যবসায় নেমেছিলেন তারা তখন কেউ ভাবতেসনা যে কোনদিন পেঙ্গুইন একটি আন্তর্জাতিক নাম হবে। ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অর্ধ শিক্ষিত, পৃথিবীর যে কোন দেশে সকলের ঘরেই এই প্রকাশনীর কিছু না কিছু বই পাওয়া যাবে। এবং সে সময় মোট দশটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল যার দাম বাংলা দেশে ছিল মাত্র ছ' আনা করে। পঁচিশ বছর পরে এক হাজারেরও ওপর দাঁড়িয়েছে এদের বইয়ের তালিকা। এখবর হয়ত অনেকের কাছে অজানা যে শ্রীযুক্ত কে. কৃষ্ণমেনন প্রথম থেকে পেঙ্গুইনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং পেলিক্যান সিরিজের প্রথম সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪০ সাল থেকে শিশুদের জন্যও নতুন সিরিজের বই প্রকাশিত হতে থাকলো এবং এ পর্যন্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ছাপান্নটি বিভাগে এদের বই প্রকাশিত হয়েছে। শুধু দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস নয়, জ্ঞানের নানা দিকে এদের তীক্ষ্ণ নজর রয়েছে :—রেফারেন্স বই, টেকনোলজি, বা নানা ধরণের গাইডবুকও এরা প্রকাশ করেছেন। চিত্র ও সঙ্গীতের ওপর এদের বিশেষ পক্ষপাতিত্বের কথা কারো অজানা নয়। মাত্র ছমাস আগে কলকাতায় আর্টিষ্ট হাউসে পেঙ্গুইনের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠান হয়ে গেল—তাতে শিক্ষিত সম্প্রদায় মাত্রই আমন্ত্রিত হয়েন। শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে পেঙ্গুইন যে আদর্শ ও উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন তার কোন তুলনা মেলে না।

অরুণ ভট্টাচার্য

আগামী মাঘ-চৈত্র ও বৈশাখ-আষাঢ় দুটি সংখ্যা মিলিতভাবে রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সংখ্যা রূপে বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হবে।

অরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক টেম্পল প্রেস, ২নং ডাবরন্ড লেন, কলিকাতা-৪ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পূজা পার্ব্বণে

ও

উৎসব অনুষ্ঠানে

লক্ষ্মী ঘি

অপরিহার্য

সর্ব্বদাই বিশুদ্ধ, পুষ্টিকর ও হৃদ্য

একশের টিন

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী

৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

ফোন ১২—৭৮৪৫

লিলি বার্লি

বিশুদ্ধ, টাটকা ও স্বাস্থ্যপ্রদ

লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৪

উত্তরসূরী

গিরিজাকুমার গুপ্ত
আদবেষার কাম্য, অসংগতি ও আধিভৌতিক বিদ্রোহ

ত্রিদিব ঘোষ
রবীন্দ্রনাথ ও মানুষের ব্যক্তিস্বরূপ

সুরজিৎ দাশগুপ্ত
ভারতবর্ষের ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ

সমরেন্দ্রনাথ রায়
রবীন্দ্রনাথ : শিল্পপ্রচেষ্টার প্রথম উন্মেষ

শোভন সোম : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণ ভট্টাচার্য, মানস রায়চৌধুরী, শোভন সোম, প্রণব মিত্র ও তরুণতর কবিদের কবিতা

'অবে-ফেরার দিন' প্রসঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর চিঠি

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে
বুদ্ধদেব বসুর উক্তি : একটি প্রতিবাদ

কবিতা সঙ্গীত শিল্পচর্চা ও সমালোচনার ত্রৈমাসিক মুখপত্র

অষ্টম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৮

দ ধি ম ঙ্গ ল

অতি প্রাচীনকাল হইতে বিবাহ আচার পদ্ধতির মধ্যে "দধি মঙ্গল" বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। উহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে বিবাহিতের দীর্ঘায়ু ও চিরযৌবন কামনায় "দধি মঙ্গল" অনুষ্ঠান দধির অদ্বিতীয় গুণাবলীর উপরই প্রতিষ্ঠিত। এককালে দধির ব্যবহার অক্ষুণ্ণ যৌবন ও দীর্ঘজীবন লাভের সহায়ক ছিল। কালক্রমে দধি অপজ্ঞাত হওয়ায় উহার উক্ত শক্তি লোপ পাইয়াছে।

দধি পরিশ্রান্ত দেহের ক্লেশ নিবারক ও পরিপাক শক্তিবর্দ্ধক এই জন্য প্রত্যূষে তক্র পানের রীতি ভারতে সর্বত্র ব্যাপকভাবে প্রচলিত। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে ইহার লুপ্ত শক্তির পুনরুদ্ধার বহুলাংশে সফল হইয়াছে। আমরা এই প্রথায় দধি উৎপাদন করিতেছি।

কে সি দাশ প্রাইভেট লিমিটেড

আবিষ্কারক—রসোমালাই

কলিকাতা

রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছিন্নপত্রাবলী

'ছিন্নপত্র' গ্রন্থের পূর্ণতর সংস্করণ। ১০৭টি নূতন চিঠিও আছে। বোর্ড বাঁধাই ১০৲, মোটা কাগজে ছাপা ও কাপড়ে বাঁধাই ১২৷৷০

য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

পূর্ব-প্রকাশিত দুইটি খণ্ড বর্তমান সংস্করণে একত্রে গ্রথিত। 'ডায়ারি'র প্রাথমিক খসড়াটি আদ্যন্ত সংকলিত; পূর্বে কখনো গ্রন্থভুক্ত হয় নাই। কাগজের মলাট ৫৲, বোর্ড বাঁধাই ৬৷৷০

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র

অধুনা চলিত বাংলায় লেখা কবির প্রথম ইংলণ্ডগমন ও প্রবাসবাসের সুখোদ্য বিবরণ। কাগজের মলাট ৪৷৷০; বোর্ড বাঁধাই ৫৲

শেষ সপ্তক

শেষ সপ্তকে মুদ্রিত দশটি গদ্যকবিতার সুখোধ্য রূপ বা রূপান্তর এই সংস্করণে সংযোজিত। সচিত্র কাগজের মলাট ৪৷৷০ বোর্ড বাঁধাই ৫৷৷০

বীথিকা

সতরাধিক সংস্করণে সমকালীন দশটি নূতন কবিতা সংযোজিত বিশেষ শোভন সংস্করণে বিভিন্ন কবিতার ভাব ও বিষয়বস্তুর দ্যোতক কয়েকখানি রঙিন ও একরঙা ছবি গ্রথিত। বাঁধাই ৩৷৷০

কালান্তর

নূতন সংস্করণে সাতটি প্রবন্ধ গ্রন্থভুক্ত।

কাগজের মলাট ৪৷৷০

বিশ্বভারতী

উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকা

কথাবার্তা

সমসাময়িক ঘটনাবলী ও সাহিত্য বিষয়ক বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৬৲ টাকা; ষাণ্মাসিক—৩.৫০ টাকা

●

উইক্‌লি ওয়েষ্ট বেঙ্গল

সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত ইংরেজি সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৭৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

●

বসুন্ধরা

প্রাচীন অর্থনীতি ও কৃষি-বিষয়ক বাংলা মাসিক পত্র। বার্ষিক ২৲ টাকা।

●

শ্রমিক বার্তা

শ্রমিক-কল্যাণ সংক্রান্ত বাংলা হিন্দি পাক্ষিক-পত্র। বার্ষিক ১.৫০ টাকা; হিন্দি—.৭৫ নয়া পয়সা।

গ্রাহক হবার জন্য এই ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

প্রচার অধিকর্তা—
পশ্চিমবঙ্গ-সরকার,
রাইটার্স বিল্ডিংস্,
কলিকাতা-১

আমাদের প্রকাশিত বই

প্রবোধকুমার সান্যাল

মনে রেখ (উপন্যাস)

অন্নদাশঙ্কর রায়

মেখা
অপ্রমাদ
জাপানে
রূপে দায়
পথে প্রবাসে

প্রতিভা বসু

অতল জলের আহ্বান ৩.৫০
মধ্যরাতের তারা ৩.২৫

সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন সংকলিত

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস ৭.০০

জওহরলাল নেহরু

পত্রগুচ্ছ

প্রাণতোষ ঘটক

রাজায় রাজায় (উপন্যাস)

বুদ্ধদেব বসু

কালিদাসের মেঘদূত ৬.০০
আধুনিক বাংলা কবিতা ৬.০০
সোনপাংশু (উপন্যাস) ৪.০০
নেব পাণ্ডুলিপি (উপন্যাস) ৩.২৫
নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবী সম্পাদিত
কাব্যদীপালি ৭.০০

অজিত দত্ত

জানালা (কবিতা)

দীপক চৌধুরী

পাতালে এক ঋতু (১ম)
ঝড় এলো
সন্ধিবিষ

সুলেখা সরকার

রান্নার বই ৫.০০

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

খুসকি **ব্রাহ্মী হেয়ার অয়েল**

বহিক ত্বিক-শীতল রাখার জন্য ইহা একটি মৃদু-মধুর সুবাসিত আয়ুর্বেদীয় কেশতৈল। নিয়মিত ব্যবহারে অকালে চুল ঝরে এবং নূতন চুল গজায়। কেশ বৃদ্ধিরও সহায়ক।

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা
বোম্বাই
কানপুর

•

মানস রায়চৌধুরীর
প্রথম কাব্যগ্রন্থ
অনিদ্র গোলাপ
শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে
মূল্য আড়াই টাকা

মানস প্রকাশনা
৬৪ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

চিত্তরঞ্জন দেব ও বাসুদেব মাইতি
কর্তৃক সংকলিত

রবীন্দ্র-রচনা-কোষ
প্রথম খণ্ড : প্রথম পর্ব
মূল্য : ছয় টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

ক্যালকাটা পাবলিশার্স,
১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

রবীন্দ্র-রচনা-কোষ
প্রথম খণ্ড : দ্বিতীয় পর্ব
(যন্ত্রস্থ)

বিশ্বভারতী গবেষণা বিভাগ কর্তৃক
প্রকাশিত হচ্ছে

এত চুল ওজস্বিনী!

নিয়মিত কেশরঞ্জন ব্যবহারে আপনার চুল ও মস্তিষ্ক সমান ভাবে উপকৃত হবে। কেশ-রঞ্জনের ভেষজ গুণের উপর আপনি পুরোপুরি নির্ভর করতে পারেন

কবিরাজ এন,এন সেনের
কেশরঞ্জন
ওষধিগুণে কেশতৈল

কবিরাজ
এন. এন. সেন এণ্ড কোং
প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা

নিত্য ব্যবহারে

নিম
টুথ পেষ্ট

একটি
ক্যালকেমিকো
অবদান

ছেলেবেলা থেকে এই টুথ পেষ্ট ব্যবহার করলে দাঁত শক্ত ও মাড়ী সুদৃঢ় হয়।

স্নান করতে হ'লে
হামাম মেখেই করবেন

হামাম সাবান

পরিবারের
সকলেরই জন্য

...অল্প চলেও অনেকদিন !

টাটার-তৈরী

আহারের পর
দিনে দু'বার..

সব ঋতুতে
স্বাস্থ্য লাভের
শ্রেষ্ঠ উপায়

সুপুষ্ট স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান

সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা

ঐক্য ও সমন্বয়ের সাধনায়

ইতিহাসের অন্য ঐশ্বর্যের—অন্য অনেক সম্পদের সাক্ষ্যের সঙ্গে ভারতী আমাদের ইতিহাসের আলোচনায় দাঁড়াবে। এই পত্রিকাটি বিভিন্ন মতের এবং প্রদেশ, বিভিন্ন, ভাবনার এবং বিভিন্নী সাধনার ও শিক্ষা-সমাজ মন্ত্র।

বিশ্বনাথের যে সাধনা সৌভাগ্য তার ফলে ইতিহাসিক, সমাজ-বাসীদের ভাবনাচিন্তাদির অধীনতার উপযুক্তের ও ফলের যোগ না সাধিত ও সাধিত এবং বিভিন্ন ও অনেক। ইতিহাস এই যে তার সাধনের সাধনাটি ফুরুক, ভাবনাটির সমন্বয় না সাধিত আমাদের আলোচনায় ও ভাবনাটি ফুরুক এই বিভিন্ন ও বিভিন্নী সাধনাটির সাধুবাদের।

যোগসাধন সাধনার এই বিভিন্ন, বিভিন্নী সাধনাটির ঐক্য ও সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন জানাটির।

এই সকল পরস্পর-বিরোধী গুণের
একত্র সমন্বয়ে প্রস্তুত

নিবে কালি শুকায় না,
কিন্তু কাগজে দ্রুত শুকায়।

রঙের যথেষ্ট গভীরতা, তবু
অবাধে লেখা এগিয়ে চলে।

লেখা ঘুয়ে-মুছে যায় না,
অথচ কলম পরিষ্কার রাখে।

সুলেখা কালি

অন্য কোন কারণে না হ'লেও অন্ততঃ এই কারণেই
সুলেখা আজ সর্বোচ্চ বিক্রয়ের গৌরব অর্জন করেছে।

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা • দিল্লী • বম্বে • মাদ্রাজ

উত্তরসূরী

অষ্টম বর্ষ ॥ চতুর্থ সংখ্যা ॥ শ্রাবণ-আশ্বিন ॥ ১৩৬৮

প্রবন্ধ

শিবিরকুমার গুপ্ত : আলবেয়ার কামু, অবসেশন ও আবিষিক বিদ্রোহ ৪১৩। ত্রিদিব ঘোষ : রবীন্দ্রনাথ ও মানুষের ব্যক্তিস্বরূপ। ৪৪০। সুরজিৎ দাশগুপ্ত : ভারতবর্ষের ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ। ৪৪৪। সমরেন্দ্রনাথ রায় : রবীন্দ্রনাথ—শিল্পপ্রচেষ্টার প্রথম উন্মেষ। ৪৫৮। সোভন সোম : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা। ৪৩৩।

কবিতাবলী

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণ ভট্টাচার্য, প্রণব মিত্র, মানস রায়চৌধুরী, সোভন সোম, অসিতকুমার ভট্টাচার্য, ঘটকরুক্ষ দে, অমিত দত্ত, বিবেকেন্দু পালিত, যদেশরঞ্জন দত্ত, মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, আশিষ লাহিড়ী প্রভৃতি ভট্টাচার্য, অমিরুদ্ধ কর, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শান্তি লাহিড়ী, পরিমল চক্রবর্তী, দেবব্রত চক্রবর্তী (৪৮২-৫০২)

সমালোচনা সাহিত্য

আকাশিবী ও মৃন্ময়ী (বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়) কটি কবিতা ও একলব্য (মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়) অন্ধকার বারান্দা (বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী) বিলিত লণ্ঠন (অরুণ ভট্টাচার্য) যদেশরঞ্জন দত্ত। মৌমাছিতন্ত্র (শিবনারায়ণ রায়) নির্মল মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ ও প্রবন্ধ (প্রফুল্লকুমার দাশ) সমরেশ চৌধুরী (৫০৮-৫৩০)

আলোচনা

'ঘরে-ফেরার দিন' প্রসঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর চিঠি
রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর উক্তি। একটি প্রতিবাদ : অরুণ ভট্টাচার্য

সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য

প্রধান দপ্তর : ৯বি-৮ কালিচরণ ঘোষ রোড ॥ কলিকাতা ৫০

Standard-Vacuum pays humble homage to
Gurudev Rabindranath Tagore
on the occasion of his Birth Centenary.

STANDARD-VACUUM OIL COMPANY Incorporated in the U.S.A. with limited liability.

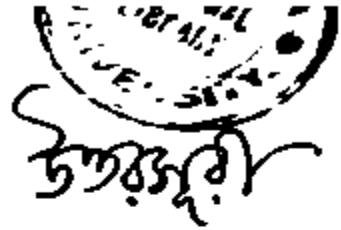

অষ্টম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৮

আলবেয়ার কামু, অসংগতি ও আধিবিদ্যক বিদ্রোহ

শিহিরকুমার গুপ্ত

—"He found the Archimedean point, but he used it against himself; it seems that he was permitted to find it only under this condition."—Franz Kafka.

—"No, I will not be erased, I will stand as a witness against thee."—Soren Kierkegaard.

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বুদ্ধি দ্বারা অস্তিত্বের যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদানে অসমর্থ হ'য়ে যাঁরা যৌক্তিকতা ও অভিজ্ঞতার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ ব্যবধান আবিষ্কারের ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে বাধ্য হয়েছেন যে অযৌক্তিকতাপূর্ণ বিশ্বজগতে সুখলাভ অন্বেষণ বৃথা—তাঁদের এই বিশেষ সচেতনতার নাম অসংগতিবোধ[২]। যুক্তিহীন ও সামঞ্জস্যহীন এই বিশ্ব এবং সংগতি ও ঐক্য অনুসন্ধানী মন—এ দুয়ের মধ্যে পারস্পর্য ও প্রতিসঙ্গের অনুপস্থিতিই এই চেতনার জন্ম দায়ী। ইউরোপীয় দর্শনে ও সাহিত্যে এই সচেতনতার ইতিহাস মোটেই নতুন নয়। বহু লেখক ও সমালোচক কাম্যু[১]-র সাহিত্য ও দর্শন আলোচনাপ্রসঙ্গে তাঁকে এই দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্ভাবক হিসাবে উল্লেখ করায় তিনি বহুবার তাদের এই ধারণার প্রতিবাদে বলেন যে Le mythe du Sisyphe

---

আলবেয়ার কামু,১ অসংগতিবোধ২ ও আধিবিদ্যক বিদ্রোহ৩ ॥

১ ফরাসী ভাষায় এ নামের উচ্চারণ কেমু বা কাম্যা নয়; শুধু দক্ষিণ ফ্রান্সে এর প্রচলিত উচ্চারণ ইংরাজী মত—কামুয়্।

২ the Sense of the absurd (Sensibilité absurde)

৩ Metaphysical revolt.

(The myth of Sisyphus) গ্রন্থে তিনি যে দার্শনিক প্রত্যয়ের বিশ্লেষণ করেন তার নির্দেশ শুধুমাত্র যুক্তিবাদবিরোধী দর্শনের নয়, প্রাচীন রোমান দার্শনিক Tertullianএর Credo quia absurdum est-তেও বর্তমান। কাম্যু Le mythe-এ যে অসংগতিবোধিতার (Sensibility) আলোচনা করেন তার সংগে পরম সত্য বা পরম মূল্যের কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই। সংক্ষেপে তার আলোচনার বিষয় হচ্ছে : সহজাতভাবে সুখশান্তির অভিলাষ জীবনের অপ্রতিহত ধারাবাহিকতার স্পৃহা, এবং প্রকৃতি ও অন্যান্য মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ স্থাপনের বাসনা—অস্তিত্ব-প্রকৃতির নিকট সমগ্রমানবিক মানুষের এই কামনারাশির পরাজয় প্রতিবারই অনিবার্য, যতক্ষণ না মনুষ্য-অবস্থার (The human condition) রূপান্তর সংঘটিত হচ্ছে। সুতরাং সচেতনে বা অচেতনে মানুষ যখন নৈরাশ্য, উৎকণ্ঠা, নিঃসঙ্গতা, একাকীত্ব ও মৃত্যুতত্ত্বের সম্মুখীন হয়, তখন ব্যক্তিগতভাবে তার কি করা উচিত—এই আলোচনাই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য।

ইউরোপীয় চিন্তাধারায় যুক্তিবাদবিরোধী দর্শনের সংগে অসংগতিবোধ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ক্লাসিকাল যুক্তিবাদের দাবী বর্জিত হওয়ার সাথে সাথে এই দর্শনের অভ্যুত্থান হয়। ফরাসী দর্শনে ও সাহিত্যে অসংগতিবোধের সহস্রত ও অসংখ্য আলোচনা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়, কারণ ফ্রান্সে যুক্তিবাদবিরোধী দর্শনের ঐতিহ্য বিশিষ্টভাবে বর্তমান। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অধ্যায়ে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই ঐতিহ্য হেনরি বার্গসঁ, থিও ব্রাশভিগ্, এমিল মেয়ারসন ইত্যাদি দার্শনিকদের চিন্তাধারায় পুরোভাগে উপস্থিত হয়। যুক্তির অনিশ্চিত ফলপ্রসবতাকে এবং বুদ্ধি দ্বারা বহির্জগতের সাথে সংযোগ স্থাপনের সীমাবদ্ধ ক্ষমতাকে স্বীকার ক'রে তাঁরা এই মত পোষণ করেন যে বাস্তবতার সংগে পুরোপুরি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় অসমর্থ হ'য়ে যখন যুক্তি অভিজ্ঞতাকে পদার্থভুক্ত করার চেষ্টা করে, তখন অভিজ্ঞতার অন্তর্নিহিত কয়েকটি অযুক্তিসিদ্ধ অবশেষকে যুক্তি কিছুতেই স্পর্শ করতে পারে না; এবং যৌক্তিক অবোধগম্যতার সম্মুখীন হ'য়ে মনুষ্যজন যোক্তগম্যতার পরিবর্তে শুধুমাত্র সাধারণ বিবরণ ব্যতিরেকে অন্য কিছু প্রদান করতে অক্ষম। এই চিন্তার প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই মারসেল্ প্রুস্ত, রমাঁ রোলাঁ ও চার্লস পেগি

—এর সাহিত্য সৃষ্টিতে, চার্লস্ বুদলেয়ার ও আলবেয়ার তিবোদে-এর সমালোচনা সাহিত্যে এবং Symbolists ও Impressionists-দের শিল্পপ্রচেষ্টায়।

হেনরি বার্গসঁ-এর যুক্তিবাদবিরোধী দর্শনের এক বিশিষ্ট রূপ হচ্ছে অন্তিমের অধিষ্ঠিত বোধগম্যতার প্রতি সুনিশ্চিত বিশ্বাস। বুদ্ধি দ্বারা বাস্তবতার সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভে সক্ষম না হয়েও এই বাস্তবতার যথার্থ রূপ নির্ণয় অন্যপ্রকারে সম্ভব—তাঁর এই স্বজ্ঞাতত্ত্ব (doctrine of intuition) অনুযায়ী ব্যক্তি ও অভিজ্ঞতার মধ্যে সম্পূর্ণ যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব। কিন্তু সমসাময়িক 'অসংগত' দার্শনিকদের মতে বাস্তবতা শুধুমাত্র অজ্ঞাতই নয়, অজ্ঞেয়, এবং ঠিক এইখানেই সমসাময়িক অসংগতিবোধ চিন্তাধারায় একটি নূতনতর মূঢ়তার আবির্ভাব পরিলক্ষিত হয়। যুক্তি, স্বজ্ঞা বা অনুরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা স্পর্শনীয় কোন বোধগম্যতার অস্তিত্ব তাঁরা স্বীকার করেন না। "আঁদ্রে মালরো জঁ-পল সার্ত্র ও আলবেয়ার কাম্যু-র জীবন-জিজ্ঞাসায় এই অসংগতি যে বিশিষ্ট আকার ধারণ করেছে তার ফলে যুক্তি বা অনুরূপ জ্ঞান দ্বারা বাস্তবতার প্রকৃত রূপ নিরূপণ অসম্ভব।"২

এই আধিবিদ্যক অর্থে সমসাময়িক ফরাসী সাহিত্যে ও দর্শনে absurde (absurd) শব্দটীর সর্বব্যাপী প্রয়োগ খুবই আকর্ষণীয়। La Condition Humaine (The Human Condition) La Tentation de l'Occident (The Temptation of the West), La Voie Royale (The Royal Way), Les Conquérants (The Conquerors), Les Noyers de l'Altenburg (The Walnut Trees of Altenburg) ইত্যাদি গ্রন্থে আঁদ্রে মালরো বিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় মানুষের উপর এই আধিবিদ্যক অসংগতির নিশ্চিত প্রভাবের রূপ ব্যক্ত করেন। La Tentation de l'Occident-এর এক চরিত্রের মুখে আমরা শুনতে পাই: "At the center of European Man, dominating the great moments of his life, there lies an essential absurdity." এই প্রত্যয় সম্বন্ধে সার্ত্র-র অস্তিমতের সন্ধান আমরা পাই তার La Nausee (the Diary of Antoine Roquentin) উপন্যাসের নায়ক Roquentin এর চিন্তা রোমন্থনে: ".....the nausea is not inside me; I feel it out there, in the wall, in the suspenders; everywhere around me. It makes itself one with the café; I am the one who is within it....."

(trans. Lloyd Alexander) এবং অন্যান্য অনেক লেখকের এই বিষয়ে আলোচনা সত্ত্বেও কাম্যু-র Le Mythe de Sisyphe গ্রন্থে এর পূর্ণ বিশ্লেষণ ও বিস্তারিত অনুসন্ধান সর্বপ্রথম পরিলক্ষিত হয়। 'absurdity' শব্দটির নিশ্চিত অর্থ সম্বন্ধে Malraux৯, Sartre ও Camus-এর মতভেদ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা এই সম্পর্কে একমত যে বিশ্বের আপাত অসংগতির ব্যাখ্যা যুক্তিসিদ্ধ পদার্থ দ্বারা সম্ভব নয়। কাম্যু-র দার্শনিক যুক্তিতর্কীয় সমালোচনায় সার্ত্র ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসের Monde Nouveau Paru পত্রিকায় লেখেন—"Camus' philosophy is a philosophy of the absurd. For him the absurd arises from the relation between man and the world, between man's rational demands and the world's irrationality. The themes which he derives from it are those of classical pessimism. I do not recognise the absurd in the sense of scandal and disillusionment that Camus attributes to it. What I call the absurd is something very different it is the universal contingency of being which is, but which is not the basis of its being: the absurd is the given, unjustifiable, primordial quality of existence."

"There is but one truely serious philosophical problem and that is suicide."১০ এইরূপ নাটকীয় ভংগীতে Le Mythe আরম্ভ করার পর কাম্যু এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেন যে, এই অসংগতিপূর্ণ বিশ্বে মানুষের জীবন ধারণের বিশেষ কোন কারণ আছে কি না; অথবা,—স্বেটোর মত—আত্মহত্যাই জীবনযাত্রার যুক্তিযুক্ত পথ কি না। এই প্রশ্নের মূলে আছে তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস যে জীবনাস্তিত্বের মূলাসমূহের অদৃষ্টপূর্ব সংকটের প্রধান কারণ হচ্ছে আধুনিক জগতের আত্মবিনাশী পরিবেশ। অন্যান্য আধুনিক চিন্তাশীল সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের ভাবধারার পটভূমিকায় আত্মহত্যা ও মৃত্যু সম্বন্ধে কাম্যু-র এই বিশ্বাসকে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই যে সমসাময়িক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির একটি বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে আত্মহত্যা। বর্তমানযুগের যে সমস্ত বিশিষ্ট লেখক, কবি, দার্শনিক ও শিল্পীর দল স্বেচ্ছায় আত্মবিনাশ বা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন (যেমন, মায়কোভস্কি, ইসেনিন, আর্ণেস্ট টলার, ভার্জিনিয়া উলফ, সিলভিয়া প্লাথ, কুর্ট টুচলস্কি, ম্যাথিসন

লা রোশেল ইত্যাদির)—তাঁদের মৃত্যু সমূহের যাথার্থ্যের ও কারণের বিভিন্নতা সত্ত্বেও প্রতিটি আত্মহত্যার মাঝে আমরা দেখতে পাই আধুনিক মানুষের সাধারণ লক্ষ্যশূন্যতা, অবসাদ, ক্লান্তি, ঘৃণা, বিরক্তি উৎকণ্ঠা, যন্ত্রণা, আক্ষেপ ও সর্বগ্রাসী মৈরাশ্য।৯

প্রায় দুশো বছরের অনুপস্থিতির পর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে Nietzsche-এর 'death of God'৭ এবং অন্যান্য দার্শনিক, রাজনৈতিক ও নেতিবাচক বুদ্ধিবাদ এবং অস্বীকারগত সন্দেহবাদের সাথে সাথে পাশ্চাত্য সাহিত্যে একটি অত্যাবশ্যক মূলপ্রসঙ্গ হিসাবে আত্মহত্যার আবির্ভাব খুবই সুস্পষ্ট (যেমন—Dostoevsky-এর The Devils উপন্যাসের Stavrogin ও Kirilov, এবং Howthorne এর The Blithdale Romance এর Zenobia)। কনরাড্ থেকে কাম্ পর্যন্ত বিংশশতাব্দীর বিখ্যাত রোমহর্ষের মাধ্যমে আধুনিক মানুষের অর্থবোধক অভিব্যক্তি বিশেষভাবে বর্তমান (যেমন—কনরাড-এর Nostromo, The Secret Agent, Victory ; ফকনার-এর The Sound and The Fury, The Bear ; গ্রেহাম গ্রীন-এর The Heart of the Matter, The Potting Shed, The Living Room ; ইগনাৎসিও সিলোনে-এর Fontamara, Bread and wine, A Handful of Blackberries, The Seed Beneath the Snow, The Secret of Luca ; আলবেয়ুতো মোরাভিয়া-এর The Woman of Rome ; কাম্-র The Plague, The Fall, Cross purposes)। আত্মবিনাশ, আত্মহত্যা ও মৃত্যু পরিব্যাপ্ত এই মূলর অনুভূতি আধুনিক যুগকে যে অসাধারণ আকার দান করেছে তাকে পরিহার ক'রে যথার্থ সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াস অসম্ভব। কিন্তু, শেষ বিশ্লেষণে, কাম্ ইত্যাদির লেখায় মৃত্যুর প্রতি যে পক্ষপাতিত্ব দেখতে পাওয়া যায়, প্রকৃতপক্ষে তা তাদের জীবনের প্রতি পক্ষপাতিত্বেরই অন্য এক রূপ—কারণ, মালরো-এর পার্কেম-এর (The Royal Way) মত তাঁরা "মৃত্যু সম্বন্ধে চিন্তা করেন—মরবার জন্য নয়, বাঁচবার জন্য"। এবং জীবনের প্রতি এই পক্ষপাতিত্বের জন্যই হেনরি জেমস্-এর "the poet cannot be concerned with act of dying" (preface to the Wings of the Dove)-এর প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই Le

Myth-এ, যখন আত্মহত্যা সম্বন্ধে দুরাশি পাতা আলোচনা করার পর কাম্যু লেখেন—"Outside of that single fatality of death, everything, joy or happiness, is liberty. A world remains of which man is the sole master." (The Myth, p. 95) অথবা, W. Frank-এর ভাষায়—"Thus Camus transformed what had been an invitation to death into a sense of life—and categorically rejected suicide."—(Life in the Face of Absurdity, New Republic 133, 1955, pp. 19.)

• • • •

Le Myth de Sisyphe হচ্ছে অস্তিত্বের আস্বাদে মনুষ্যবুদ্ধির একটি সংবেদনশীল দাওা। দৈহিক উল্লাস ও মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবীতা—এ দুয়ের মুখোমুখি সংঘাতের পরিণাম হল অসংগতিবোধ। এই বোধের অসংগত প্রকৃতি যে অনন্তব অবস্থার জন্ম দেয় তার প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপের সংগে সংগে যে বেদনাময় সংকটের সৃষ্টি হয়, তার সমাধান কোন বিশেষ জ্ঞান বা পদ্ধতির দ্বারা সম্ভব নয়; কারণ অস্তিত্ব, প্রকৃতি ও অতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে কোনও প্রকার প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে এই অসংগতিবোধ।

"It happens that the stage-sets collapse. Rising, tram, four hours of work, meal, sleep and Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday, according to the same rhythm—this path is easily followed most of the time. But one day the 'why' arises and everything begins in that weariness tinged with amazement."—(The Myth pp. 18).

দৈনন্দিন জীবনের যান্ত্রিকতার প্রতি অকস্মাৎ নূতনভাবে দৃষ্টিপাতের পর অস্তিত্বের অর্থহীনতার উপলব্ধি দ্বারা জীবন-জিজ্ঞাসার সাথে সাথে যে চেতনার উদ্ভব হয়, তা অসংগতিবোধের এক দিক। এবং এর অন্যদিক হচ্ছে সময়ের আক্রমণ সম্বন্ধে ঔদাসিন্য সংজ্ঞা এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ: "We live on the future 'to-morrow', 'later on', 'when you have made your way', 'you will understand when you are old enough'. Such irrelevancies are wonderful, for, after all, it's a matter of dying. Yet a day comes when a man notices or says that he is thirty.....He belongs to time and, by the horror that seizes

him, he recognizes his worst enemy. To-morrow, he was longing for to-morrow, whereas everything in him ought to reject it. That revolt of the flesh is the absurd."—(The Myth. pp. 18). অসংগতিবোধের বিভিন্ন রূপ পূর্ণতা লাভ করে মৃত্যু সম্বন্ধে সচেতনতায় : "No code of ethics and no effort are justifiable *a priori* in the face of the cruel mathematics that command our condition".*—(The Myth. pp. 20).

এইরূপে অসংগতির বিভিন্ন প্রকাশের সাথে পরিচয় স্থাপনের পর এই অসহ্য অবস্থার বেড়াজাল থেকে কি ক'রে মুক্তিলাভ করা যায়, তার আলোচনায় কাম্যু দুটি পথের নির্দেশ দেন : আত্মহত্যা ও ঈশ্বর-বিশ্বাস (leap of faith)। কিন্তু এ সম্বন্ধে যুক্তিযুক্তভাবে বিস্তারিত বিশ্লেষণের পর তিনি এ দুইটি আপাত সমাধানকেই সমানভাবে বর্জন করেন। আত্মহত্যার বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তি : মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মানুষ জানে যে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এবং জীবন সম্বন্ধে তার জ্ঞান শুধুমাত্র এইটুকুই। সুতরাং মানুষ জীবন-আখ্যায় চিন্তা করতে পারে, কেন না মৃত্যুর অর্থ তার বোধগম্য নয়; অতএব, মৃত্যু যদি অর্থহীন হয়, তাহলে আত্মহত্যার একমাত্র অর্থ এই যে পরোক্ষভাবে মৃত্যুর অর্থকে স্বীকার করা।—আপাতদৃষ্টিতে এই সরলযুক্তির ক্রম-বিশ্লেষণ এর জটিলতার নির্দেশ দেয়। আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অর্থ সারা জীবনের দৈনন্দিন অভ্যাসগুলিকে স্থির করার জন্য মনস্থির করা। প্রাত্যহিক জীবনের পুনরুক্তি ও যান্ত্রিক আকারের অসহনীয়তা এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ব্যক্তি ও তার দৈনিক অস্তিত্বের মাঝে সৃষ্টি করে এক বিচ্ছেদ, যার অন্য নাম অসংগতি। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে হয়ত মনে হ'তে পারে, আত্মহত্যা ও অসংগতি একই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ দুটি পরস্পর সম্বন্ধহীন; কারণ অসংগতি স্বীকারের সাথে আত্মহত্যা জড়িত থাকলেও এর স্বাভাবিক পরিণাম আত্মহত্যা নয়। হয়ত প্রশ্ন উঠতে পারে যে অস্তিত্বের অর্থহীনতা ও আত্মহত্যার ফলাফল সম্বন্ধে প্রচুর আলোচনা করার পর

* একটি পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

সোপেনহাওয়ার-এর, যুক্তিবিদ্যা অনুযায়ী, আত্মহত্যা করা উচিত ছিল কি না। এর উত্তরে কাম্যু বলেন যে যৌক্তিক চিন্তা ও যৌক্তিক কর্ম এক নয়। সোপেনহাওয়ার-এর ক্ষেত্রে শারীরিক আত্মহত্যার প্রশ্ন অবান্তর, তবে তাঁর দার্শনিক আত্মহত্যা (Philosophical Suicide) বা ঈশ্বর-বিশ্বাস সম্বন্ধে প্রশ্ন করার অধিকার আমাদের আছে।

দার্শনিক আত্মহত্যা বা ধর্ম-বিশ্বাস দ্বারা বিশ্বের অসংগতিকে স্বীকার ক'রে এক অযুক্তিসিদ্ধ বোধগম্যতার আশ্রয় গ্রহণ সম্ভব। এই আত্মহত্যা আমরা দেখতে পাই Tertullian, Blaise Pascal, Soren Kierkegaard, Leo Chestov, Edmund Husserl, Karl Jaspers, Martin Heidegger, Max Scheler, Gabriel Marcel—ইত্যাদির ক্ষেত্রে। যুক্তি দ্বারা জীবনজিজ্ঞাসার যথাযথ উত্তরদানে অসমর্থ হয়ে এঁরা ধর্ম বা অযুক্তিবাদকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। কার্ল ইয়াস্‌পার্স-এর ধর্মীয় সমালোচনায় কাম্যু যে ভাবকে খণ্ডন করেন, তার আধিবিদ্যক পরিণতিকেই তিনি Philosophical Suicide বলে অভিহিত করেন। অতিন্দ্র সম্বন্ধীয় শাব্দিক জ্ঞানার্জনের সম্ভবহীনতা একটি তুরীয় জ্ঞানের সম্ভবতা ও তার অস্তিত্বের প্রমাণ দেয় যে জ্ঞান সকল সম্ভবপর ব্যাখ্যার বহির্ভূত—("The manifesting of transcendence is bound to its appearance in empirical being (Dasein), in which being itself remains torn asunder.....Dasein itself is not authentic existence or being as such, and yet it is only in reference to the sphere of Dasein that being itself achieves reality for us and that existence can exercise its freedom. But the empirical context prevents any adequate manifestation of being and any successful project of transcendence, until one is reconciled to the situation."—Karl Jaspers, Philosophy, vol. 1, pp. 42).

ইয়াস্‌পার্স-এর এই দার্শনিক প্রত্যয়ের পর্যবেক্ষণে কাম্যু বলেন যে, একটি তুরীয় জ্ঞান ও অস্তিত্বের অর্থপূর্ণ আকৃতিকে স্বীকার করার অভিলাষে ইয়াস্‌পার্স যেন্দায় এক রূপান্তর-পদ্ধতির প্রতি আবেদন জানিয়েছেন যা, তাঁর নিজ স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, সকল সম্ভবপর ব্যাখ্যার বহির্ভূত। হুসেল-এর "অভিপ্রেত চেতনা" (intention in perception)র প্রত্যয় বিশ্লেষণে

কাম্ অন্যান্য প্রপঞ্চবাদীদের (phenomenologists) উল্লেখে বলেন যে যদিও এঁরা খ্রীষ্টীয় অস্তিত্ববাদীদের১০ (Christian existentialists) মত বিশ্বাসরাজ্যে প্রবেশ করতে অনিচ্ছুক, তা সত্ত্বেও অসংগতির মুখোমুখি দাঁড়ানোর প্রশ্নকে তাঁরা পরোক্ষভাবে পরিহার করেছেন ; কারণ হুসেল-এর—"চিন্তার শেষ ব্যাখ্যা নয়, শুধুমাত্র বিবরণ"—এই মতাবলম্বনে তাঁরা এ ধারণার অবতারণা করেন যে অস্তিত্বাধিব অস্তিত্বের অসীমতা একটি অসীম বস্তুগত ও তার অস্তিত্বের যথাযথ তাৎপর্য প্রদানে সক্ষম। কির্কেগার্ড্ ও চেস্টভ্-এর আস্তিক্যবাদী প্রকল্পের পরিবর্তে এই বিমূর্ত বহুবিশ্বাসবাদ এক পরমযুক্তির সিদ্ধান্তে প্রবেশ করেছে (কাম্র মতে কির্কেগার্ড্ ও চেস্টভ্ অসংগতির লোহবেষ্টনী থেকে মুক্তির আশায় এক ভিত্তিহীন, অনুমানাত্মক ও অলৌকিক বিশ্বাসরাজ্যে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছেন) ; ফলে, একটি নিশ্চিত সমাধানে উপনীত হওয়ার ইচ্ছায় বিরোধিত পদ্ধতির প্রতি যথোচিত বিবেচনাকে অস্বীকার করায় হুসেল ও অন্যান্য প্রপঞ্চবাদীরা কির্কেগার্ড্ ও চেস্টভ্-এর মতই অপরাধী ; কারণ এই ক্ষেত্রে পরমযুক্তি হচ্ছে এক প্রকারের অযুক্তিবাদ। সুতরাং যে যুক্তি তাঁদের মনে সর্বপ্রথম অসংগতিবোধের জন্ম দেয়, সেই যুক্তিকে হুসেল তাঁর বিমূর্ত দর্শনে এবং কির্কেগার্ড্ ও চেস্টভ্ তাঁদের ধর্মদর্শনে পরোক্ষভাবে অবহেলা করেছেন। এই কারণে কাম্ তাঁদের দর্শনকে গ্রহণ করতে নারাজ, কেননা যে বোধশক্তি তাঁর মনে সর্বপ্রথম এই চেতনা সঞ্চার করে, একমাত্র সেই শক্তি দ্বারাই তিনি এই সমস্যা সমাধানে প্রস্তুত।১১

L'Homme Revolte (the Rebel)১ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে কাম্ শারীরিক আত্মহত্যার বিরুদ্ধে আরও দুটি যুক্তির অবতারণা করেন। প্রথমতঃ, কেবলমাত্র অসংগতিবোধের প্রথম প্রস্তাবকে অবজ্ঞা করেই শারীরিক আত্মহত্যাকে সমর্থন করা সম্ভব ; কারণ বিশ্বের নিশ্চিত অসংগতির ফলে বস্তু ও প্রাণীজগতে নিজেকে চিরবিদেশী হিসাবে গণ্য করার পর ব্যক্তিবিশেষের আত্মহত্যা সম্পাদনের অন্তর্নিহিত অর্থ শুধু এই যে, অস্তিত্বের অর্থহীনতাকে কোন বিশেষ অর্থ প্রদানের প্রচেষ্টা দ্বারা অসংগতিবোধের সম্যক প্রকৃতিকে অবহেলা করা, যে প্রকৃতি এই বেদিতার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। সুতরাং সমস্ত অসংগতির সীমাবদ্ধ প্রকরণে আত্মহত্যা সম্ভবপর হ'লেও এ দুয়ের

মধ্যে যে যৌক্তিক সংযোজনা বর্তমান তার অংশ অবশ্যম্ভাবী, কারণ আত্মহত্যার সপক্ষে যে যুক্তি তা এর বিপক্ষের যুক্তির মতই পরিষেব। দ্বিতীয়তঃ, আত্মহত্যা এক সার্বিক অত্যন্তভাব নয়। 'জীবন অসংগত'—এই ধারণার মত আত্মহত্যাও কোন বিশেষ মূল্যের ইংগিত দেয়। সদাক অত্যন্তাভাবের বাহ্যাকারের অন্তর্নিবিষ্ট এই মূল্য সীমাবদ্ধ ও সদর্থক। অথচ এই মূল্যকে সদর্থকভাবে অসংগতির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা অসম্ভব, কারণ আত্মহত্যা 'সমগ্র অসংগতি'কে স্বীকার করে না।

এইভাবে শারীরিক ও দার্শনিক আত্মহত্যা প্রত্যাখ্যানে যুক্তি ও বস্তুজগতের সত্যতা সংরক্ষণের পর কাম্যু এর চরিত্রগত দ্বন্দ্ব ও অসঙ্গতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁর মতে, অসংগতির পূর্ণ চেতনা ও তার অন্তর্নিহিত সত্যতা সংরক্ষণের সাথে সাথে মানবাবস্থার কঠোর বাস্তবতা হতে পলায়নের সমস্ত পথ স্বাভাবিকভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অসংগতির চিরন্তন ঘূর্ণাবর্তে আমরা প্রবেশ করতে বাধ্য। শারীরিক ও দার্শনিক আত্মহত্যার পথ অনুসরণে অসম্মত হওয়ায় কাম্যু এই দৃষ্টিভংগীকে অসঙ্গতি বা অস্বীকারগত বিদ্রোহ বলে অভিহিত করেন। এই বিদ্রোহের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে তিনি এর দুটি গুণের সন্ধান দেন যার উপর অসংগতির নীতি রচনা সম্ভব। সে দুটি হচ্ছে: স্বচ্ছতা (lucidity) ও সরলতা (innocence)। শিল্পী ও নীতিবিদ হিসাবে কাম্যুর জীবনে স্বচ্ছতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানবের দাবী ও অসংগতির চেতনা সংরক্ষায় একটি অপরিবর্তনীয় মনোভাব হিসাবে স্বচ্ছতার সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন। কেননা, অসংগতিবোধের সহজাত বৈশিষ্ট্য এইরূপ যে একমাত্র ব্যক্তিবিশেষের স্বচ্ছ দৃষ্টিভংগীই মানবীয় চৈতন্যের দ্বার উন্মুক্ত করতে সক্ষম। সুতরাং অসংগত চরিত্রের (l'Homme absurde, the absurd man) প্রধান গুণ হিসাবে স্বচ্ছতা ব্যক্তিগত আচরণের আদর্শ রূপদানে বাধ্য। অসংগতির অপর অংশ হচ্ছে স্বচ্ছতা, এবং স্বচ্ছতার অপর অংশ সরলতা—এই দুই প্রত্যয় বিশ্লেষণের পর কাম্যুর যুক্তির পরবর্তী ধারা: অভিজ্ঞতার অর্থ ও অস্তিত্বের নিমূর্ত সত্যানুসন্ধানে ধারণাশক্তির সামর্থ্যকে অস্বীকার করায় স্বচ্ছতাকে একটি নেতিবাচক চেতনা বলে অভিহিত করা যেতে পারে। সুতরাং এই দার্শনিক অর্থে স্বচ্ছতা যে জগতের সন্ধান দেয়

সেখানে ঘৃণীয় জ্ঞান বা পরম সত্যের কোন স্থান নেই। এই অসংগত অবস্থার সাথেই সরলতা, এবং স্বচ্ছতা দ্বারা এই অবস্থার তাৎপর্য উপলব্ধির সংগে সংগে এর উদ্ভব অধিবার্য। স্বচ্ছতা ও সরলতার চারিত্রিক অত্যাবশ্যক অস্তিত্বের যোগসাধ্যতা ও পরমসত্যের প্রক্রিয়াকে প্রত্যক্ষভাবে পরিহারের সংগ্রামে যে আধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম দেয় তার নৈতিক পরিনাম হ'ল চির-বিদ্রোহ (perpetual revolt), যা অতিরিক্ত-বিশ্বাস বা অনুরূপ সাস্ত্বনাদায়ক পদ্ধতিকে উদ্ধতভাবে উপেক্ষা করে। এই বিদ্রোহের নীতি : স্বাধীনতা (freedom) ও পরিব্যাপ্তি (intensity)। স্বাধীনতা প্রসঙ্গে কাম্ বিমূর্ততা পরিহারে খুবই উৎসুক। অসংগতির বিশ্বে (বিশ্বের অসংগতি নয়) স্বাধীনতাকে এক আধিবিদ্যক সত্তা হিসাবে গ্রহণ করার প্রশ্ন অবান্তর, তার কারণ—মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবীতা ও পরম সত্যের অনুপস্থিতি। চিরন্তন স্বাধীনতা (সম্ভবত মৃত্যুর পরবর্তী অধ্যায়ে) যা মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবীতাকে অবহেলা করতে সক্ষম, তার আশা অর্থহীন। তবে জীবন-পরিধির অভ্যন্তরে এক সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা (limited freedom) অর্জন সম্ভবপর। দৈনন্দিন জীবনের যে গতানুগতিক ও সীমাবদ্ধ আকার ব্যক্তিবিশেষের অসংগত অস্তিত্বতার জন্য দায়ী, সেই আকারের সাথে প্রত্যক্ষ পরিচয়ই সুতীক্ষ্ণ চেতনার মাধ্যমে এই সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করে। অন্যান্যত্রে, জীবনের কর্মধারার যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তির যন্ত্রণা, মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবীতা ও জীবনের অপ্রতিহত ধারাবাহিকতার কামনা যে ট্র্যাজেডির জন্ম দেয় তার মূঢ় বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের একমাত্র পথ হচ্ছে এই অসংগতিপূর্ণ অবস্থার অবজ্ঞাসূচক স্বীকৃতি, কারণ কাম্র মতে—"There is no fate that cannot be surmounted by scorn."—(The Myth, pp. 98)। এই স্বীকৃতি যে সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা ঘোষণা করে তা ইডিপাস্-এর "I conclude that all is well"-এর মতই বিজয়-সূচক (tragic বা absurd victory)।১২

মৃত্যুর চিরউপস্থিতি ও পরমমূল্যের অনুপস্থিতি—এই দুই ঘটনার সাথে সরলতা ও স্বাধীনতার সংযোগ জীবনে যে অনুভূতির প্রাবল্য সৃষ্টি করে তা 'মহৎ জীবন' (noble life)-এর পরিবর্তে 'পূর্ণ জীবন'-এর (full life) আদর্শে অনুপ্রাণিত। অসংগত চরিত্রের এই পরিব্যাপ্তি—কাম্ যাকে

la passion বলে উল্লেখ করেছেন—তা মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবীতা ও ঐশ্বরিক দায়িত্বহীনতার প্রতি পূর্ণভাবে দৃষ্টিপাতের পর এক আশাহীন, ভবিষ্যহীন, বিভ্রমহীন অস্তিত্বে প্রবেশ করে, যেখানে সমস্ত কর্মই বিধিসংগত (everything is lawful),১৩ কারণ, ঈশ্বরের অস্তিত্বহীনতা ও মানুষের নশ্বরতা। সুতরাং যেখানে সবই কিছুই বিধিসংগত সেখানে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার গুণীয় পার্থক্যের তুলনামূলক বিচার অবান্তর। অতএব যুক্তিযুক্তভাবে অভিজ্ঞতার মাত্রাবৃদ্ধিই একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত। কিন্তু এই মাত্রিক নীতি (quantitative ethic) অভিজ্ঞতার গুণীয় বিশেষত্বকে অবহেলা করতে সক্ষম নয়, কারণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাথে নৈতিক মূল্যরাশির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বর্তমান। ব্যাপক অভিজ্ঞতার বিস্তীর্ণ প্রসারণ মনুষ্য আচরণের বিমূর্ত পরিকল্পের ব্যবহারিক প্রয়োগের উপর প্রভাব বিস্তার করায়, জীবনের সাধারণ নৈতিক সংহিতার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অভিজ্ঞতার বিস্তৃতি ও প্রাচুর্যের উপর নির্ভরশীল; এবং এইজন্যেই স্থান ও কাল অনুযায়ী নীতি পদ্ধতির নিরন্তর পরিবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ, প্রাতিস্বিক অভিজ্ঞতাসমষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক নৈতিকতা এক অংগহীন বিমূর্তনের পরিবর্তে একটি নিশ্চিত ও স্পর্শনীয় বাস্তবতায় রূপান্তরিত হয়, এবং এই কারণেই মাত্রাবোধের সাথে প্রয়োগীয় নৈতিকতার সাক্ষাৎ সংযোগ বর্তমান।

স্বচ্ছতার আবশ্যকতা, সরলতা সংঘটনা, স্বাধীনতার সম্ভাবনা ও পরিমাত্রার সংকল্প—এই সংমিশ্রনে উদ্ভূত বিদ্রোহ-নীতি অসংগতিবোধের অনুকূল হওয়ায় আত্মহত্যার আহ্বান হিসাবে যে অত্যন্তাভাবী যুক্তির অবতারণা তার সমর্থক রূপান্তর পূর্ণতা লাভ করে এর শেষ পরিণামে, যেখানে এই যুক্তি আত্মহত্যার পরিবর্তে এক প্রবল ভাবাবেগময় জীবন-অনুজ্ঞার নির্দেশ দেয়।১৪ এই নীতির ব্যবহারিক প্রয়োগ বুদ্ধি ও সাহসের উপর দাবী জানায়, কেননা আধ্যাত্মিক সান্ত্বনার আশা ও সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগের জন্য সাহসের আবশ্যক, এবং সান্ত, বিভ্রমহীন ও আশাহীন জীবনের নির্দেশক হিসাবে বুদ্ধির প্রয়োজন। কিন্তু, সাহস, বুদ্ধি, স্বাধীনতা ও পরিমাত্রা মৃত্যু ও কালোত্তীর্ণ হ'তে অক্ষম, কারণ কোনও প্রকার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সংকেত প্রদর্শনে এরা অসমর্থ। অর্থাৎ, যে অত্যন্তাভাব (negation) থেকে অসংগতি-

বোধের উৎপত্তি, স্বচ্ছতা, তরলতা, স্বাধীনতা ও পরিমাত্রা তারই নিয়মাধীন ; সুতরাং এই বিদ্রোহনীতির তাৎপর্য মুক্তি নয়, অসংগতির অপরিবর্তনশীলতার অবজ্ঞাসূচক স্বীকৃতি।

ভাব-অভাবের অনুশীলনহীন এই পরিবেশে সামগ্রিক মনুষ্যকর্মের নৈতিক সমভাব যে পাপপুণ্যহীন বিদ্রোহনীতির নির্দেশ দেয়, তা মনুষ্যবিরোধী নয়—নিয়তি, কাল ও মৃত্যুবিরোধী। এই বিদ্রোহ পরিহারের অর্থ সমুদয় মনুষ্যত্বের একটি নির্বিশেষ অংশকে পরিত্যাগ করা—যে অংশ পরিবর্জনে সমগ্র মনুষ্যজগৎ চির-প্রলোভিত, কারণ পারলৌকিক জগৎ সম্বন্ধে মানুষের আবেশিক রোমন্থন এবং তার সম্পূর্ণ বোধগম্যতার চির আবশ্যকতা। অন্ত ও বোধ—মানুষের চিরন্তন এই স্বপ্ন দুটিতে আস্থা হারিয়ে এ নীতি সমরতার সীমাবদ্ধ প্রকরণে অশেষ সম্ভাবনা, অফুরন্ত উল্লাস ও অভিজ্ঞতার বাস্তবতা দ্বারা প্রমুগ্ধ জীবনের প্রতি অসংকুচিত ও দ্বিধাহীন বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত।১৫

স্বচ্ছ চেতনাই এই নীতির প্রধান উপাদান। পরিমাত্রা ও স্বচ্ছতার সমন্বয়ে যে নীতিবোধের উদ্ভব তার উদাহরণ হিসাবে কাম্ চারটি চরিত্রের অবতারণা করেন : ডন্ হুয়ান (Don Juan), অভিনেতা, (the actor), বিজয়ী (the Conqueror), সৃজনশীল শিল্পী (the creative artist)। যান্ত্রিক নীতিবোধের সীমাবদ্ধতার এই চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা জীবনকে অনবচ্ছিন্ন বর্তমান মুহূর্তরাশির একটি আনুক্রমিক সংগ্রহ হিসাবে গ্রহণ করে প্রত্যেক মুহূর্তের অভিজ্ঞতাকে চরমতম পরিমাত্রা দ্বারা উপলব্ধির চেষ্টা করে ; অর্থাৎ অভিজ্ঞতার পরিণামের পরিবর্তে শুধুমাত্র অভিজ্ঞাই তাদের লক্ষ্য। অথবা সুপ্রসিদ্ধ লেখক W. Pater-এর কথায় : "...our one chance lies.....in getting as many pulsations as possible into the given time."—(The Renaissance. Macmillan. London. 1922. pp. 238.)

Eibter | Or দর্শনগ্রন্থের 'Sensual Genius Qualified As Seduction' নামক অধ্যায়ে কির্কেগার্ড্ যান্ত্রিক নীতির জলন্ত নিদর্শন হিসাবে Don Juan এর চরিত্র বিশ্লেষণে তাঁকে Sensually demonine বলে উল্লেখ করেন—

"His love is not psychical but sensual, and sensual love according to his conception, is not faithful, but absolutely faithless; he loves not one but all.....he exists only in the moment, but the moment is in its conception considered the sum of the moments."—(Soren Kierkegaard, Either/Or (A Fragment of Life), vol. I, pp. 76, (trans. David F. Swenden & Lillian M. Swenden), Princeton, 1944.

এই মাত্রিকমীতির চিন্তাকর্ষক প্রতিনিধি হিসাবে ডন্ হুয়ান অসাধারণ আধ্যাত্মিক প্রেমের পরিবর্তে সাধারণ ইন্দ্রিয়জনিত প্রেমের মাধ্যমে অসংখ্য অভিজ্ঞতার মাঝে সামুদ্র সন্ধানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কামুর ডন্ হুয়ান মনুষ্যপ্রেমের অশেষ সম্ভাবনাকে পূর্ণ রূপদানের অভিপ্রায়ে একই কর্মের পুনরাবৃত্তির সীমিত প্রকরণে অপরিমেয় জীবনতৃষ্ণার পূর্ণ প্রশমনের আশাহীন প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত। এই আশাহীনতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতনতা সত্ত্বেও আদর্শ মনুষ্য প্রেমানুসন্ধানে তার মাত্রিক প্রয়াস অসংগতির যে তীব্র ট্রাজেডিকে মূর্ত করেছে, সেখানে অনুতাপ ও সান্ত্বনা সমভাবেই নিরর্থক; এবং এই কারণেই কামুর মতে ডন্ হুয়ান একটি tragic figure। Tragic figure সম্বন্ধে বিশিষ্ট নাট্যকার Arthur Miller-এর অভিমত এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—:

"The tragic figure must have certain innate powers which he uses to pass over the boundaries of the known social laws—the accepted mores of his people—in order to test and discover necessity. Such a quest implies that the individual who has moved onto that course must be somehow recognised by the laws, by the mores, by the powers that design.....as having the worth, the innate value of a whole people asking a basic question and demanding its answer."—Arthur Miller, On Social Plays (A View from the Bridge). Viking Press, New York, 1955, pp. 15.)

পৃথিবীর সাহিত্যে ও নাট্যমঞ্চে দুঃখবাদী জীবনদর্শনের প্রতীক হিসাবে অভিনেতার পুনঃপুন আবির্ভাব খুবই সাধারণ সংঘটন। কিন্তু কামুর অভিনেতা দুঃখবাদের পরিবর্তে অসংগতিবোধের প্রতীক। অভিনেতা বিভিন্ন ভূমিকায় ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ হ'য়ে নিজের প্রকৃত সত্তার ক্ষণিক অবলুপ্তিতে রঙ্গমঞ্চের

উপর প্রতিটি চরিত্রের পূর্ণ বাস্তবতা সামগ্রিকভাবে পরিস্ফুট ক'রে তোলার চেষ্টা করে, যদিও এই কৃত্রিম জীবনের ক্ষণস্থায়ীত্ব সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ সচেতন। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে অসংখ্য চরিত্রানুকরণের কৃত্রিমতা এবং নিজস্ব জীবনধারার অকৃত্রিমতা—অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এ দুয়ের সমান তাৎপর্য। নিজ দেহের একত্ব এবং রঙ্গমঞ্চে বহু চরিত্র অনুকরণের বহুত্ব—এ দুয়ের আপাত দ্বন্দ্বে অভিনেতা হিসাবে সে এক ও বহুর মাঝে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করে; কারণ অসংগত মনের অভিলাষের বহুত্ব (যেমন এক অমর জীবন কামনা ও বর্তমান কালের শেষহীন বিস্তৃতির বাসনা যার পরিপূর্ণতা শুধুমাত্র মানসিক উপাদান দ্বারা সম্ভব নয়) এবং তার দেহের একত্ব—যান্ত্রিক নীতির বুদ্ধিহীন চেতনা দ্বারা এই সংঘাতের সাময়িক সমাধান একমাত্র শারীরিক মাধ্যমেই সম্ভব।

Malraux-এর বিজয়ীদের (Les Conquerants) মত কামুর বিজয়ী হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে আধিবিষয়ক নিঃসঙ্গতার (metaphysical loneliness) অসহনীয় যন্ত্রণা থেকে এবং অস্তিত্বের বন্দীশালা থেকে মুক্তিপথ অন্বেষণে চির প্রয়াসী। এই অর্থে ডন্ হুয়ান ও অভিনেতার সংগে তার সাদৃশ্য বিদ্যমান, কারণ তারা দুজনেই এই স্বাধীনতা অনুসন্ধানী—ডন্ হুয়ান বিভিন্ন নারীর বাহুবন্ধনে এবং অভিনেতা বিভিন্ন চরিত্র-ভূমিকায়। বুদ্ধি ও চেতনা দ্বারা মনুষ্যাবস্থার অমমনীয় বন্ধন থেকে মুক্তি প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিরূপে বিজয়ী যদি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যক্ষ কর্মধারার মাধ্যমে নিজস্ব অবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা না করে, তাহলে সে পরোক্ষভাবে মানুষের সামগ্রিক অবস্থার বিপক্ষে আধিবিষয়ক বিদ্রোহ (metaphysical revolt) করতে বাধ্য, কারণ অমরত্বের প্রমাণহীন প্রকল্পের বিপরীতে ইতিহাসের বহুত্ব-অভিজ্ঞতাপূর্ণ নিশ্চয়তাই তার নির্বাচিত ক্ষেত্র : "Between history and the eternal I have chosen history because I like certainties. Of it at least I am certain, and how can I deny this force crushing me?" —(The Myth, pp. 71-72)

এই উক্তি পরিষ্কারভাবে বিজয়ীর অসংগতিবোধকে ব্যক্ত করে, কারণ যন্ত্রযুগের আবির্ভাবের সংগে সংগে শাশ্বত, গভীর পরমমূল্য ও বিশ্বাসের অন্তর্ধানে যে দুশ্চিন্তার উদ্ভব১৬ সে তারই প্রতিনিধি। আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ও পরমমূল্যের সামগ্রিক অবলুপ্তির ফলে সে ঐতিহাসিক নিবন্ধে জীবনার্থ অনুসন্ধানে ব্যর্থ

মৃত্যুভয়, হিংসা ও বর্বরতার বিধ্বংসক আবহাওয়া ও সামগ্রিক বিশ্বাসহীনতার পরিপ্রেক্ষিতে বিজয়ীর আদিবিদ্রোহের তাৎপর্য বিচার করা উচিত, কারণ স্বচ্ছতা দ্বারা এই সুগভীর সংকট বিশ্লেষণের পর সে পরিমাত্রা দ্বারা এর দৃঢ় বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের আশা রাখে। এ ক্ষেত্রে যান্ত্রিক রীতি স্পষ্টরূপে বর্তমান : যে স্বচ্ছতা ব্যক্তিবিশেষকে শৃংখলাবদ্ধ করে, সেই স্বচ্ছতা হতে জন্মপ্রাপ্ত যান্ত্রিক রীতির পরিমাত্রিক প্রয়োগই আবার তাকে মুক্তির সন্ধান দেয় ; তার মৃত্যু অনিবার্য, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে সে ক্রমবৃদ্ধিশীল চেতনা-লাভে ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়নে সক্ষম। এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, কামু যে তাৎপর্যে 'বিজয়ী' শব্দটী ব্যবহার করেছেন তার সঙ্গে এর সাধারণ সামগ্রিক অর্থের কোন সংযোগ নেই। মালরো-এর 'স্বচ্ছ' (lucid) বিজয়ীর "action in itself is useless"-এর মত কামুর বিজয়ী জানে যে—"There is but one useful action, that of remaking man and the earth."—[The Myth, p. 72] এর মূল যে বিদ্রোহের পরিচয় তা ঘোষিত হয়েছে সমগ্র অস্তিত্বের বিরুদ্ধে—যে অস্তিত্ব মানুষের আদর্শ ও কামনার ধ্বংস সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যেহেতু এই বিদ্রোহের কর্মপদ্ধতি কোন বিশেষ সমস্যা সমাধানে উদ্বুদ্ধ নয়, যেহেতু এর দ্বারা নির্দেশ দেয় শুধু প্রতিবাদ ঘোষণের অনন্ত সংকল্প (Dostoevsky-এর Ivan Karamazov-এর আদিবিদ্রোহ এবং তার প্রতিবাদ ঘোষণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার কামু তাঁর L' Homme Revolte গ্রন্থের The Rejection of Salvation নামক অধ্যায়ে লেখেন—"The question which Ivan finally poses, the question which constitutes the real progress achieved by Dostoievski in the history of rebellion, is the only one we are interested.....: can one live and hold one's ground in a permanent state of rebellion? Ivan allows us to guess his answer: one can only live in a permanent state of rebellion by pursuing it to the bitter end. What is the bitter end of metaphysical rebellion? Metaphysical revolution."—Camus, The Rebel, (trans. Anthony Bower) Hamish Hamilton, London, 1953, pp. 59.)

সুতরাং এর আংগিকের তাৎপর্য এর উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থেকে অনেক বেশী গভীর, কারণ চিরমিলনস্থিতি · মানবাদর্শের সহায়ক হিসাবে এই বিদ্রোহের

আপাত পরাজয় সুনিশ্চিত। কিন্তু এই পরাজয় সত্ত্বেও প্রমিথিয়ুস ও টান্টালুস-এর মত এক প্রত্যক্ষ প্রতিবাদের আপাতীয়তায় এবং তার আত্মোৎসর্গের সার্বর্থেই বিজয়ীর মহত্ত্ব বর্তমান। অসংগতির বিশ্বে মৃত্যু মনুষ্যাবস্থার শেষ পরিণতি এবং বিদ্রোহের শেষ ফলাফল এক অবশ্যম্ভাবী পরাজয়—এই জ্ঞানের পূর্ণ চেতনা যে স্বাধীনতার প্রধান উপাদান, সেই স্বাধীনতার সীমাবদ্ধ প্রকরণেই মানবিক ও পার্থিব মহিমার কণস্থায়ীত্ব; মনুষ্যাবস্থা সম্বন্ধে বিজয়ীর এই চেতনাই তার মহত্ত্ব, এবং তার ট্রাজেডি।

—"This tragedy is born of the conflict between two equally strong, equally valid antagonistic forces (as in Oedipus): man's passionate assertion of his freedom and the will to live, and the irreducible natural order to which he must submit."—(H. Mason. Camus and the Tragic Hero. Scrutiny 45. pp. 84.)

প্রাচীন গ্রীসের অভিকথার পটভূমিকায় এই ট্রাজেডির রূপ নির্ণয়ে হয়ত আমরা স্মরণ করতে পারি মার্সিও প্রাজ্-এর কথা:

"The tragedy interprets with unusual boldness the myth of Prometheus—the necessity of crime which weighs upon the man who is intent on raising himself to the condition of a Titan; it confers a kind of savage and pathetic ardour both upon the reiterated efforts of single will to reach the universal, and upon the mad desire to break the shell of the individual and to feel oneself as the unique essence of the universe." —Mario Praz. The Romantic Agony. (trans. Angus Davidson) Collins, 1960, pp. 294.

কাম্যুর মতে অসংগত চরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হচ্ছে সৃজনশীল শিল্পী। শিল্পী জানে যে নিয়তির বিরুদ্ধে চরম প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ ঘোষণার পথ হচ্ছে বুদ্ধিহীন চেতনা সহকারে সজ্ঞানকল্প শিল্প-প্রচেষ্টা দ্বারা নিজস্ব জীবনের বৃত্তীয় পুনরাবিষ্কার। যুক্তি ও বুদ্ধি দ্বারা অসংগতির ব্যাখ্যা প্রদান অসম্ভব—এই সচেতনতার পার্থিব শিকড়, যা স্থূলীয় রূপ সংস্থানের সাধনা থেকে চিরবঞ্চিত, সেই শিকড়ই শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির মূল উৎস, কারণ কাম্যুর মতে শিল্পসৃষ্টি হচ্ছে কল্পনার মাধ্যমে অসংগতিবোধের রূপদান। শিল্পসৃষ্টি দ্বারা অসংগতি স্বীকারের শেষ পরিণাম হল' যৌক্তিক সন্ধান—প্রকৃতির পরিবর্তিত অস্বীকার

—কারণ বিশ্বজগতের যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদানে যৌক্তিকতার অসমর্থতা। পরিশেষে এই সন্ধানরীতির অস্বীকার দ্বারাই শিল্পীমন এক কল্পনাময় রূপান্তরের সম্ভাবনা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। কাম্যুর এই চিন্তা বিন্যাসের উপর বালজো-র প্রত্যক্ষ প্রভাবের রূপ আরও পরিষ্কারভাবে দেখা যায় যখন তিনি আবেগ ও উত্তেজনার চিত্রণাদিত শিল্পসৃষ্টির বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেন। অসংগতি স্বীকার ও যৌক্তিক সন্ধান পদ্ধতির পরিবর্তে অস্বীকার—শিল্পের প্রকৃতিগত এই দুই প্রত্যয়ের অন্তর্নিহিত মানসিক আবেগ ও উত্তেজনার রূপ হচ্ছে: বিশ্বের বৃত্তমান ধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ও মনন-প্রক্রিয়ার দ্বারা তার বৈকল্পিক প্রতিস্থাপন।

বিশ্বজগতের বাহ্যিক আকারের সাথে শিল্প প্রচেষ্টার যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়াসের মূলে আছে সহজাতভাবে শিল্পীর অসংগতি স্বীকার। কিন্তু এই বাহ্যজগৎ শিল্পীর বিশেষ কর্মক্ষেত্র হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবতার যৌক্তিক অস্বীকারের মাঝে এই যোগাযোগের অত্যাভাবী প্রকৃতি সুস্পষ্টরূপে বর্তমান। সুতরাং এই বাহ্যজগৎকে একমাত্র বাস্তবতা হিসাবে গ্রহণ করার শিল্পী নিজস্ব আদর্শ ও অভিলাষের নির্দেশ অনুযায়ী এই প্রত্যয়কে ত্যাগ করতে বাধ্য। এইরূপে স্বীকার ও অস্বীকারের যুগপৎ গ্রহণ-বর্জনের মাঝে আমরা দেখতে পাই Malraux-এর 'permanent accusation' এর প্রতিরূপ: বোধ ও ইন্দ্রিয় শিল্পের মূল উপাদান, কিন্তু এই স্বাভাবিক উপাদান বর্জনেই শিল্পের প্রকৃত প্রকাশ সম্ভব। মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবীতা ও অস্তিত্বের প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ যে জগতের স্বপক্ষে অভিপ্রায়ে চির সন্ধানরত, তার নিদান সাধনে অক্ষম; তবে নিজ আশা ও অভিলাষ অনুযায়ী শুধু প্রত্যয় ও আকারপূর্ণ (concept and form) কোন বিশ্বসৃষ্টি শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। শিল্পজগতের এক দুর্বোধ্য রহস্য এই যে মনুষ্যাবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিসরের সীমিত আবেষ্টনীতে বন্দী থেকেও মানুষ এক চিরমুক্ত জীবনের প্রতিরূপ সৃষ্টিতে কোনদিনও অসমর্থ হয় নি—যে জীবন সম্পর্কে কোনরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন তার পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং কাম্যুর মতে শিল্পপ্রচেষ্টার গভীরতর তাৎপর্য এই যে বুদ্ধিহীন চেতনা সম্ভূত বিদ্রোহের মাধ্যমে কল্পনা-পদ্ধতি দ্বারা বিশ্বের বৈকল্পিক প্রতিস্থাপন। এই ধরণার প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই মালরো র Vincent Berger-এর মুখে—

—"We know we did not choose to be born and that we shall not choose to die.....When I say that each man feels forcibly the presence of destiny, I mean that he feels—and almost always tragically, at least at certain moments—the independence of the world in his regard.....To say stylized is to say humanized; what man would have done if he had been God. Man knows that the universe is not built to the human scale; and he wishes it were. And when he reconstructs it, it is according to the human scale that he does so..... Our art seems to me a rectification of the universe, a way of escaping from the human condition. The worst confusion seems to me to have come from the belief.....that to represent a fatality is to submit to it. On the contrary—it is almost to overcome it! .....In its essentials, our art is a humanisation of the universe."—(Andre Malraux, The Walnut Trees of Altenberg).

প্রমিথিয়ুস-এর চিরন্তন যাতনার সাথে অন্তর্দাহের অসহনীয় যন্ত্রণার তুলনামূলক বিচার, এবং কাম্যুর নিজস্ব শিল্প-প্রচেষ্টায় এই প্রতীকের পুনঃপুনঃ উপস্থিতির তাৎপর্য বিশ্লেষণে আমরা এই বেদনাময় সামগ্রিক অবস্থার বিরুদ্ধে সক্ষমক্ষম শিল্পী হিসাবে কাম্যুর প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ, এবং কল্পনা-সৌষ্ঠবে প্রতীকতার সাহায্যে তাঁর বিকল্পিত প্রতিরূপ অন্বেষণের সাক্ষাৎ পরিচয় পাই। এ প্রসঙ্গে আমরা বিখ্যাত আমেরিকান সমালোচক Francis Fergusson-এর James Joyce-এর Stephen Dedalus (Ulysses) সম্বন্ধে অভিমতটি উদ্ধৃত ক'রে সেটা কাম্যুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার চেষ্টা করতে পারি। Fergusson লেখেন—

—"When he (Joyce) toys with the notion of a mythic parallel to his destiny he chooses not Prometheus but Dedalus. The artist in his flight is as impatient as Prometheus, attached to the service of humanity..... His being and his art are both self-contained, and both 'free' alike of God and of man."—(Francis Fergusson, The Human Image in Dramatic Literature, New York, 1957, pp. 78-79).

এই বক্তব্যটির সামান্য পরিবর্তনে আমরা বলতে পারি—"যখন কাম্য 'toys with the notion of a mythic parallel to his destiny'

তখন তিনি 'chooses not Dedalus but Prometheus', কারণ শিল্পী হিসাবে তিনি 'attached to the service of humanity'—"। বস্তুতঃ, আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে The Plague, The Rebel, The Just Assasins ও State of Seige—এই চারটী রচনাকে কাম্ "The Myth of Prometheus" বলে অভিহিত করেছেন!

পরিশেষে তবু হয়াম, অভিনেতা, বিপ্লবী ও শিল্পীর সমষ্টিগত প্রতিরূপ হিসাবে সিসিফুস্-এর অতিকথা ও তার প্রতীকতা দ্বারা কাম্ আমাদের কল্পনার প্রতি প্রত্যক্ষ আবেদন জানায়। "The Gods had condemned Sisyphus to ceaselessly rolling a rock to the top of a mountain, whence the stone would fall back of its own weight. They had thought with some reason that there is no more dreadful punishment than futile and hopeless labour."—(The Myth, pp. 96) কারণ মৃত্যুর পর ম্যুচোর-র অনুমতিতে সাময়িক-ভাবে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের পর এক মুক্ত ও স্বাধীন জীবনযাপনের অভিলাষ সিসিফুসকে আবিষ্ট করায় সে যথাসময়ে পাতালে প্রত্যাগমনের নিজ অঙ্গীকারকে উদ্ধতভাবে অবহেলা করে। এই অবহেলার অন্তর্নিহিত প্রতীক ও মনোভাব হচ্ছে: মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ ঘোষণা, যার মূলে আছে জীবনের প্রতি অসীম এক ভালবাসা; এবং এই ভালবাসার জন্যই সিসিফুস—"is the absurd hero .....as much through his passions as through his torture. His scorn of gods, his hatred of death, and his passion for life won him that unspeakable penalty in which the whole being is exerted towards accomplishing nothing. This is the price that must be paid for the passions of this earth."—(The Myth, pp. 97.)

পর্বতের শিখর থেকে প্রস্তরখণ্ডের পাদদেশমুখী অভিযানের প্রতি পূর্ণরূপে দৃষ্টিনিক্ষেপের পর নিজ কর্মের আপাতহীনতার সম্পূর্ণ চেতনা প্রত্যেকবারই সিসিফুসকে বিদ্রোহাতীর্ণ করায় সে জানে যে মানবাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার স্বীয় নিয়তির অন্তর পরিধির বহির্ভূত। নিরাশার সর্বগ্রাসী যন্ত্রণার পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য যে স্বচ্ছতার প্রয়োজন, সেই স্বচ্ছতাই এ ক্ষেত্রে সিসিফুসের বিজয়ের জন্য দায়ী।

"Despite so many ordeals, my advanced age and nobility of my soul make me conclude that all is well"— ইডিপাস্-এর এই বিজয়সূচক উক্তির প্রতিধ্বনি শোনা যায় The Myth-এর শেষ কয় লাইনে—

> "I leave Sisyphus at the foot of the mountain One always finds one's burden again. But Sisyphus teaches the higher fidelity that negates the gods and raises rocks. He, too, concludes that all is well. The universe henceforth without a master seems to him neither sterile nor futile. Each atom of that stone, each mineral flake of that night-filled mountain, in itself forms a world. The struggle itself towards the heights is enough to fill a man's heart. One must imagine Sisyphus happy."—(The Myth, pp. 99).

• • • •

দার্শনিক রচনাহিসাবে The Myth-এর কয়েকটী দুর্বলতা এখানে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, পঞ্চম অধ্যায়ে কাম্যু The Epic of Gilgamesh (Circa. 2000 B.C.) সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ করেন নি। মনুষ্য সভ্যতার লিখিত ইতিহাসে মৃত্যুর বিপক্ষে প্রত্যক্ষ বিদ্রোহের রূপ এই মহাকাব্যে সর্বপ্রথম পরিলক্ষিত হয়। এই সুমারীয় কাব্যের প্রায় প্রতিটি লাইনে আমরা দেখতে পাই মৃত্যুরূপী মহা অভাবের বিরুদ্ধে ঘুমায়িত অসন্তোষ, গভীর অনুভূতিময় প্রতিবাদের অভিব্যক্তি, এবং পরিশেষে অমর জীবন অনুসন্ধানের ব্যর্থ প্রয়াস। অমরতা অন্বেষী গিলগামেশ-এর উদ্দেশে এই উক্তি তৎকালীন চিন্তাধারার সাধারণ গতির নির্দেশ দেয়—

> "Gilgamesh, where are you hurrying to? You will never find that life for which you are looking. When the gods created man they allotted to him death, but life they retained in their own keeping. As for you, Gilgamesh, fill your belly with good things; day and night, night and day, dance and be merry, feast and rejoice. Let your clothes be fresh, bathe yourself in water, cherish the little child that holds your hands, and make your wife happy in your embrace: for this too is the lot of man."

সিদ্‌গামেশের উত্তর—

> "How can I be silent, how can I rest, when Enkidu (his counterpart) whom I love is dust, and I too shall die and be laid in the earth for ever."—The Epic of Gilgamesh, (trans. N. K. Sandars) Penguin Classics, 1960, pp. 99.

মৃত্যুর বিরুদ্ধে সিদ্‌গামেশের বিদ্রোহ মনুষ্য ইতিহাসে সর্বপ্রথমে অসংগতি-বোধের ইংগিত দেয়। এই বেদিতার ঐতিহাসিক পটভূমিকা সমীক্ষণে বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক Thorkild Jacobsen লেখেন—

> "The idea that justice was something to which man had a right began slowly to take form, and in the second millennium—appropriately the millennium of the famous Code of Hammurabi—justice as right rather than justice as favour seems to have become the general conception. This idea, however, could not but conflict violently with the established view of the world. There emerged fundamental problems, such as the justification of death and the problem of the righteous sufferer. These two problems do not arise with equal clarity, but both have behind them an equally passionate urgency The less articulate, less rationalised of the two was probably *the revolt against death*. We meet it as a smouldering resentment, a deep-seated feeling of wrong: it is more a feeling than a thought. Yet it can hardly be doubted that this feeling has its basis in the new concept of human rights, in the claim for justice of the universe. Death is an evil—it is as harsh as any punishment, is, indeed, the *supreme* punishment. Why must a man suffer death if he had committed no wrong? We find it treated in the Epic of Gilgamesh."—Thorkild Jacobsen. Before Philosophy (An Intellectual Adventure of Ancient Man), Penguin (Pelican), 1949, pp. 223.

The Myth-এর আরেকটী দুর্বলতার সম্ভাব্য চাতুর্য এখানে উল্লেখযোগ্য। সেটি হচ্ছে: যৌক্তিক ও দার্শনিক পরিক্রমার একটি বিশেষ প্রত্যেক্ষিত অভিজ্ঞতার রূপ-বর্ণনার প্রয়াস। অসংগতির প্রমাণ হিসাবে কাম্‌ যে যুক্তির

প্রত্যাবর্তন করেন তা খুব সন্তোষজনক নয়। বিশ্বের অযৌক্তিকতার উপলব্ধনের জন্য তিনি Aristotle থেকে সমসাময়িক দার্শনিকদের এই সত্যানুগতির আধিবিদ্যক যুক্তি প্রয়োগ করেন: সমস্ত কিছুই সত্য হিসাবে স্বীকার করার অর্থ এই স্বীকারোক্তির দ্বন্দ্বকে স্বীকার করা, কিন্তু দ্বন্দ্বের স্বভাবগত তাৎপর্য এ উক্তির অসত্যতা প্রমাণ করতে বাধ্য, অতএব প্রথম বা মূল উক্তির অসত্যতাও স্বতঃসিদ্ধ। অপরপক্ষে, সমস্ত কিছুই যদি মিথ্যা বলে ঘোষণা করা যায়, তাহলে এই ঘোষণাও মিথ্যা, কারণ যে উক্তি এই ঘোষণার পরিপন্থী শুধু সেই উক্তিকেই অসত্যরূপে গণ্য করার অর্থ অন্যান্য উক্তি সমূহের সত্যতার সম্ভাবনাকেও স্বীকার করা।—দার্শনিক নিপুণতা সত্ত্বেও এই মূলগত যুক্তি অসংগতি প্রমাণে সক্ষম নয়। সমস্ত আধিবিদ্যক প্রতিজ্ঞারাশির সাযজ্যের প্রতি সত্য-মিথ্যার পরিভাষা অর্থবোধকভাবে প্রয়োগ করার অক্ষমতা ব্যতিরেকে এই যুক্তি অন্য কিছু প্রমাণ করতে সমর্থ নয়, কারণ এক যুক্তিসিদ্ধ জগতের প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করার জন্য যুক্তিযুক্তভাবে বস্তু ও ঘটনার অন্তর ও অকাল্পনিক বাস্তবতার অবশ্য প্রয়োজন। এই অর্থে কাম্যু আধুনিক পদার্থ-বিদ্যা থেকে যে উদাহরণের সাহায্য নিয়েছেন—("...you teach me that this wondrous and multi-coloured universe can be reduced to the atom and that the atom itself can be reduced to the electron. All this is good and I wait for you to continue. But you tell me of an invisible planetary system in which electrons gravitate around a nucleus. You explain this world to me with an image. I realise then that you have been reduced to poetry: I shall never know.....the science that was to teach me everything ends up in a hypothesis, that lucidity founders in metaphor, that uncertainty is resolved in a work of art." —The Myth, pp. 23 তার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শুধু এইটাই প্রমাণ করে যে বৈজ্ঞানিক আখ্যান বিশ্বের যৌক্তিকতাকে অনুসন্ধানে তিনি শুধু ঊনবিংশ শতাব্দীর বলবিজ্ঞানের পরিভাষাই ব্যবহার করতে প্রস্তুত। এবং ব্যক্তিবিশেষের চিন্তাগতির অকস্মাৎ ব্যাঘাত প্রাপ্তির দৃষ্টান্ত দ্বারা নিজ তত্ত্ব প্রমাণের আশায় কাম্যু যে যুক্তিপ্রদর্শন করেছেন তার প্রধান উপাদান, যাকে তিনি মস্তিষ্ক-চৈতন্য বলে উল্লেখ করেছেন, তা অবশ্যিত ঘটনাবলীর প্রতিফলে অনুপস্থিত;

কারণ ব্যক্তিবিশেষের চিন্তাগতির আকস্মিক প্রতিবন্ধ দ্বারা শুধু এই ধারণাই প্রমাণিত হয় যে, মনুষ্যত্বের ও মনুষ্যত্বমের গঠন ও প্রকৃতিই মনুষ্য চৈতন্যের কর্মপ্রণালীর প্রধান অন্তরায়।

* * * *

কিন্তু এই দৌর্বল্য সত্ত্বেও The Myth-এর আলোচ্য বিষয়ের অনন্যসাধারণ উত্তরণ প্রতিফলিত হয়েছে এর অসাধারণ আঙ্গিকে ও রচনাবিন্যাসের অসাধারণ নৈপুণ্য। The Myth হচ্ছে সমসাময়িক সভ্যতার অত্যন্তকারী ও বিষাক্ত আবহাওয়ায় সমগ্র মানবাবস্থার সামগ্রিক সমস্যার নৈতিক সমাধান অন্বেষণে একজন সংবেদনশীল ও মানবপ্রেমী শিল্পীর আন্তরিক প্রচেষ্টা; কারণ তাঁর নিজের ভাষায়—

> "I hate self-satisfied virtue. I hate the despicable morality of the world, and I hate it because, just like cynicism, it ends by depriving man of hope and preventing him from assuming responsibility for his own life with all its terrible burden of crimes and grandeur."

এবং

> "To loose one's life is a little thing, and I will have the courage when necessary. But to see the sense of life dissipated, to see our reason for existence disappear: that is what is insupportable."—(Caligula).

বিংশশতাব্দীর আত্মিক ও নৈতিক বৈউলিয়া, এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতি সংকট এ যুগের চিন্তাশীল মানুষের মনে যে মর্মন্তুদ বেদনা সঞ্চারিত করেছে, তার সাক্ষীস্বরূপ আমরা হয়ত স্মরণ করতে পারি সমসাময়িক জগতের আর একজন অন্যতম মনীষীর এই বিষাদময় উক্তি—

> "The century might have been a good one had not man been watched from time immemorial by the cruel enemy who had sworn to destroy him, that hairless, evil, flesh-eating beast—man himself. One and one make one, there's our mystery. The beast was hiding, and suddenly we surprised his look deep in the eyes of our neighbours. So we struck. Legitimate self-defence. I surprised the beast. I struck. A man fell, and in his dying eyes I saw the beast still living—

myself. One and one make one—what a misunderstanding! Where does it come from, this rancid, dead taste in my mouth? From man? From the beast? From myself? Is it the taste of the century. Happy centuries, you who do not know our hatreds, how could you understand the atrocious power of our fatal loves? Love. Hatred. One and one.. "– Jean-Paul Sartre, Loser Wins. (trans. Sylvia and George Leeson), Hamish Hamilton, London, 1960.

---

১. J. Korg. The Cult of Absurdity, Nation 181 (Dec. '55), pp. 517.

২. R. Galand, Four French Attitudes on Life; Montherlant, Malraux, Sartre, Camus. New England Modern Language Association Bulletin-15 (no. 1, Feb. '53), pp. 9-15.

৩. "By rejecting the private world of the imagination with its glossy aesthetics, and by turning outward to confront the formidable fact of deadliness—physical, psychological, metaphorical—in the immediate historic world, Malraux conveys the feeling of absurdity with dreadful effect."—W. M. Frohock, Andre Malraux & the Tragic Imagination. (Stamford, 1952).

৪. The Myth of Sisyphus, (trans. O'Brien). Hamish Hamilton, London. 1955, pp. 11.

৫. "It seems that the majority of these suicides, though the exterior circumstances invoked at the moment were different, have a common denominator: Nietzsche's concept of 'the nihilism of the western man'."—R. L. Bruckberger, The Spiritual Agony of Europe, Renascence, 1954, pp. 78.

৬. "I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving hysterical naked.
dragging themselves through negro streets at dawn looking for an angry fix."—Allen Ginsberg, Howl, City Lights, San Francisco, 1956. pp. 9.

৭. "Nietzsche is not an athelst but an agnostic and his verdict of God's death is a factual cultural report of our loss of belief rather than a metaphysical denial."—Walter Kaufman, Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Anti-Christ; Princeton, 1950, pp. 77. Friedrich Nietzsche: Thus Spake

Zarathustra (The Philosophy of Nietzsche), Modern Library, N. Y. pp. 20-28, 97-100, 256-263. 1948.

৮. A. Schopenhaur, The world as Will and Ideas, (trans. Haldane & J. Kemp), Kegan Paul, London, 1906.

৯. "The mind intends its object, and the office of phenomenology is to bring this objective intention to fulfilment. When the object itself is exhibited in perpetual intention, the search for evidence and truth is fulfilled."—M. Faber, The Foundation of Phenomenology: Edmund Husserl and the Quest for a Rigorous Science of Philosophy, Harvard, 1940.

কিংবা হুসেলের নিজের কথায়—

"The natural wakeful of life of our Ego is a continuous perceiving, actual and potential. The world of things and our body within it are continuously present to our perception. How then does and can *Consciousness itself* seperate out as a *concrete thing in itself*, from that within it, of which we are conscious, namely, the *perceived being*, *'standing over against'* consciousness 'in and for itself'."—Edmund Husserl, Ideas, (trans. W. R. B. Gibson), Macmillan, New York, 1931.

১০. P. Tillich, Existential Philosophy, Journal of History of Ideas, (Jan. 1944) pp. 44-70.

১১. J. H. Hart, Beyond Existentialism, Yale Review 45, no. 3, Mar. '56, pp. 444-51.

১২ নবদাম্বরিক নাট্যশিল্পের তাৎপর্য বিশ্লেষণে একজন বিখ্যাত আমেরিকান নাট্যকারের tragic victory সম্বন্ধে অভিমত এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়—

"The tragic victory is always denied us because, I believe, the plays cannot project with any conviction what the society, in the playwright's view at any rate, has failed to prove. In Greece the tragic victory consisted in demonstrating that the 'polis' has discovered some aspects of the Grand Design." —Arthur Miller, On Social Plays (A View from the Bridge). Viking Press, New York, 1955.

১৩. "If there is no immorfality, there is no virtue, hence everything is lawful." Dostoevsky, The Brothers Karamazov. (trans. Constance Garnet), Everyman's Library, London, 1927. pp. 66, 270.

১৪. Albert Le Grand, Albert Camus: from Absurdity to Revolt, Culture, Dec. 1953, pp. 406-422.

১৫. M. Harrington, Ethics of Rebellion, Commonweal, no. 59, (Jan. 29 '54) pp. 428-31.

১৬. M. Harrington, The Despair and Hope of Modern Man, Commonweal, 63, (Oct. 14, '55) pp. 44-45, (On the English translation of Le Mythe de Sisyphe).

১৭. W. M. Frohock, Camus: Image, Influence and Sensibility, Yale French Studies 2 (no. 2, Fourth Study), pp. 91-92.

১৮. S. John, Image and Symbol in the Works of Albert Camus, French Studies 9, (no. 1, Jan. '55), pp. 42-53.

রবীন্দ্রনাথ ও মানুষের ব্যক্তিস্বরূপ

ত্রিদিব ঘোষ

(পূর্বানুবৃত্তি)

রবীন্দ্রনাথ কখনই মানুষের একটা একান্ত বিচ্ছিন্ন, একান্ত স্বতন্ত্র, বৈশিষ্ট্য অস্তিত্ব থাকা সম্ভব বলে মনে করতেন না। 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে "বিশেষত্ব ও বিশ্ব" প্রবন্ধে তাঁর এই সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন, "আমি তাঁকে এই কথাটি বোঝাবার চেষ্টা করেছিলুম যে, মানুষের বিশেষত্ব তো একটা ঐকান্তিক পদার্থ নয়। মানুষের সত্তায় সে একটা প্রান্তমাত্র। মানুষের এক প্রান্তে তার বিশ্ব, অন্য প্রান্তে তার বিশেষত্ব। এই দুই নিয়ে তবে তার সম্পূর্ণতা, তার আনন্দ। যদি আপনার সৃষ্টিছাড়া নিজত্বের মধ্যে মানুষের যথার্থ আনন্দ থাকত তা হলে নিজেরই একটা স্বতন্ত্র জগতের মধ্যে সে বাস করতে পারত। সেখানে তার নিজের সুবিধা অনুসারে সূর্য উঠত কিম্বা উঠত না। সেখানে তার যখন যেমন ইচ্ছা হত তখন তেমনি ঘটত। কোন বাধা হত না, সুতরাং কোনো দুঃখ থাকত না। সেখানে তার কাউকে আসবার দরকার হত না, কেননা সেখানে তার ইচ্ছামতোই সমস্ত ঘটেছে।……এইজন্য লোহা কাঠ জলকে আমার জানা চাই—এবং তারা ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজন অনুসারে আপনার ধর্মের কোনো ব্যতিক্রম করে না বলেই প্রত্যেক ব্যক্তি তাকে জানতে পারে। নিজের যথেচ্ছাঘটিত জগতের মধ্যে সমস্ত বাধা ও চেষ্টাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে বাস করিলে বলেই বিজ্ঞান দর্শন শিল্পকলা ধর্মকর্ম যা-কিছু মানুষের সাধনার সমস্তই সম্ভবপর হয়েছে। একটা কথা ভেবে দেখো, আমাদের বিশেষ ব্যক্তিত্বের প্রধান সম্বল যে ইচ্ছা সে ইচ্ছা কাকে চাচ্ছে। যদি আমাদের নিজের মনের মধ্যেই তার তৃপ্তি থাকত তা হলে মনের মধ্যে যা খুশি তাই বানিয়ে বানিয়ে তাকে স্থির রাখতে পারতুম। কিন্তু, ইচ্ছা তা চায় না। সে আপনার বাইরে সমস্ত কিছুকে চায়। তা হলে আপনার বাইরে একটা সত্য পদার্থ কিছু থাকা চাই। যদি কিছু থাকে তবে তার একটা সত্য নিয়ম

থাকা দরকার, নইলে তাকে থাকাই বলে না। যদি সেই নিয়ম থাকে তবে নিশ্চয়ই আমার ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছাকে সে সব সময় খাতির করে চলতেই পারে না।.....তাহলে দেখতে পাচ্ছি, আমাদের বিশেষত্বের পক্ষে এমন একটি বিশ্বনিয়মের প্রয়োজন যে নিয়ম সত্য, অর্থাৎ যে নিয়ম আমার বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে না। বস্তুতঃ আমি আমাকেই সার্থক করবার জন্য বিশ্বকে চাই। এই বিশ্ব যদি আমারই ইচ্ছাধীন একটা মায়া পদার্থ হয় তাহলে আমাকেই ব্যর্থ করে। আমারই জ্ঞান সার্থক বিশ্বজ্ঞানে, আমারই শক্তি সার্থক বিশ্বশক্তিতে, আমারই প্রেম সার্থক বিশ্বপ্রেমে। তাই যখন দেখছি তখন একথা কেমন করে বলব বিশ্ব যদি বিশ্বরূপে সত্য না হত—সে যদি আমারই—বিশেষ—ইচ্ছানুগত হবে, স্বপ্নের মতো হত তা হলে ভালো হত? তা হলে সে আমার পক্ষে অনর্থকর হত। এইজন্য আমরা দেখতে পাই, আমির মধ্যে যার আনন্দ প্রচুর সেই তার আমিকে বিশেষত্বের দিক থেকে বিশ্বের দিকে নিয়ে যায়।.....মানুষের মহত্ত্ব এইখানে; সে আপনার বিশেষত্বকে বিশ্বের সামগ্রী করে তুলতে পারে—এবং তাতেই সকলের চেয়ে বড় আনন্দ। মানুষের আমির সঙ্গে বিশ্বের সঙ্গে মেলবার পথ বড়ো রকম করে আছে বলেই মানুষের দুঃখ এবং তাতেই মানুষের আনন্দ। মানুষের সঙ্গে পশুর একটা মস্ত প্রভেদ হচ্ছে এই, মানুষ যেমন বিশ্বের কাছ থেকে নানারকম করে নেয় তেমনি মানুষ আপনাকে বিশ্বের কাছে নানারকমে দেয়। তার সৌন্দর্যবোধ, তার কল্যাণ চেষ্টা কেবলই সৃষ্টি করতে চায়—তা না করতে পারলে সে পঙ্গু হয়ে খর্ব হয়ে যায়। নিতে গেলেও তার দেবার ক্ষেত্র বিশ্ব, দিতে গেলেও তার দেবার ক্ষেত্র বিশ্ব। একথা যখন সত্য তখন তুমি যদি বল 'বিশ্বপ্রকৃতি আমার ব্যক্তিগত বিশেষত্বকে মেনে চলে না বলে আমার দুঃখবোধ হচ্ছে' তখন তোমাকে বুঝে দেখতে হবে, মেনে চলে না বলেই তোমার আনন্দ। বিশেষকে মানে না বলেই সে বিশ্ব, এবং সে বিশ্ব বলেই বিশেষের তাতে প্রতিষ্ঠা।" এই বিস্তৃত উদ্ধৃতি থেকে মনে হতে পারে রবীন্দ্রনাথ কি বিশেষত্বের চেয়ে সামান্য গুণকে, সমগ্রতাকে বেশী মূল্য দিতেন, বা তিনি বিশ্ব ও বিশেষত্ব, এক ও বহু, সামান্য ও বিশেষের মধ্যে কোথায় সেতুবন্ধ রয়েছে তার অনুসন্ধান করেছেন। তিনি যে নির্বিশেষ কোন অদ্বৈতের মধ্যে সব কিছুকে একাকার করে দেখতেন না, তার প্রমাণ তাঁর

লেখার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। শান্তিনিকেতন গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে "বিশ্ববোধ" প্রবন্ধে তিনি বলছেন, "য়ুরোপের কোনো কোনো আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানী, যাঁরা পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে উপনিষদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী, তাঁরা সেই ঋণকে অস্বীকার করেই বলে থাকেন, ভারতবর্ষের ব্রহ্ম একটা অবস্তুক (abstract) পদার্থ। অর্থাৎ, জগতে যেখানে যা কিছু আছে সমস্তকে ত্যাগ করে বাদ দিয়েই সেই অসত্তস্বরূপ—অর্থাৎ এক কথায় তিনি কোথাও নেই, আছেন কেবল তত্ত্বজ্ঞানে। এরকম কোনো দার্শনিক মতবাদ ভারতবর্ষে আছে কিনা সে কথা আলোচনা করতে চাই নে, কিন্তু এটি ভারতবর্ষের আসল কথা নয়। বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থের মধ্যেই অসীম স্বরূপকে উপলব্ধি করার সাধনা ভারতবর্ষে এতদূর গেছে যে অন্য দেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা সাহস করে ততদূর যেতে পারেন না।" শান্তিনিকেতন গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে "নির্বিশেষ" প্রবন্ধে নির্বিশেষের অভিমুখেই মানুষের সমস্ত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা সমস্ত উন্নতির চেষ্টা কাজ করছে একথা স্বীকার করে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, "কিন্তু, যেখানেই হোক, বিশিষ্টতা বলে একটা পদার্থ এসেছে। মিথ্যাই বলি, মায়াই বলি, তার মস্ত একটা জোর যে আছে। এই জোর সে পায় কোথা থেকে?" এই প্রশ্নের ইঙ্গিত যেন শান্তিনিকেতন গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের "বিশেষ" নামক প্রবন্ধে পাওয়া যায়। তিনি বলছেন, "জগতের সর্বসাধারণের সঙ্গে সাধারণভাবে আমার মিল আছে। ধূলির সঙ্গে পাথরের সঙ্গে আমার মিল আছে; ঘাসের সঙ্গে গাছের সঙ্গে আমার মিল আছে; পশুপাখীর সঙ্গে আমার মিল আছে সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমার মিল আছে; কিন্তু, এক জায়গায় একেবারে মিল নেই—সেখানে আমি হচ্ছি বিশেষ। আমি যাকে আজ আমি বলছি এর আর কোন দ্বিতীয় নেই। ঈশ্বরের অনন্ত বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে এ সৃষ্টি সম্পূর্ণ অপূর্ব—এ কেবলমাত্র আমি, একলা আমি, অনুপম অতুলনীয় আমি। এই আমির যে জগৎ সে একলা আমারই জগৎ—সে মহাবিজন লোকে আমার অন্তর্যামী ছাড়া আর কারও প্রবেশ করবার কোনো যো নেই। হে আমার প্রভু, সেই একলা আমি, বিশেষ আমি, তার মধ্যে তোমার বিশেষ আনন্দ, বিশেষ আবির্ভাব আছে—সেই বিশেষ আবির্ভাবটি আর কোনো দেশে কোনো কালে নেই। আমার সেই বিশিষ্টতাকে আমি সার্থক করব প্রভু। আমি সাধক তোমার সকল

হতে স্বতন্ত্র এই যে একটা বিশেষ লীলা আছে, এই বিশেষ লীলায় তোমার সঙ্গে যোগ দেব। এইখানে একের সঙ্গে এক হয়ে মিলব। পৃথিবীর ক্ষেত্রে আমার এই মানব জন্ম তোমার সেই বিশেষ লীলাটিকে যেন সৌন্দর্যের সঙ্গে, সঙ্গীতের সঙ্গে, পবিত্রতার সঙ্গে, মহত্ত্বের সঙ্গে, সচেতনভাবে বহন করে নিয়ে যায়। আমাতে তোমার যে একটা বিশেষ অধিষ্ঠান আছে সে কথা যেন কোনদিন কোনোমতেই না ভুলি। অনন্ত বিশ্বসংসারে এই-যে একটি আমি হয়েছি মানব জীবনে এই আমি সার্থক হোক।··· আর আমার এই সাধারণ জীবন নানা ক্ষুধা-তৃষ্ণা চিন্তাচেষ্টা দ্বারা আমি সমস্ত তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে একত্রে মিলে ভোগ করছি, সেইটেই দানাদিক দিয়ে প্রবল না হয়ে উঠে—আমাতে তোমার যে একটা বিশেষ স্পর্শ, বিশেষ ক্রিয়া, বিশেষ-আনন্দ অনন্ত কালের সুহৃদ ও দায়িত্বরূপে রয়েছে তাকে যেন আচ্ছন্ন করে না দাঁড়ায়। আমি যেখানে জগতের সামিল সেখানে তোমাকে জগদীশ্বর বলে মানি, তোমার সব নিয়ম পালন করলে তোমার শান্তি গ্রহণ করি—কিন্তু, আমি রূপে তোমাকে আমি আমার একমাত্র সঙ্গে জানতে চাই। সেইখানে তুমি আমাকে স্বাধীন করে দিয়েছ—কেননা, স্বাধীন না হলে প্রেম সার্থক হবে না, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিলবে না, লীলার সঙ্গে লীলার যোগ হতে পারবে না। এইজন্য এই স্বাধীনতার আমি-ক্ষেত্রেই আমার সব দুঃখের চেয়ে পরম দুঃখ তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ, অর্থাৎ অহঙ্কারের দুঃখ; আর সব সুখের চেয়ে পরম সুখ তোমার সঙ্গে মিলন, অর্থাৎ প্রেমের সুখ।" অবশ্যই মানুষের এই আমি-ক্ষেত্র, মানুষের এই বিশেষত্ব, যাকে তিনি ব্যক্তিস্বরূপের ভিত্তি মনে করেছেন তাকে নিতান্ত পরিবেশাধীন দেহসীমার বদ্ধ একটা নিছক ব্যক্তিবিশেষ বলে তিনি মনে করতেন না—মানুষের এই ব্যবহারিক সত্তার ঊর্ধ্বে এক দ্রষ্টাস্বরূপ পরমার্থ-সত্তার ধারণা তিনি পোষণ করতেন এবং একে সেই পরম একের সঙ্গে যোগযুক্ত করে তিনি যুক্তাত্মা নামে অভিহিত করেছেন। মানুষের স্বরূপের এইদিকটি উপনিষদের সেই বিখ্যাত শ্লোকটি—যা সপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-নশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি। মনে করিয়ে দেয়। দুইটি পাখী বৃক্ষশাখায় বসে রয়েছে, একটি পিপ্পল ভক্ষণ করছে, আর একটি শুধু দেখছে। ফলাস্বাদী পাখীটিকে আমরা মানুষের ব্যবহারিক সত্তার প্রতীক ধরতে পারি, আর দ্রষ্টা পাখীটিকে আমরা মানুষের পরমার্থ-সত্তার

প্রতীক হয়ে করতে পারি। শান্তিনিকেতন গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে "স্রষ্টা" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "অন্তরকে বাইরের আক্রমণ থেকে বাঁচাও। দুইকে মিশিয়ে এক করে দেখোনা। সমস্তটাকে কেবলমাত্র সংসারের অন্তর্গত করে জেনো না। তা যদি কর তবে সংসার সংকট থেকে উদ্ধার পাবার কোনো রাস্তা খুঁজে পাবে না। থেকে থেকে ঘোরতর কর্মসংঘাতের মাঝখানেই নিজের অন্তরকে নির্লিপ্ত বলে অনুভব কোরো। এইরকম ক্ষণে ক্ষণে বারম্বার উপলব্ধি করতে হবে। খুব কোলাহলের ভিতর থেকে একবার চকিতের মতো দেখে নিতে হবে, সেই অন্তরের মধ্যে কোন কোলাহল পৌঁচচ্ছে না। সেখানে শান্ত, স্তব্ধ, নির্মল। না, কোনোমতেই সেখানে বাহিরের কোনো চাঞ্চল্যকে প্রবেশ করতে দেবনা। এই যে আমাগোনা লোকলৌকিকতার হাদিখেলার মহাজনতা, এর মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে একবার অন্তরের অন্তর ঘুরে এসো—দেখে এসো সেখানে নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপটি জ্বলছে, অনুত্তরঙ্গ সমুদ্র আপন অতলস্পর্শ গভীরতায় স্থির হয়ে রয়েছে, শোকের ক্রন্দন সেখানে পৌঁছয়না, ক্রোধের গর্জন সেখানে শান্ত। সংসারের সমস্ত কিছুর মধ্যে ওতপ্রোত থেকেও পরমাত্মা যেমন স্রষ্টা, আমাদের অন্তরাত্মাকেও তেমন স্রষ্টাস্বরূপ জানতে হবে। যদিও সংসার, শরীর, বুদ্ধি, হৃদয় সবই তাঁর, তবুও এই সংসারে শরীরে, বুদ্ধিতে হৃদয়ে পরিব্যাপ্ত হয়েও এই সমস্ত কিছুর তিনি অতীত, তিনি স্রষ্টাস্বরূপ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এই যে আমি সংসারে জন্মলাভ করে বিশেষ নাম ধরে নানা সুখ দুঃখ ভোগ করছে, এই তাঁর বহিরাংশকে তিনি সাক্ষীরূপেই দেখে যাচ্ছেন। আমরা যখন আত্মবিৎ হই, এই অন্তরাত্মাকে যখন সম্পূর্ণ উপলব্ধি করি, তখন আমরা নিজের নিত্যস্বরূপকে নিশ্চয় জেনে সমস্ত সুখ দুঃখের মধ্যে থেকেও সুখদুঃখের অতীত হয়ে যাই, নিজের জীবনকে সংসারকে স্রষ্টারূপে জানি।"

নিঃসন্দেহে এ সৃষ্টিতত্ত্বী দর্শনে যাকে ভাববাদ বলা হয় তাই। এই ভাববাদ ধর্মীয় মনোভাবের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত। ভাববাদী দর্শন সাধারণভাবে চৈতন্যকে পরমসত্তা বলে মানে, সুতরাং তাতে ঈশ্বরবিশ্বাসের স্থান আছে। কিন্তু তা যে সর্বদাই ঈশ্বরমুখী হবে এমন কোন কথা নেই। যে ভাববাদে নিজের নিজের পরিচ্ছিন্ন, সীমায়িত ব্যক্তিসত্তা (Finite Self) ও তার প্রত্যয় পরম্পরাকে একমাত্র প্রতিপাদ্য, একমাত্র প্রমেয় পদার্থ বলে ধরা হয়,

তাতে পরমাত্মা স্বরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সন্দেহের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় যদিও দার্শনিক যুক্তিতে তাই করবার চেষ্টা করেছেন। আবার সত্তাকে এক, অদ্বিতীয় নির্বিশেষ রূপে মিলে এবং প্রত্যক্ষগোচর জগতের বৈচিত্র্যকে প্রতিভাস মাত্র মনে করলে, তাতে পরম চৈতন্যময় সত্তা এমনই এক অমূর্ত্তির (abstract) রূপ গ্রহণ করে যে, তাঁর পুরুষময় (personal) ঈশ্বররূপ ধারণা করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এই সত্তার সঙ্গে সংসারের বিশ্বপ্রকৃতির সম্পর্ক কি এই প্রশ্নের উত্তরের উপর ঈশ্বরবোধের প্রকৃতিটি নির্ভর করে। এই সত্তা জগতাতিরিক্ত হ'লে নির্গুণ, নিরাকার, নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধারণা স্থান পায়। তাঁকে জগৎলীন করে দেখলে লীলাময় পুরুষোত্তম ঈশ্বরের ধারণা পোষণ করা সম্ভব হয়। আমাদের দেশে ভক্তিবাদী বৈষ্ণবদর্শনে এই ধারণারই প্রাবল্য রয়েছে এবং বৈষ্ণব দর্শনে জীবাত্মার ভক্তিস্বরূপকে অপরূপ মূল্যে বিভূষিত করা হয়েছে। স্বয়ং পুরুষোত্তম ভগবান ভক্তের ভক্তি প্রত্যাশা, প্রেম প্রত্যাশা করেন; ভক্তের মধ্য দিয়েই তিনি যিনি রসিক—নিজেকে লীলায়িত, করেন, আস্বাদন করেন, পরিপূর্ণ করেন। এইদিক থেকে সংসারের, বিশ্বপ্রকৃতির, জীবাত্মা সৃষ্টির মূল্য রয়েছে এবং এই মতবাদের প্রভাবেই ভারতবর্ষে মানুষের ব্যক্তিস্বরূপের মূল্য পাওয়ার একটা সম্ভাবনা সৃষ্টিত হয়েছিল। তাছাড়া প্রাচীন ভারতীয় জীবন চতুরাশ্রমের কঠিন নিগড়ে বাঁধা থাকলেও, সমাজ জীবনে নানা অনুশাসনের প্রাবল্য থাকলেও, মুক্তিকামী মানুষকে এখানে একান্ত নিঃসঙ্গ সাধক হিসাবে সংসারের বাইরে যাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এমন একটি ঐতিহ্য এখানে বহুকাল ধরেই প্রচলিত রয়েছে। চরম উপলব্ধি যে নিঃসঙ্গ সাধনার নিজের অন্তরের গভীর হতে গভীরে প্রবেশেই সম্ভব এবং সে গভীর যে বিশ্বের গভীরের সঙ্গে মূলাত্মা একথা এখানে স্বীকৃত; এখানে সন্ন্যাসী, সমাজের আভিজাত্য প্রচার, অনুশাসনের ঊর্দ্ধে, এমন কি লৌকিক ধর্মানুষ্ঠান, সাম্প্রদায়িক গণ্ডীরও ঊর্দ্ধে, কেবলা তাঁরই মধ্যে ব্যক্তিস্বরূপের সত্যকার বিকাশ হয়েছে। Whitehead-এর ধর্ম সম্পর্কে এই উক্তি যে, "Religion is what man does with his solitariness" ভারতবর্ষে যেন প্রমাণিত হয়েছিল। এই সমস্ত ঐতিহ্য যে মানুষের ব্যক্তিস্বরূপ সম্পর্কে এক বিশেষ ধরণের মূল্যবোধের সঞ্চার করবে, তাতে সন্দেহ নেই ও রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিভঙ্গীতে এই ঐতিহ্যের প্রভাব খুবই লক্ষণীয়। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের

ব্রাহ্মসমাজ থেকেও প্রত্যক্ষভাবে এই প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছে, কারণ ব্রাহ্মধর্মে প্রাচীন উপনিষদের বাণীকে যুগোপযোগী করেই প্রকাশ করা হয়েছে। ব্রাহ্ম ধর্মে প্রতি মানুষের মধ্যে যে চৈতন্যপুরুষ রয়েছে তার আত্মানুভূতির উপর নির্ভর করে পরমাত্মার সঙ্গে সংযোগের উপরই জোর দেওয়া হয়েছে ও পরমাত্মা সেখানে পুরুষোত্তম পিতারূপে কল্পিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনে মানুষের ব্যক্তিস্বরূপ, বিশ্বপ্রকৃতি ও এই দুইয়ের উৎস পুরুষোত্তম ঈশ্বর তিনের সামঞ্জস্য ও সাযুজ্যবোধের উপরই প্রতিষ্ঠিত। নির্মলকুমারী মহলানবীশের নিকট লিখিত এক পত্রে তিনি বলেছেন, "মানুষের একটা সত্তা আছে যেটা তার সব চেয়ে বড়ো—যেটা তার সমস্ত অবস্থাদৈন্যের অতীতে। যেটাতে সে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত, যেটাতে সে নির্লিপ্ত এবং সেইজন্যেই সে সমস্তের সঙ্গে এক—আমার সে সত্তাকে জাগরূক করতে চেষ্টা করছি।" শান্তিনিকেতন গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে "প্রকৃতি" প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "প্রকৃতি ঈশ্বরের শক্তির ক্ষেত্র আর জীবাত্মা তাঁর প্রেমের ক্ষেত্র, একথা বলা হয়েছে। প্রকৃতিতে শক্তির দ্বারা তিনি নিজেকে প্রচার করছেন, আর জীবাত্মার প্রেমের দ্বারা তিনি নিজেকে দান করছেন।" শান্তিনিকেতন গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের "সুন্দর" প্রবন্ধে তিনি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে জীবন মধুর রূপ রয়েছে তার অনন্ত চিত্র অঙ্কিত করেছেন, সেই সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি যে মহানের উদ্ভাসকে লীলায়িত দেখেছেন, সেই মহানের অরূপ রূপকেও তিনি বরণীয় মনে করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টিই তাঁর সৌন্দৃষ্টি, তাঁর দার্শনিক ও ধর্মীয় দৃষ্টির অন্তরে সর্বদাই তাঁর কাব্যানুভূতির প্রাণস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে, সেজন্য এই দিকে থেকে ব্যক্তিস্বরূপকে তিনি কি ভাবে দেখেছেন আলোচনা করা সঙ্গত। আমেরিকার প্রদত্ত তাঁর "Personality" বক্তৃতাবলীর অন্তর্গত "What is art"-এ এই সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, "The principal object of art, also, being the expression of personality, and not of that which is abstract and analytical, necessarily uses the language of picture and music. This has led to a confusion in our thought that the object of art is the production of beauty; whereas beauty in art has been the mere instrument and not its complete and ultimate significance.....Therefore we find all abstract ideas are out of place in true art, where, in order to gain admission, they

must come under the disguise of personification. This is the reason why poetry tries to select words that have vital qualities,—words that are not for mere information, but have become naturalized in our hearts and have not been worn out of their shapes by too constant use in the market.....The world and the personal man are face to face, like friends who questions one another and exchange their inner secrets. The world asks the inner man,—"Friend, have you seen me? Do you love me?—not as one who provides you with foods and fruits, not as one whose laws you have found out, but as one who is personal, individual? The artist's answer is, "Yes I have seen you, I have loved and known you.....I see you, where you are what I am.....But how do you know that the artist has known, has seen, has come face to face with this Personality?.....If you take me to draw some particular tree, and I am no an artist, I try to copy every detail, lest I should otherwise lose the peculiarity of the tree, forgetting that the pecularity is not the personality. But when the true artist comes, he overlooks all details and gets into the essential characterization. Our rational man also seeks to simplify things into the inner principle; to get rid of the details, to get to the heart of things where things are one. But the difference is this—the scientist seeks an impersonal principle of unification, which can be applied to all things. For instance he destroys the human body which is personal in order to find out physiology, which is impersonal and general. But the artist finds out the unique, the individual which yet is in the heart of the universal. When he looks on a tree, he looks on that tree as unique, not as the botanist who generalises and classifies.

It is the function of the artist to particularize that one tree. How does he do it? Not through the pecularity which is the discord of the unique, but through the personality which is harmony. Therefore he has to find out the inner concordance of that one thing with its outer surroundings of all things.....Man is true, where he feels his infinity, where he is divine, and the divine is the creator in him. Therefore with the attainment of his truth he creates. For he can truly live in his own creation and make out of God's world his own world."

আমরা দেখতে পাচ্ছি কেমন করে তাঁর কবিসত্তা, শিল্পসত্তার ধারণা ব্যক্তি-স্বরূপের সাধারণ ধারণার সঙ্গে যুক্ত, কেমন করে তা বিশ্বাত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বীর যুক্তাত্মার ধারণায় পরিণত হয়েছে। "The Religion of Man" নামক হিবার্ট বক্তৃতাবলীতে 'Man's universe' বক্তৃতায় একথা আরও স্পষ্টতর হয়েছে—"The idea of humanity of our God, or the divinity of Man the Eternal, is the main subject of this book. This thought of God has not grown in my mind through any process of philosophical reasoning. On the contrary, it has followed the current of my temperament from early days until it suddenly flashed into my consciousness with a direct vision. The experience which I have described in one of the chapters which follow convinced me that on the surface of our being we have the ever-changing phases of the individual self, but in the depth there dwells the Eternal Spirit of human unity beyond our direct knowledge. It very often contradicts the trivialities of our daily life, and upsets the arrangements made for securing our personal exclusiveness behind the walls of individual habits and superficial conventions. It inspires in us works that are expressions of a Universal Spirit, it invokes unexpectedly in the midst of a self-centred life a supreme sacrifice. At its call we hasten to dedicate our lives to the cause of truth and beauty, to unreverred service of others in spite of our lack of faith in the positive reality of the ideal values. ১৯৩০ সালে ১৪ই জুলাইতে আচার্য আইনষ্টাইনের ক্যাপুতস্থ বাসভবনে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে কথোপকথন হয় (The Religion of Man গ্রন্থে প্রকাশিত) তাতে রবীন্দ্রনাথের শেষ কথা এই যে, "My religion is in the reconciliation of the Super-personal Man, the universal human Spirit, in my own individual being. This has been the subject of my Hibbert Lectures, which I have called "The Religion of Man." —তাঁর এই আদর্শকে কি আত্মিক মানবতাবাদ (spiritual humanism) নামে অভিহিত করা চলেনা, তাতে কি মানুষের ব্যক্তিসত্তা যাকে তিনি ব্যক্তিস্বরূপ বলেছেন তার একটা বিশিষ্ট, মূল্যবান স্থান নেই?

পৃথিবীতে প্রতিযুগেই কোন একটা আদর্শ, কিংবা দৃষ্টিভঙ্গীর আতিশয্য ঘটলে মাত্রাজ্ঞানের অভাব দেখা দিতে সুরু করে। বর্তমান যুগে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে এই দুর্লক্ষণ প্রকট হয়ে উঠেছে। বহু বিচিত্র বাস্তব আমাদের কাছে বহুদিক থেকে বহুরূপে, বিভিন্নরূপেই প্রতিভাত হয়, তার মধ্যে কোনটাকে একমাত্র সত্য, একান্ত সত্য বলে না ধরে বরং সত্যকে স্তরে স্তরে জানতে হয়, এবং সব স্তর মিলেই সত্যের অখণ্ডরূপ ফুটে উঠে একথা স্বীকার করে নেওয়া ভাল। মানব পরিজ্ঞাত সকল সত্যই জ্ঞাতা জ্ঞেয়ের অদ্বৈত বন্ধনে জড়িত, জ্ঞেয়ের অস্তরূপই সত্য, জ্ঞাতার চেতনা তারই একটা প্রকাশমাত্র এ মনে করলে যেমন ভুল, তেমন জ্ঞাতার ব্যক্তিগতবোধের সংকীর্ণ পরিমণ্ডলীতে জগতের সুরু ও সমাপ্তি একথা শেষ বিচারে দাঁড়ায় না। জ্ঞেয় বস্তু যেমন পূর্ণসত্য বস্তু হিসাবে রয়েছে, তেমনই জ্ঞাতাও নিজে নিজের দ্রষ্টা নয়, সেই সত্য পদার্থ ও এই দুটির মধ্যে যোগাযোগের রহস্য নিশ্চয়ই এই সৃষ্টির ঘটনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে ও দর্শনকে সেই রহস্যের উদ্ধারের চেষ্টা অন্ততঃ করতে হবে। যারা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়কে, জড় ও মনকে, বস্তু ও চেতনাকে একান্ত পৃথক করে দেখে তাদের পক্ষে এই আদান প্রদানের ব্যাখ্যা করা সত্যই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। জড়বাদীরা জ্ঞাতাকে অন্তর্জগতের বিবর্তনজাত নবরূপপ্রাপ্ত একটা অংশবিশেষ মনে করেন এবং মানুষের ব্যক্তি-স্বরূপ তাঁদের কাছে মানুষের সমাজসত্তার একটা মানসিক প্রতিরূপ মাত্র মনে হয়, ও এজন্য ব্যক্তিস্বরূপকে সমাজসত্তার অতিরিক্ত কোন মূল্য দিতে তাঁরা নারাজ। যাঁরা মূলসত্তার প্রশ্ন পরিহার করতে চান, তাকে জড় কিংবা চৈতন্য কোন কিছু বলতেই অস্বীকার করেন, সেই অজ্ঞেয়বাদীরা মানুষের ব্যক্তিস্বরূপের কোন অখণ্ড আত্মিক রূপ আছে স্বীকার করেন না, তাঁরা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষবাদী এবং বাইরের জগৎ ও অন্তর জগৎ উভয়ই তাঁদের কাছে ক্ষণিক প্রত্যয় পরম্পরার সমষ্টিমাত্র, বরং বাহ্যজগৎ তাদের কাছে অপ্রত্যক্ষ, আনুমানিক, কারণ তাতে প্রবেশ করতে হলে ইন্দ্রিয়লব্ধ বোধের দুয়ার দিয়ে প্রবেশ করতে হয়, এই দুয়ারই একমাত্র প্রত্যক্ষ, আর অন্তরানুভূতি যদিও বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে সরাসরিই ঘটে থাকে, তবুও মানুষের মনের ক্রিয়ার ধর্ম আনবিক টুকরো টুকরো খণ্ড প্রত্যয়ের সমাবেশেই মন

গঠিত, তাদের মধ্যে একটা পারস্পর্যের ধর্ম থাকলেও, সব কিছুকে ছাপিয়ে এক অখণ্ড নির্বিশেষ মানবসত্তা কিংবা আত্মা বলে কোন কিছু নেই একথাই তাঁরা বলেন। এই প্রত্যক্ষবাদীরা বাস্তব সম্পর্কে মানুষের ধারণাই শোষণ করেন এবং তাঁরা কোন প্রকার নির্বিশেষবাদ, কিংবা একাত্মবাদকে প্রশ্রয় দিতে রাজী নন। এঁরাই কিন্তু ইউরোপ ভূখণ্ডে মানুষের ব্যক্তিত্বকে বিশেষ মূল্য দিয়ে থাকেন এবং এই দাবী তাঁদের কণ্ঠে প্রধানতঃ একটা রাজনৈতিক তথা সামাজিক অধিকারের দাবীর রূপ পেয়েছে। কিন্তু এঁদের এই ব্যক্তিত্বের মূল্যবোধ নিতান্তই সঙ্কীর্ণগোত্র, কারণ তার কোন পারমার্থিক স্বাক্ষর নেই সমাজও এর জনক নয়, বরং সমাজ প্রায় সর্বক্ষেত্রেই এর প্রতিবন্ধক একথাই তাঁরা মনে করেন। শুধুমাত্র মানুষের একটা সীমাবিতরূপ প্রত্যক্ষযোগ্য বলেই কি তাকে মূল্য দেওয়া চলে? আর বিজ্ঞানে ব্যক্তিস্বরূপের কোন মূল্য আছে কি? পদার্থ বিজ্ঞানকে আদর্শ হিসাবে ধরে তার প্রণালী সর্বত্র প্রয়োগের চেষ্টায় যে "সায়েন্টইজম" অথবা বিজ্ঞানস্বস্তুতার সৃষ্টি হয়েছে তাতে তো মানুষ সম্বন্ধে বলে "ডগ ডিউ" অথবা "রোডেন্ট ডিউ" দেওয়া হয়েছে এবং কতিপয় বৈজ্ঞানিক মানুষ ঈশ্বর জগতের সোলকর্তাধার কি রকম ব্যবহার করে তা যেন লক্ষ্য করছেন। ইলেকট্রন মস্তিষ্কের নির্মাতা বৈজ্ঞানিকের দল অত্যাশ্চর্য মানসিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের মনকে অস্বীকার করে তাকে যন্ত্রের সামিল বলে প্রচার করবার চেষ্টা করেছেন। ধর্ম আজ এই পৃথিবীতে উপহাসের পদার্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার সহস্র দোষ থাকা সত্ত্বেও মানব সভ্যতায়, মানব সংস্কৃতিকে তার যে বিশিষ্ট দান রয়েছে তাকেও যেন অস্বীকার করবার মনোভাব অনেক মহলে উদগ্র হয়েছে। ইউরোপে ব্যক্তিস্বরূপের ধারণা যে খৃষ্টধর্মের দান, তাকে মূল্য দিতে যে খৃষ্টধর্মই শিখিয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রাচীন সভ্যতায়, গ্রীসে, ভারতবর্ষে, চীনে একটা অমোঘ বিশ্ববিধানের ধারণাই প্রবল ছিল, মানবজীবন, তার সমাজ সংগঠনকে এই বিধানচালিত বিশ্ব থেকে কখনই আলাদা করে দেখান হত না, ব্যক্তিকে সমাজ থেকে আলাদা করে দেখার নিয়মই ছিলনা। ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক মুক্তিসাধনা ব্যক্তিকে অবকাশ দিয়েছিল এবং ইউরোপে খৃষ্টধর্মের আবির্ভাবে ব্যক্তিমানুষ সেই অবকাশ পায়। But in the early centuries when Christianity was struggling for existence, the

Emperors were right in regarding the Christian teaching as subversive and revolutionary, if not anarchic. Carrying to extremes the personal side of religion already revealed in the greatest poets of judaism, it made the relation of each separate soul to God the centre of its purport. Compared to a secret and spiritual grace of heart matters of ritual, authority, and external observance rightly appeared trivial. .....That was the astonishing discovery in which lay the vital germ of Christianity's finest influence on the world Law must be made for man, not man for law. The soul stood isolated and immortal in the presence of the Eternal as her one arbiter, whether for conduct or belief. The appeal no longer lay to person but to God." আ বারিওঁ তাঁর "True Humanism" গ্রন্থে লিখেছেন, For mediaeval thought man was also a person; and one may observe that this notion of person carries a christian hall-mark, so to say, since it owes its evolution and its definition to theology. A person is a unity of a Spiritual nature endowed with freedom of choice and so forming a whole which is independent of the World, for neither nature nor the state may invade this unity without permission. God himself, who is and who acts from within, acts there in a particular way and with a supremely exquisite delicacy, a delicacy which shows the value, He sets on it. He respects this freedm, in the heart of which nevertheless He lives. He solicits it, but He never compels". জগতে মানুষের অস্তিত্বের চূড়ান্ত কোন মূল্য খুঁজে না পেলে মানুষের ব্যক্তিস্বরূপের কোন মূল্য থাকতে পারেনা, ব্যক্তিমানুষকে পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুকণার অকিঞ্চিৎকর সাময়িক একটা বুদবুদ ছাড়া ভাবা চলেনা। মানুষকে এবং জগতকে কোন পরমার্থ সত্তার বিধৃত সামঞ্জস্যতার আলোকে বিচার করলে হয়ত এর মূল্য শেষ পর্যন্ত দেওয়া যেতে পারে।

পরিশিষ্ট

এমন বিশেষজ্ঞ অদ্যাবধি সন্ধেহ নেই। কোন জ্ঞাতব্য বিষয়কে শতটুকরোয় ভেঙে, সেই ছোট ছোট টুকরোগুলিকে ভাল ভাল করে জেনে শতজন টুকরো বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের রাজত্ব দখল করে বসে আছেন এবং আমরা যদি বিশেষজ্ঞ

না হই তবে কোন বিষয়ে মুখ খুলব তার জো কি, সন্দেহ নিরসনার্থে বিশেষজ্ঞদের দরবারে আমাদের হাজিরা দিতেই হবে। মানুষের এই দিগ্বিদিক করে, বিশ্লেষণ করে দেখার বাহাদুরী স্বীকার করে নিয়েও আমরা বলতে পারি এই সমস্তই উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য কিন্তু হওয়া উচিত মানুষকে জ্ঞানরাজ্যের একটা গাণিতিক ধারণা দিয়ে এক পরিপূর্ণ বিশ্বাস গঠনে সাহায্য করা, কারণ এই বিশ্বাস ব্যতিরেকে ব্যক্তিমানুষের জীবন তো বটেই, এমন কি সমাজ ও সভ্যতাও কাণ্ডারীহীন তরণীর দশা প্রাপ্ত হয়। মানুষ চিরকালই জানতে চেয়েছে, "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম"—আর এ যুগে আমরা যদি কোন দেবমূর্তি আমরা পূজা করব একথা বলি, তবে বিশেষজ্ঞরা নিঃসন্দেহে "a heap of broken images" এনে আমাদের কাছে স্তূপ করে রাখবেন। সেই আকার প্রকারহীন প্রস্তরস্তূপ বিশেষজ্ঞদের কালাপাহাড়ী বৃত্তির জয়জয়কার ঘোষণা করলেও মানুষের মনের চূড়ান্ত দাবীর আশ্রয় হতে পারেনা এবং মানুষ তার মনের দাবীর জোরে বিশেষজ্ঞদের অগ্রাহ্য করে মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে নিজস্ব চিরন্তন পন্থায় জানবার, ভাববার অনুভব করবার চেষ্টা করবে। এই বিশ্বাসের জোরেই আমরা অবিশেষজ্ঞ লেখকের দল, সমাজতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদিতে বিশেষজ্ঞ না হয়েও মানুষের যে সব দিক এইসব শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়, সেই সম্পর্কে নিজস্ব ভাবনা, অনুভূতিকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করি। তাছাড়া আর একটি প্রশ্নও রয়েছে। আমরা স্বভাবতই দাবী করতে পারি বিশেষজ্ঞরা এইসব আলোচনার পূর্বে মানুষ সম্পর্কে কোন মৌলিক ধারণা পোষণ করে কাজ শুরু করেন কিনা? জ্ঞাতা মানুষের মন কখনই একটা যন্ত্র হতে পারে না, যার ধর্মই হচ্ছে বাহ্যবস্তুকে যথাযথ প্রতিফলিত করা, যার মধ্যে প্রতিফলনের পূর্বে, বস্তুর সম্মুখীন হবার পূর্বে কোন কিছুরই প্রতিবিম্ব পড়েনা। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ধারণা করবার চেষ্টা করব, ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষা তত্ত্ব, আচরণবাদ ইত্যাদিতে মানুষ সম্বন্ধে কোন মৌল প্রত্যয় নিহিত রয়েছে কিনা। ফ্রয়েড তাঁর একটি রচনায় তাঁর গোটা জীবনদর্শন কি সেই সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁকে এই বিষয়ে "Positivist" বলা চলতে পারে, কারণ তিনি সব বিষয়ে আমাদের তার বিজ্ঞানের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন এবং এইসব সম্পর্কে বিজ্ঞানের দেওয়া খবরই তাঁর কাছে একমাত্র নির্ভরযোগ্য খবর, তার উপর নির্ভর করেই তিনি জগৎ ও জীবন

সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা গঠন করার প্রয়াসী। আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গীই "eclecticism" বলে পরিচিত। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে মানুষ সম্বন্ধে যৌল ধারণা জৈববিজ্ঞানের উপরই প্রতিষ্ঠিত, মানুষ অন্য জীববিবর্তনের একটা ফলমাত্র, তার মূলসত্তা জৈবিক, আত্মিক নয়, আর যা আত্মিক নামে পরিচিত তা জৈবিকসত্তারই একটা রং চঙ্গাম রূপমাত্র। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব বলে এই রং না চড়িয়ে তার উপায় নেই, কারণ তা না হলে মনুষ্য সমাজ জান্তব দাঙ্গাহাঙ্গামির প্রকোপে অচিরাৎ ধ্বংস পেত। সেজন্য মানুষের উপরের রং চঙ্গাম চেহারাটা ঘুচিয়ে ফেলে 'মন্ত্র করে' দেখলে আমরা একটা ক্ষুধাতুর, জীবাতুর জন্তুরই দেখা পাব—যে যৌথ জীবনের ফলে মানুষ শুধুমাত্র জৈব-বিবর্তনের পথ থেকে সরে এসে, সভ্যতা-সংস্কৃতির জটিল বিবর্তনের পথ নিয়েছে : মানুষকে এই আন্তর সত্তা তার পরিপন্থী বলেই মানুষকে এই আন্তর সত্তার উপর সামাজিক সত্তার রং চড়াতে হয়েছে। অনেকের মতে ক্রয়েড শোপেন-হাওয়ারের দর্শন দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। দর্শনে বহুকাল যুক্তিকে, যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে যে মতবাদসমূহ গড়ে উঠেছিল, শোপেনহাওয়ার, নিট্‌শে, হার্টম্যান ইত্যাদি তার প্রতিবাদস্বরূপ, মানুষের ইচ্ছাবৃত্তি, যা মানুষের কর্ম-প্রেরণার উৎস, তাকে সর্বপ্রধান স্থান করে দেন। শোপেনহাওয়ার-দর্শনে "জিজীবিষা"ই (will to live) সমস্ত কিছুর মূলে—কিন্তু এই জিজীবিষার ফলে মানুষ স্বাধীনতা অর্জন না করে প্রকৃতির দাসত্ব করে, তার ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধি করে এই কথাই তিনি বলেছেন এবং ফলে সুখের বোঝা নিয়ে কাজ করলেও শেষপর্যন্ত দুঃখ ও যন্ত্রণাই মানুষের কপালে ঘটে এ কথাও তিনি মনে করতেন। এই জিজীবিষার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে, বিশুদ্ধ বোধিকে জাগ্রত করে নির্বাণমুক্তির অধিকারী হওয়াকেই তিনি কাম্য মনে করতেন। প্রচলিত ধারণা এই যে, এই ব্যাপারে তিনি ভারতীয় উপনিষদ ও বৌদ্ধমতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন—ক্রয়েডের সঙ্গে তার এই ক্ষেত্রে তফাৎ রয়েছে।

বিজ্ঞানে যাকে বলা যেতে পারে, একটা "Reductive procedure"র চেষ্টা আছে, অর্থাৎ কোন উচ্চস্তরের ক্রিয়াকে, কোন নিম্নস্তরের ক্রিয়ার নিরিখে পর্যবসিত করে সেই নিরিখে তার ব্যাখ্যা করার দিকেই বিজ্ঞানের ঝোঁক। পদার্থবিজ্ঞান যেহেতু সর্বাপেক্ষা অগ্রসর বিজ্ঞান সেহেতু পদার্থ

বিজ্ঞানকে ধারণত করে, জৈববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি সবকিছুকে পদার্থগত ব্যাপারমিক নিয়মে কেলার একটা প্রবাস বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দেখা যায়। আচরণবাদীরা মানসক্রিয়াকে শারীরতত্ত্বের নিরিখে বিচার করেন। ওঁদের কাছে মন বলে কোন 'বস্তু' নেই, আছে স্নায়ু ও মস্তিষ্ক সমন্বিত শরীর। এই শরীরের বাহিরের অভিঘাতের ফলে স্বাভাবিক কতগুলি সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে (reflex action), এই স্বাভাবিক সাড়া দেওয়ার ক্ষমতাকে অবস্থান্তরে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করে দেওয়া যায় (conditioned reflex) ও মানুষের মন বলতে যা বুঝি তা এইগুলিরই সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানেও মানুষের দৈহিক, জৈবিক সত্তার অতিরিক্ত কোন কিছুকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি এবং যদিও শ্রেষ্ঠতম আচরণবাদী পাভলভ ব্যক্তিগত জীবনে ঈশ্বরবিশ্বাসী, ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান অনুমোদিত পথেই চলেছিলেন, অতিপ্রাকৃত পথে কোন সত্তাকেই গবেষণার স্থান দেননি। গেশটাল্ট মনোবিজ্ঞানীরা বাহিরের সঙ্গে সংযোগের ফলে মানুষের মধ্যে যে মননক্রিয়া সুরু হয় তাকে স্নায়ু ও মস্তিষ্কের ক্রিয়ার দিক থেকে ব্যাখ্যা করলেও, ওঁরা বহির্জগৎ ও মানুষের মন উভয়কেই একটা সুসঙ্গত সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশেষ সামগ্রিক ক্ষেত্র বলে বিবেচনা করেন ও বস্তু ও মন উভয়ের মধ্যে গঠনের পরিচয় পাওয়াতে বিশ্ব সম্পর্কে ওঁদের ধারণা প্রায় ভাববাদীর কোঠায় পড়ে, ওঁরা বিশ্বে উদ্দেশ্যমূলক শক্তির ক্রিয়া চলছে প্রায় এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান। মানুষের মৌল সত্তা নিছক জৈবিক, জড়ের নিয়মের অধীন, যা মানুষের মধ্যে এমন কোন সত্তা আছে যা জড় ও জৈবিক নিয়মের উর্ধে, জড় ও জৈব অস্তিত্বের যা কর্তাস্বরূপ। তাদের ব্যবহার করেই সেই সত্তা প্রকাশমান, আর সেই সত্তা বিশ্বের মূলাধার চিৎ সত্তারই থেকে উদ্ভূত—এই প্রশ্নই মূল প্রশ্ন, একে এড়িয়ে মনস্তত্ত্বসম্মত নিয়ে কোন আলোচনাই শেষ পর্যন্ত সম্ভব নয়। সমস্ত অবস্থাদৈতকে অতিক্রম করে মানুষের মধ্যে এক "উৎসমুখী" সত্তা ক্রিয়াশীল, মানুষের বিকাশের মূলে তারই প্রভাব কাজ করছে, রবীন্দ্রনাথ এবধিব বিশ্বাস পোষণ করতেন ও পার্সোনালিটির সমস্যা তিনি এই পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করেছেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ

শুভজিৎ দাশগুপ্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা বরাবরই সমন্বয়ের কল্পনাতে অভিভূত, সকল বাহ্যিক বিরোধের অন্তঃস্থলে একটি ঐক্যের শক্তি নিত্য সক্রিয়—এ উপলব্ধিতে মহিমান্বিত। সেই একই কবিসত্তাই যে ঐতিহাসিক রবীন্দ্রনাথকেও নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেছে তাতে সন্দেহ কী। কিন্তু কবিসত্তাকে ঐতিহাসিকে রূপান্তরিত করেছে সেসময়ের ঘটনাবলী, যা ছিল একটি কাব্যিক আবেগ তাকে মূর্ত ও তীব্র স্বদেশ-জিজ্ঞাসা করে তোলে তৎকালীন স্বদেশী আন্দোলন।

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঝাঁপ দিয়ে নেমে পড়েন দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে। সবার হাতে রাখী বেঁধে প্রেমের পরিচয় দেবার অপূর্ব কল্পনা করা ওঁর মতো কবির পক্ষেই সম্ভব। রাখী হলো মিলনের প্রতীক। গান বাঁধা হলো, "এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে জয় মা বলে ভাসা তরী।" কিন্তু দেশ যখন বিচ্ছেদের বিষাদে মুহ্যমান তখনও নেতাদের দলাদলি ভেদাভেদ ও সংকীর্ণতায় উত্যক্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথকে অচিরেই সরে দাঁড়াতে হলো সে আন্দোলন থেকে। তিনি অনুধাবন করলেন যে দেশ যেখানে এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত, নানা আত্মঘাতী শক্তিতে বিদীর্ণ সেখানে স্বাধীনতার দাবিও অনর্থক। "একথা বলাই বাহুল্য, যে-দেশে একটি মহাজাতি বাঁধিয়া ওঠে নাই, সে-দেশে স্বাধীনতা হইতেই পারে না। কারণ স্বাধীনতার 'স্ব' জিনিসটা কোথায়? স্বাধীনতা—কাহার স্বাধীনতা? ভারতবর্ষে বাঙালী যদি স্বাধীন হয়, তবে দাক্ষিণাত্যের মাদ্রাজি নিজেকে স্বাধীন বলিয়া গণ্য করিবে না। এবং পশ্চিমের জাঠ যদি স্বাধীনতা লাভ করে, তবে পূর্বপ্রান্তের আসামী তাহার সঙ্গে একই ফল পাইল বলিয়া গৌরব করিবে না। এক বাংলাদেশেই হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান যে নিজের ভাগ্য মিলাইবার জন্য প্রস্তুত, এমন কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।" রবীন্দ্রনাথের মনে এ বিষয়ে কোনও অস্পষ্টতাই ছিল না, যে-বিভেদের উপরে নেতারা দেশের

মঙ্গলের পরিকল্পনা করছিলেন তা একদিন চোরাবালির মতো সমস্ত আশা ও প্রযত্নকে গ্রাস করে নেবে। এই তো সেদিনই রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় পথে পথে গান গেয়ে গেয়ে মিছিল চালনা করেছেন, আবার দু' মাস পরেই তিনি বোলপুরের নির্জনতার আশ্রয়ে লিখেছেন, "বিদায় দেহ ক্ষম আমায়, ভাই। কাজের পথে আমি তো আর নাই।" কী বেদনা! কী হতাশা!

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে নিশ্চেষ্ট বা নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা আদৌ সম্ভব নয়। সেটা তাঁর ধাতেরই বিরুদ্ধে। এক দিকে যখন তাঁর প্রকাশ বাধা পেয়েছে তখন অন্য দিকে তিনি আপনাকে প্রকাশ করেছেন। কোনও অবসাদই তাঁর উদ্যমকে ক্ষয় করতে পারেনি। তের শ' বার বঙ্গাব্দের ফাল্গুনে অগ্রহায়ণ শান্তিনিকেতন থেকে তিনি এক চিঠিতে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখেন, "উন্মাদনার যোগ দিলে কিয়ৎ পরিমাণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেই হয়, এবং তাহার পরিণামে অবসাদ ভোগ করিতেই হয়। আমি তাই ঠিক করিয়াছি যে, অধিকাংশের আয়োজনে উদ্যত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে, আমার এই প্রদীপটিকে জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিব" (রবীন্দ্রজীবনী দ্বিতীয় খণ্ড ১৩২ পৃষ্ঠার উদ্ধৃত)। সেই প্রদীপটি হলো দেশের ভাঙাচোরার মধ্যে সর্বমানবের মিলনের কল্পনা। দেশের সমস্ত বিচ্ছেদ ও বিরোধের যে-শক্তি তার বিরুদ্ধে সেই প্রদীপই হলো রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ।

অশ্বিনি বঙ্গভঙ্গ নামক রাজনৈতিক বিচ্ছেদের চেয়েও সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদ আরও মর্মান্তিক একথা অশ্বিনীকুমার দত্ত, আবদুল রসুল প্রমুখ কয়েকজন দেশপ্রেমিক হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন। এই বিষবৃক্ষকে গোড়া থেকে উপড়ে ফেলবার জন্যে তাঁরা তের শ' তের বঙ্গাব্দে বরিশালে এক প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলন আহ্বান করলেন এবং সেই সঙ্গে ব্যবস্থা করলেন এক সাহিত্য সম্মেলনের। যজ্ঞের মতো এক যজ্ঞে পৌরোহিত্য করবার জন্যে সানন্দে রবীন্দ্রনাথ সাড়া দিলেন। ইংরেজ শাসক এই যজ্ঞ পণ্ড করেই ক্ষান্ত হলো না, কৌশলে বপন করল বিষবৃক্ষের উর্বর বীজ। এবং পরিণামে মুসলিম লীগ স্থাপিত হলো। দেখতে দেখতে বীজ থেকে উদ্গত হলো ভয়ংকর বিষবৃক্ষ। এই সংকটের সামনে কেমন করে রবীন্দ্রনাথ নির্বিকার থাকবেন? তিনি যখন "গোরা" লেখা শুরু করেন তখন তাঁর মাথায় ঘুরছে বিষবৃক্ষের বিভীষিকা। হিন্দু জাতীয়তার ব্যর্থতা ততদিনে তাঁর কাছে স্বতঃসিদ্ধ। জাতীয়তা

ও মানবত্তার বিরোধি যে কোনখানে তা-ও তখন তাঁর চোখে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। তের শ' সোল বঙ্গাব্দে "গোরা" উপন্যাসের উপসংহারে এসে পরেশ বাবুকে গোরা বলছে, "আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোন জাতির কাছে, কোন ব্যক্তির কাছে কোনদিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবল হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।"

কিন্তু ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের বাইরে বিশ্ব-ইতিহাসে এমন কতকগুলি প্রবণতা দেখা দিতে শুরু করেছে যেগুলি রবীন্দ্রনাথকে শঙ্কিত করে তুলতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ বছরে জার্মানিতে প্রকাশিত হয় দার্শনিক হৌস্টুস্ থেমারলেস্ রচিত "ঊনবিংশ শতাব্দীর ভিত্তি" এবং ক' বছর পরে তা ইংরেজিতে অনূদিত হয়। সে-বই ঊনবিংশ শতাব্দীর ভিত্তি হিসেবে যা-ই প্রমাণ করে থাকুক না কেন তা যে নর্ডিক্ জাতির শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান ও শক্তির দম্ভকে প্রতিষ্ঠা করেছে তাতে সন্দেহ নেই। অথচ এই শ্রেষ্ঠ ও শক্তিমান জাতিই কিনা শিল্পপণ্যের বাজারের পাল্লায় ইংরেজ ফরাসী প্রভৃতি জাতির থেকে পিছিয়ে রয়েছে! এর প্রতিকার হলো বিসমার্ক প্রদর্শিত পন্থা, অর্থাৎ দারকে লেজা উপনিবেশ। বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা ও জাতিবৈরিতার ইউরোপ তখন দ্রুত পদক্ষেপ এগিয়ে চলেছে সাংঘাতিক বিস্ফোরণের মুখে।

আর সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চেতনায় হিন্দু, দেশ, জাতি ইত্যাদির অর্থও দ্রুত পালটে যেতে থাকে। "গোরা" শেষ করবার তিন বছর পরে হিন্দু কথাটির অর্থ তাঁর কাছে কোনও একটি ধর্ম রইল না। তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন, "হিন্দু শব্দে এবং মুসলমান শব্দে একই পর্যায়ের পরিচয়কে বুঝায় না। মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম কিন্তু হিন্দু কোন বিশেষ ধর্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি জাতিগত পরিণাম।" ইউরোপে জাতিতত্ত্ব যখন একটা পরাক্রান্ত রূপ নিয়ে আবির্ভূত তখন রবীন্দ্রনাথের কাছে হিন্দু শব্দটার অর্থ একটা জাতিতে পরিণত হয়েছে। হিন্দু জাতির সাধনা ও লক্ষ্য কী? এই প্রশ্নটির জবাবই তিনি দিয়েছেন "ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা" ও "A Vision of India's History"-তে। ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে উঠে বিরোধে উন্মত্ত বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করেছেন সমগ্র মানব-বংশের মেধা ও লক্ষ্য। এই দিক্‌নির্দেশেই ঐতিহাসিক রবীন্দ্রনাথের যাথার্থ।

রবীন্দ্রনাথ : শিল্পপ্রচেষ্টার প্রথম উন্মেষ

সমরেন্দ্রনাথ রায়

রবীন্দ্রনাথ কবি। কবির জীবনী তাঁর কাব্যের ইতিহাস। তাঁর সাহিত্য কীর্তি বিপুল ও বিশাল, সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর গতি ছিল সহজ, স্বচ্ছন্দ ও অবাধ। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ সর্বত্রই উপস্থিত ছিলেন বাঙ্‌ময় হয়ে। তাঁর সাহিত্য জীবন ও কাব্য জীবনের মধ্যে মূলতঃ কোন প্রভেদ নাই।

অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণের সাহায্যে মধ্যাহ্ন সূর্যের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা চলছে এবং চলতে থাকবে, কিন্তু ধরণীর প্রথম প্রকাশের কাহিনীও কম কৌতূহলের বিষয় নয়। প্রথম মানবসৃষ্টির ইতিকথার মতই কবি মানসের প্রথম উষাকালও সমান আলো আঁধারে ঢাকা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যশক্তি কখন কিভাবে বিকশিত হ'য়ে উঠেছিল, সেই ইতিহাস সন, তারিখ দিয়ে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। তাঁর 'জীবনস্মৃতি' এই অন্ধকারে খানিকটা আলোক-পাত করতে পারে মাত্র। কিন্তু "জীবনস্মৃতি জীবনের ইতিহাস নয়—তাহা কোন এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্মরণের ছটা···পটের উপর যে ছাপ পড়িয়াছে তাহা আদালতে সাক্ষ্য দিবার কাজে লাগিবে না।"

নীহারিকা যুগ (১২৬৮–১২৮০)

১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ তাঁর জন্মদিন থেকে ১২৮০ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যজীবনের নীহারিকা যুগ। ভেতরে সৃষ্টির কাজ চলছে কিন্তু তখনও কিছু একটা আকার ধারণ ক'রে ধরা ছোঁয়ার মধ্যে আসেনি। "স্বত্যন্ত্রাজক তন্ত্রে"র গতিবন্ধনে আবদ্ধ "খাঁচার পাখী" দোতালার দক্ষিণ-পূর্ব কোণের একখানা ঘরের জানালার শিকগুলি দিয়ে বাহির প্রকৃতির কাছ থেকে প্রথম পাঠ গ্রহণ করছে। ঘাট বাঁধানো পুকুর, প্রাচীরের প্রকাণ্ড চীনা বট, রাজহাঁস ও পাতিহাঁসের "চঞ্চুচালনা"—দেখতে দেখতে যেন "স্বপ্নযুগের একটা অনন্তরের রাজত্বে" চলে যেতেন। "খাঁচার পাখীর সঙ্গে বনের পাখীর চঞ্চুতে চঞ্চুতে পরিচয় চলত।"

অক্ষর পরিচয়ের পূর্বে শিশুর শিক্ষা সুরু হয় ছড়া ও রূপকথার অরূপ

রাজো……"শিশুকবি শিশুশিক্ষার প্রথম পাঠ লইয়াছিলেন এই ছড়ার ছন্দ হইতে" (রবীন্দ্র জীবনী ১ম খণ্ড পৃঃ ২৬) "রূপকথার সুন্দর মিথ্যাটুকু শিশুর মত উলঙ্গ, সত্যের মত সরল, সদ্য উৎসারিত উৎসের মতো স্বচ্ছ, আর এখনকার দিনের সুচতুর গদ্য ঘুরেশ-পরা মিথ্যা" (অসমাপ্ত গল্প-রবীন্দ্রনাথ)। বাড়ীর খাজাঞ্চি ছিলেন কৈলাশ মুখুজ্জে "সেই কৈলাশ মুখুজ্যে আমার শিশুকালে অতিরিক্ত মেগে মত একটা ছড়া বলিয়া আমার মনোরঞ্জন করিত"। সেই ক্রতলয়ে উচ্চারিত অনর্গল শব্দচ্ছটা এবং ছন্দের দোলা ছিল শিশু রবির এতত আকর্ষণের বিষয়। মহাভারত, রামায়ণের পাঠ দিয়েছিলেন প্রাক্তন গ্রাম্য শুরুমশায় অধুনা তৃতীয়রাজক-তন্ত্রের অন্যতম শাসনকর্তা "ঈশ্বর"এর নিকট থেকে। "ক্ষীণ আলোকে ঘরের কড়ি-কাঠ পর্যন্ত মত মত ছায়া পড়িত, টিমটিমি দেওয়ালে গোকা ধরিয়া খাইত, চামচিকে বাহিরের বারান্দায় উদ্ভট ধরণের মতো ক্রমাগত চক্রাকারে ঘুরিত আমরা স্থির হইয়া বসিয়া হাঁ করিয়া শুনিতাম"। আর কিশোরী চাটুয্যে মশাই শোনাতেন দাশু রায়ের পাঁচালী—

"ক্রতলয়ে আউড়ে যেত সব কুশের ছড়া,
থাকত আমার খাতা লেখা, পড়ে থাকত পড়া।

(বালক—ছড়ার ছবি)

"অনুপ্রাসের ঝকমকি ও ঝঙ্কারে" শিশু রবীন্দ্রনাথ "একেবারে চতুর্ভূত" হ'য়ে যেতেন। "ছেলেবেলার দিকে যখন তাকানো যায় তখন সব চাইতে এ কথাটা মনে পড়ে যে, তখন জগৎটা এবং জীবনটা রহস্যে পরিপূর্ণ। সর্বত্রই যে একটা অজানার আছে এবং কখন যে তাহার দেখা পাওয়া যাইবে তাহার ঠিকানা নাই এ কথাটা প্রতিদিনই মনে আসিত।"

রবীন্দ্রনাথ যখন জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন তখন বাংলা দেশে নবজাগরণের প্রবল জোয়ারের বেগ। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী তার অন্যতম কেন্দ্রস্থল। "যেদিকে তাকাই সেদিকে চিত্রে সাহিত্যে ধর্মে স্বাদেশিতায়" একটা সর্বাঙ্গ সুন্দর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠেছিলেন তাঁরা। যুগের প্রভাব, ঠাকুরবাড়ীর সাহিত্যিক ও আর্টিষ্টিক আবহাওয়া রবীন্দ্রনাথের চিন্তার জগতে প্রগাঢ় ছাপ ফেলেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক উর্বর কল্পনাপ্রবণ মনকে "ছড়া ও রূপকথার অরূপ রাজ্য" প্রথম কবিত্বরসে দীক্ষা দিয়েছিল এও অস্বীকার করা যায় না।

অক্ষর পরিচয় হ'ল, হাতে এল বিদ্যাসাগরের "বর্ণ পরিচয়"১। শিশিত জগতের সঙ্গে কবির এই প্রথম পরিচয়।

"কেবল মনে পড়ে 'জলে পড়ে পাতা নড়ে' আমার জীবনে এইটেই আদি কবির প্রথম কবিতা।" কবিতার মিল আছে বলিয়াই কথা শেষ হইয়াও শেষ হয় না—তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ঝঙ্কারটা ফুরায় না—মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল" "শিশুকালের সাহিত্য রস সম্ভোগের এই দুটো স্মৃতি এখনও জাগিয়া আছে···'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান' ঐ ছড়াটা যেন শৈশবের মেঘদূত।"

কবিতার হাতেখড়ি

"আমার বয়স তখন সাত আট বৎসরের বেশী হইবে না। আমার এক ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ২ আমার চেয়ে বয়সে বেশ একটু বড়। ···একদিন দুপুর বেলা তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন তোমাকে পদ্য লিখিতে হইবে। বলিয়া পয়ার ছন্দে চৌদ্দ অক্ষরে যোগাযোগের রীতিপদ্ধতি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। কোন কর্মচারীর কৃপায় একখানি বীল কাগজের খাতা জোগাড় করিলাম।" তাহাতে বহুতে পেন্সিল দিয়া কতকগুলা অনুপ্রাস লাইন কাটিয়া বড়ো বড়ো তাঁতা অক্ষরে পদ্য লিখিতে সুরু করিয়া দিলাম। হরিণ-শিশুর নূতন শিং বাহির হইবার সময় সে যেমন যেখানে সেখানে গুঁতা মারিয়া বেড়ায়, নূতন কাব্যোদ্গম লইয়া আমি সেই রকম উৎপাত আরম্ভ করিলাম।"

প্রথম পাঠ—

"নিজেই তখন লেখক, মুদ্রাকর, প্রকাশক এই তিন-এক একে-তিন হইয়া ছিলাম।·····পদ্যের উপরে একটা কবিতা লিখিয়াছিলাম সেটা বেউড়ির সামনে

---

১ বিদ্যাসাগরের 'বর্ণ পরিচয়' পুস্তকেই রবীন্দ্রনাথ "জল পড়ে পাতা নড়ে" পড়েছিলেন কিনা সন্দেহের বিষয়। দ্রঃ প্রবোধচন্দ্র সেন কৃত 'জীবনস্মৃতি'র সমালোচনা, কবিতা ১৩৪১ পৃঃ ২৭০–৭২।

২ শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৫৫-১৯১৯) পুত্রতুল্যো ভ্রাতা ভূদেবচন্দ্রমাধের জ্যেষ্ঠা কন্যা কাদম্বিনী দেবীর পুত্র।

দাঁড়াইয়াই উচ্চকণ্ঠে নবগোপাল বাবুকে৩ শুনাইয়া দিলাম। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, বেশ হইয়াছে,—"

প্রথম কবিতা

"সাতকড়ি দত্তও মহাশয়···আমাকে উৎসাহ দিবার জন্য মাঝে মাঝে দুই এক পদ কবিতা দিয়া তাহা পূরণ করিয়া আনিতে বলিতেন। তাহার মধ্যে একটি আমার মনে আছে :

রবিকরে আলাতন আছিল সবাই
বরষা তরষা দিল আর ভয় নাই।

ইহার পরে যে পদ জুড়িয়াছিলাম তাহার কেবল দুইটা লাইন মনে আছে।

মীনগণ দীন হয়ে ছিল সরোবরে
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।

আর একটি কোন ব্যক্তিগত বর্ণনা হইতে চার লাইন উদ্ধৃত করি—

আমলত সুখে কেলি তাহাতে কমলী বলি,
সন্দেশ মাখিয়া দিবা তাতে—
হাপুস্ হুপুস্ শব্দ চারিদিক নিস্তব্ধ
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।"

প্রথম সাহিত্য রসসম্ভোগ

"ছেলেবেলায় হাতের কাছে বাংলায় লেখা যাহা আসিত তাহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের পাঠ্য। যে কয়খানা বই বালকের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল তাহাদের কথা তাঁহার স্মরণে ছিল, যেমন, মৎস্যনারীর কথা, সুশীলার উপাখ্যান ও রবিন্‌সন ক্রুসোর কথা।"

পত্রিকার মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "বিবিধার্থ সংগ্রহ" ও "অবোধবন্ধু

---

৩ শ্রীনবগোপাল মিত্র—হিন্দুমেলার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ন্যাশনাল পেপার নামে ইংরাজী সাপ্তাহিকের সম্পাদক।

৪ সাতকড়ি দত্ত মহাশয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক। স্কুলটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক ১৮৫৫ জুলাই ১৭ তারিখে সংস্কৃত কলেজের বাড়ীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

পত্রিকা।" "বঙ্গদর্শনকে যদি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতসূর্য বলা যায় তবে ভুবনমোহন অবোধবন্ধুকে প্রদ্যুম্নের সুকতারা বলা যাইতে পারে।"[৫]

"এই অবোধবন্ধুতে প্রকাশিত বিহারীলালের কাব্যের ঘনিষ্ঠ সঙ্গপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার কবিতাকেই কাব্যাদর্শ করিয়া লইলেন।···ঝরণার ধারে জলসিকরসিক্ত স্নিগ্ধ শ্যামল দীর্ঘ কোমল ঘন কাশের মধ্যে দেহ নিমগ্ন করিয়া নিস্তব্ধভাবে জলকলধ্বনি শুনিতে পাওয়ার কল্পনাও বালককে মুগ্ধ করিত। আর একটু বড়ো বয়সে 'বঙ্গদর্শন' (১২৭৯); তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স এগারো।" "পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি···কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য।"[৬]

প্রথম সংগীত (১২৭৯)

শিশুকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ সুকণ্ঠ ছিলেন। "কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না"। আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী (১৮১৯—১৯০১) ছিলেন তাঁর প্রথম সংগীত গুরু। "১২৭৯ সালের ১১ই মাঘ তারিখে ৪০ তম মাঘোৎসবের সময় সুধাবর্ষী বালক বালিকারা মধুর স্বরে নূতন দুইটি সংগীত করিলেন' গান দুইটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচিত 'শঙ্কর শিব সংকটহারি' ও বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় কৃত 'জয় জগ জীবন জীবন পাতাহে'[৭]। রবীন্দ্রনাথ বালক বালিকাদের মধ্যে ছিলেন বলিয়া মনে হয়। বৃদ্ধ বয়সে এই গানের সুর তাঁহার মনে ছিল"।

শান্তিনিকেতনের সঙ্গে প্রথম পরিচয়—

১২৭৯ সালের ২৪শে মাঘ তারিখে রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন হয়।[৮] কয়েকদিন

---

৫ আধুনিক সাহিত্য পৃঃ ১৮

৬ বঙ্কিমচন্দ্র—আধুনিক সাহিত্য

৭ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—ফাল্গুন পৃঃ ১৮১

৮ ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান, উপনয়ন, দশাবর্তন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১২৭৯ চৈত্র পৃঃ ২০৩-৬

পরেই পিতার সহিত হিমালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথে ফাল্গুন মাসের শেষ পর্যন্ত বোলপুরে বিশ্রাম করেন। এই তাঁর প্রথম কলকাতার বাইরে যাত্রা ও শান্তিনিকেতনের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। "শান্তিনিকেতনে এসেই আমার জীবনে প্রথম সম্পূর্ণ ছাড়া পেয়েছি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে।"[৯]

প্রথম কাব্য রচনা

প্রথম শান্তিনিকেতনে বাস কালে (১২৭৯ ফাল্গুন) শুধু কবিতা লেখা নয়, নিজের কল্পনার সম্মুখে নিজেকে কবি রূপে খাড়া করবার জন্য একটা চেষ্টা চলছিল এবং এইখানেই "তৃণহীন কঙ্কর শয্যায় বসিয়া রৌদ্রের উত্তাপে 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' বসিয়া একটি বীর রসাত্মক কাব্য লিখিয়াছিলাম। তাহার প্রচুর বীররসেও উক্ত কাব্যটাকে বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই"।

প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ

সীতানাথ ঘোষ[১০] সামান্য যন্ত্র যোগে প্রাকৃত বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। "দুধের মধ্যে জল মিশিয়াটা যে একটা স্বতন্ত্র বস্তু, জ্বাল দিলে সেটা বাষ্প আকারে মুক্তি লাভ করে বলিয়াই দুধ গাঢ় হয় একথাটাও যেদিন স্পষ্ট বুঝিলাম সেদিনও তারি আনন্দ হইয়াছিল। অঘোর বাবু শিক্ষাকে সরল করিবার জন্য ইংরেজী পড়ানোর অবকাশে অমি বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। তার বিদ্যা জোড়া একটি নরকঙ্কাল কিনিয়া আনিয়া আমাদের এই ইস্কুল ঘরে লটকাইয়া দেওয়া হইল।" এই ভাবেই বাল্যকালেই বৈজ্ঞানিক চিন্তার অঙ্কুর তাঁর মনের মধ্যে রোপণ করা হয়েছিল। ১২৮০ সালের বৈশাখ মাসে হিমালয়ের বক্ষোটা শিখরে বাস করবার সময়ে "পিতার সাহচর্যে বালকের আর একটি বিষয়ের প্রতি অনুরাগ উদ্দীপ্ত হইল। সেটি হইতেছে জ্যোতিষ শাস্ত্র। মহর্ষি পুত্রকে প্রক্টরের[১১] রচিত সরল পাঠ্য ইংরেজি জ্যোতিষের বই হইতে অনেক

৯ আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা, প্রবাসী ১৩৪০ আশ্বিন।

১০ সীতানাথ ঘোষ ১২৪৮-৯০। ভুলক্রমে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে সীতানাথ দত্ত লিখেছেন। ইনি এক সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন।

১১ R. A. Proctor (1837-88) রচিত Half hours with Telescope (1868) অথবা The orbs around us (1872)

বিষয় মুখে মুখে বুঝাইয়া দিতেন, বালক তাহা বাংলায় লিখিতেন১২। এ সকল প্রবন্ধ বা প্রবন্ধ কথা ছলে প্রকাশিত হয়। "বিশ্বপরিচয়" প্রকাশ করেন তাঁর মৃত্যু বছরে, ১৩৪৪ সালে।

এ পর্যন্ত যে ঘটনাগুলো উল্লেখ করা গেল, সেগুলো প্রধানত রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতি' থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এ সবই স্মৃতি মাত্র, ইতিহাস নয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না। তাঁর আদি রচনার যে নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তাও অনুমানসাপেক্ষ। এগুলো পত্রিকা ও কোন না কোন গ্রন্থে ছাপা হ'য়েছিল ঠিকই কিন্তু রবীন্দ্র নামাঙ্কিত হ'য়ে প্রকাশিত হয় নি। বাইরের প্রমাণের উপর নির্ভর করে তাঁর রচনা বলে মেনে নিতে হয়েছে।

প্রথম-ঋ-নামে প্রকাশিত কবিতা, অগ্রহায়ণ ১২৮১

হিমালয় থেকে ফিরে এসে "খুব সম্ভব ১২৮০ সালে শীতকালে" (রবীন্দ্র-জীবনী ১ম খণ্ড পৃঃ ৪০) "অভিমান" নামে একটি কবিতা লেখেন। ১২৮১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের রচনা বলে প্রকাশিত হয়। প্রকাশকালে বালকের বয়স এগার বৎসর সাত মাস। রচনাটির প্রথম স্তবক উদ্ধৃত ক'রে দেয়া হ'ল :

জন্ম মরণোন্মুক্তকর উচ্চ অভিলাষ,
তোমার বন্ধুর পথ অনন্ত অপার।
অতিক্রম করা যায় যত পাষাণালা,
তত যেন অগ্রসর হতে ইচ্ছা হয়। ১৩

প্রথম অনুবাদ

জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য১৪ বালকদের রুচিমত সাহিত্য রস পরিবেশনের জন্য "কুমার সম্ভব" কাব্য ও "ম্যাকবেথ" নাটক পড়াতে শুরু করলেন। এই

---

১২ জ্যোতিষ সম্বন্ধে এই বালোচিত রচনা বোধ হয় কোন পণ্ডিত কাটিয়া ছাঁটিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করেন। দ্রঃ শনিবারের চিঠি ১৩৩৮ কার্তিক।

১৩ দ্রঃ শনিবারের চিঠি ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ।

১৪ আনন্দ চন্দ্র বেদান্তবাগীশের পুত্র। ১২৭৩ সালে রবীন্দ্রনাথের গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত হন।

সেই জ্ঞানচন্দ্র বালক রবীন্দ্রনাথকে অনুবাদে দীক্ষা দেন এবং সমস্ত কুমার-সম্ভব ও ম্যাকবেথ বাংলা কবিতায় অনুবাদ করিয়ে নেন।

মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশনের হেড পণ্ডিত রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য্য পাণ্ডুলিপি সহ লেখককে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট নিয়ে গিয়েছিলেন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৬-৮৯) মহাশয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দুজনেই বালকের অনুবাদ শুনে প্রীত হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে এই তাঁর প্রথম পরিচয়। "সেই অনুবাদের (ম্যাকবেথের) আর সকল অংশই হারাইয়া গিয়াছিল, কেবল ডাকিনীদের অংশটা অনেক দিন পরে ভারতীতে বাহির হইয়াছিল।"১৫ "কুমারসম্ভব" ও "ম্যাকবেথের" অনুবাদের নমুনা যা পর উদ্ধৃত হ'ল :

কুমারসম্ভব—১ম সর্গ

সমর লক্ষ্মন করি মারক তপন
উত্তর অয়ন যবে করিল আশ্রয়,
দক্ষিণের দিক্-বালা প্রাণের হুতাশে
অধীর হইয়া উঠি ফেলিল নিশ্বাস।১৬

ম্যাকবেথ—দৃশ্য—এক। প্রান্তর। বজ্র। তিন জন ডাকিনী।

১ম ডা—এতক্ষণ বোন কোথায় ছিলি ?
২য় ডা—মারতেছিলুম শুয়োরগুলি।
৩য় ডা—তুই ছিলি বোন, কোথায় গিয়ে ?
১ম ডা—দেখ্, একটা মাঝির মেয়ে
সোটাকতক বাদাম নিয়ে
খাচ্ছিল সে কচ্‌মচিয়ে—
কচ্‌মচিয়ে কচ্‌মচিয়ে—
চাইলুম তার কাছে গিয়ে,

---

১৫ জীবন-স্মৃতির পাণ্ডুলিপি। দ্রঃ ভারতী ৪র্থ বর্ষ-১২৮৭ আশ্বিন

১৬ বিশ্বভারতী রবীন্দ্র ভবনে রক্ষিত পুঁথি হইতে প্রাপ্ত অনুবাদ। বিশ্ব-ভারতী পত্রিকা ১ম বর্ষ-১৩৫০ বৈশাখ পৃঃ ৫৮৫-৯১

সোভারহুবী বোলে রেগে
'ভাইমি মাগী যা তুই কেগে' ।১৭

প্রথম কবিতাপাঠ মাঘ ১২৮১

১২৮১ সালের ৩০শে মাঘ তারিখে রবীন্দ্রনাথ "হিন্দুমেলার উপহার" কবিতাটি 'হিন্দুমেলা'র পাঠ করেন১৮। প্রকাশ্যে কবিতা পাঠ তাঁর এই প্রথম, সভা বসে পার্শিবাগানে শোভাবাজারের রাজা কমলকৃষ্ণ দেব সভার দ্বার উদ্ঘাটন করেন, সভাপতি রাজনারায়ণ বসু (রবীন্দ্র জীবনী—১ম খণ্ড পৃঃ ৪৫)। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স তেরো বৎসর আট মাস মাত্র। দু বৎসর পরে যে কবিতা আবৃত্তি করেন, তার কথা জীবন স্মৃতিতে বিস্তৃতভাবেই বলেছেন (রবীন্দ্র জীবনী ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৩)। "লর্ড লিটনের সময় (দিল্লির দরবার সম্বন্ধে) লিখিয়াছিলাম, পদ্যে সেটি পড়িয়াছিলাম গাছের তলায় দাঁড়াইয়া। শ্রোতাদের মধ্যে নবীন সেন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন।"

সর্বপ্রথম স-নামে প্রকাশিত কবিতা ফাল্গুন, ১২৮১

"ছাপার অক্ষরে 'শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' এই নাম-যুক্ত যে কবিতা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়, সেটি হইতেছে 'হিন্দু মেলার উপহার'। কবিতাটি হিন্দু মেলায় (১২৮১ মাঘ ৩০) পঠিত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স তেরো বৎসর আট মাস মাত্র। রবীন্দ্রনাথ জীবন স্মৃতি বা অন্য কোন রচনার মধ্যে এই কবিতা সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নাই।" কবিতাটির একটি স্তবক উদ্ধৃত করা হল।

হিমাদ্রি শিখরে শিলাসন পরি,
গান গাও কবি বীণা হাতে করি—
কাঁপাবে পর্বত শিখর কানন,
কাঁপাবে নীহার, শীতল বায়!

---

১৭ ভারতী—১২৮৭, আশ্বিন।

১৮ "The ninth anniversary of the Hindoo Mela was opened at 4 P.M. on Thursday the 11th instant...Babu Rabindranath Tagore, the youngest son of Babu Debendranath Tagore, a handsome lad of some 15 had composed a Bengali poem on Bharat (India) which he delivered from memory; the suavity of his tone much pleased his audience" : Indian Daily News 1875, 15 Feb.

কবিতাটি ১২৮১ সালের ১৪ই ফাল্গুন ইংরেজি ১৮৭২ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখের দ্বিতীয়িক অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

প্রথম কাব্যরচনা অগ্রহায়ণ ১২৮২

"এমন সময় 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামে এক কাগজ বাহির হইল। কাগজের নামের উপযুক্ত একটি অঙ্কুরোদ্গত কবিও কাগজের কর্তৃপক্ষেরা সংগ্রহ করিলেন।" জ্ঞানাঙ্কুরের[১৯] প্রথম প্রকাশকাল ১২৭৯। ১২৮২ সালের অগ্রহায়ণ মাস থেকে ৪র্থ বর্ষ সুরু হয়। এই সালে 'প্রতিবিম্বের' সঙ্গে মিলিত হ'য়ে কাগজের নাম হয় জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব[২০]। এর প্রথম সংখ্যা থেকেই রবীন্দ্রনাথ 'বনফুল' নামে আখ্যায়িকা কাব্যটি প্রকাশ করতে থাকেন। ১২৮২ সালের আশ্বিন-কার্তিক মাসে ১২শ-১৩শ সংখ্যায় ৮ম অঙ্কে কাব্যটি শেষ হয়। "জ্ঞানাঙ্কুরে যখন 'বনফুল' প্রকাশিত হইল তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স তের বৎসর সাত মাস। অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ কবিকে এই কাব্যখানির রচনাকাল সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি নাকি বলিয়াছিলেন, 'বেশ কিছু দিন আগে' (প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ : রবীন্দ্র পরিচয় : প্রবাসী ১৩২৮, ২য় খণ্ড পৃঃ ৪৯৪) জীবন-স্মৃতির প্রথম খসড়ায় আছে যে পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিয়া 'বনফুল' রচনা করেন। সুতরাং রচনাকালে কবির বয়স তেরো বৎসরের বেশি ছিল না। বনফুলের প্রকাশকাল ১২৮৮।"

প্রথম প্রবন্ধ রচনা (কার্তিক ১২৮৩)

"প্রথম যে গদ্য প্রবন্ধ লিখি তাহাও জ্ঞানাঙ্কুরেই বাহির হয়। তাহা গ্রন্থ সমালোচনা; প্রবন্ধটির নাম, ভুবনমোহিনী প্রতিভা[২১] অবসর সরোজিনী[২২] ও দুঃখ সঙ্গিনী[২৩]। প্রথম গ্রন্থ সমালোচনাটি সম্বন্ধে জীবন স্মৃতিতে কৌতুক ক'রে

---

১৯ জ্ঞানাঙ্কুর—মাসিকপত্র ও সমালোচনা রাজসাহী বোয়ালিয়া (১২৭৯) শ্রীহরদাস, সম্পাদক।

২০ জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব (মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচনা) কলিকাতা ৫৫নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যাশিং লাইব্রেরী। শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

২১ লেখক—নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১২৬০-১৩২৯)

২২ লেখক—রাজকৃষ্ণ রায় (১২৬২-১৩০০)

২৩ লেখক—হরিশচন্দ্র নিয়োগী।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "খুব ঘটা করিয়া লিখিয়াছিলাম। খণ্ড কাব্যেরই বা লক্ষণ কী গীতিকাব্যেরই বা লক্ষণ কী, তাহা অপূর্ব বিচক্ষণতার সহিত আলোচনা করিয়াছিলাম। সুবিধার কথা এই ছিল ছাপার অক্ষর সবগুলিই সমান নির্বিকার, তাহার মুখ দেখিয়া কিছুমাত্র চিনিবার জো নাই লেখকটি কেমন, তাহার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় কত।" প্রবন্ধটিতে লেখকের নাম ছিল না।

প্রথম ছোটগল্প (১২৮৪)

"ছোটগল্প রচনার হাতেখড়ি হয় ভারতীরই প্রথম সংখ্যায়"। ভারতীর প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হয় ১২৮৪ সালের শ্রাবণ। গল্পটির নাম 'ভিখারিনী'। ভিখারিনী গল্প হিসাবে এতই নগণ্য যে রবীন্দ্রনাথ কোন দিন ইহার নাম উল্লেখ পর্যন্ত করেন নাই। "সেটা যে কী বকুনীর বিষ্ণুমি মিশে তার আন্দাজ করবার বয়স ছিল না" (ছেলেবেলা)। অধ্যাপক সুকুমার সেন তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন "বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত ছোটগল্প প্রবর্তিত হয় রবীন্দ্রনাথের দ্বারা। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে যে সকল ছোটগল্প লেখা হইয়াছিল তাহার মধ্যে 'দাসিনী' গল্পটিতে ছোটগল্পের লক্ষণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথের যথার্থ রচনা 'ভিখারিনী' গল্পে ছোটগল্পের ঠাট বজায় আছে" রবীন্দ্রজীবনী-কার প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখছেন "ছোটগল্প রচনায় হিতবাদীতেই রবীন্দ্রনাথের হাতেখড়ি।" একটু চিন্তা করে দেখতে হবে প্রথম হাতেখড়ি কোন্ পত্রিকায় হয়েছিল। ভারতী প্রকাশিত হয় ১২৮৪ সালে, হিতবাদীর প্রকাশকাল ১২৯৮। কথাটাকে আমরা এইভাবে গ্রহণ করতে পারি, ভারতীতে প্রকাশিত 'ভিখারিনী' রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প ; কিন্তু সার্থক ছোটগল্প তিনি প্রথম হিতবাদীতেই লেখেন।

প্রথম উপন্যাস ১২৮৪

ভারতী প্রথম বর্ষ ১২৮৪ সাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ১২৮৫ সালের ভাদ্র মাস পর্যন্ত চলে অসম্পূর্ণ অবস্থায় বন্ধ হ'য়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ এই বৎসরই আশ্বিন মাসে বিলেতের উদ্দেশ্যে রওনা হ'য়ে যান। অসম্পূর্ণ "করুণা" আর কোনদিনই সম্পূর্ণ হয় নি। প্রথম সম্পূর্ণ উপন্যাস "বৌঠাকুরাণীর হাট" চন্দননগরে বোরেন সাহেবের কুঠিতে বাস করবার সময় লিখতে সুরু করেন। ভারতীর কার্তিক ১২৮৮ সাল থেকে আশ্বিন ১২৮৯

সালে পর্যন্ত চলে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১২৮৯ সালের পৌষ মাসে। প্রথম উপন্যাসের সম্মান "করুণা"কেই দিতে হয়।

প্রথম সংগীত রচনা

রবীন্দ্রনাথ প্রথম কোন সংগীত রচনা করেন তা নিয়ে স্বাভাবিক কারণেই বিস্তর মতভেদ আছে। প্রথম দিকের সংগীতগুলি রবীন্দ্র-নামাঙ্কিত কোন গ্রন্থে নেই। গুরু নানক রচিত বহুখ্যাত ভজন—

গগনময় থাল, রবিচন্দ্র দীপক বনে,
তারকা মণ্ডলা জনক মোতি। ইত্যাদি

অরজনবতী। তেওড়া। গানটির বাংলা ভাষান্তর

গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে,
তারকা মণ্ডল চমকে মোতি রে। ইত্যাদি

গানটির রচয়িতা সম্পর্কে নানা সংশয় দেখা যায়। রবীন্দ্র রচনাপঞ্জীতে দেখা যায়—"আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত" ব্রহ্ম 'সংগীত-স্বরলিপি' (দ্বিতীয় ভাগ)২৪ পুস্তকে ইহা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নামে বাহির হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, এটি তাঁহার রচনা।"২৫

এই রচনা ১৭০৬ শকের অর্থাৎ ১২৮০ সালের ফাল্গুনে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' প্রকাশিত হয়। ১২৭৯ সালের ফাল্গুনের শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথের উপনয়নের২৬ পর মহর্ষি পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে হিমালয় ভ্রমণে যান। অমৃতসরে তাঁরা মাসখানেক ছিলেন। স্বর্ণমন্দিরে "গ্রন্থসাহেব" থেকে অখণ্ড পাঠ ও ভজন চলে। মহর্ষি নিয়মিত পুত্রকে সঙ্গে ক'রে মন্দিরে যেতেন। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ এই সময়েই ভজনটি শুনে বাংলায় ভাষান্তর করেন। অবশ্য এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে এটি মূল গানের অনুবাদ মাত্র, নিজস্ব সংগীত সৃষ্টি নয়। এ বিষয়ে ১৩২০ সালের চৈত্র মাসের 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রনাথ-কৃত অমৃতসর গুরুদরবারের প্রচলিত ভজন—

---

২৪ ব্রহ্ম সঙ্গীত গ্রন্থে, শীতবিতানে সংকলিত অংশের অতিরিক্ত আরও বারো ছত্র দেখা যায়। সংকলক—কালাশীচরণ সেন।

২৫ শনিবারের চিঠি ১৩৪৬ মাঘ, পৃঃ ৫৯০

২৬ ১২৭৯ সালের ২৫শে মাঘ।

(সিন্ধুড়া—তেতালা)

এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর।
তোমো চরণপর দিনু নারে। ইত্যাদি গানটির
এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর
মস্তক নমি তব চরণ-'পরে। ইত্যাদি অনুবাদটি লক্ষণীয়।

" 'অল অল চিতা দ্বিগুন দ্বিগুন' তাহার পরবর্তী স্বাধীন রচনা বলিতে হইবে। উহা ১২৮২ সালের মধ্যেই রচিত"। গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকের জন্য রবীন্দ্রনাথ রচনা ক'রে দেন। রচনাকালে তাঁর বয়স ষোল বৎসর ছিল। 'সরোজিনী'র প্রকাশ কাল ১২৮২ সালের ১৫ই অগ্রহায়ণ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "আত্মজীবনী"তে গানটি রবীন্দ্রনাথের বলে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, "রবীন্দ্রনাথ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই 'অল অল চিতা' এই গানটি রচনা করিয়া আমিয়া আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন।

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।"

গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণে২৭ প্রথম মুদ্রিত হ'য়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ -সম্পাদিত 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা'র ১৩১২ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় স্বরলিপিসহ রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে পুনঃপ্রকাশিত হয়। "ভারতীয় সংগীত মুক্তাবলী"২৮ গ্রন্থে উক্ত গানটিকে রবীন্দ্রনাথের রচনা বলেই বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতেও গানটির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু নিজের রচনা কিনা সে সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন "গানটি যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা, ইহা আমরা কবির নিজের মুখেই শুনিয়াছি"২৯। শ্রীশান্তিদেব ঘোষের সাক্ষ্যও অনুরূপ৩০। কিন্তু গানটি কবে রচিত এ সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হওয়া যায় না। গানটি সঙ্গীতমী সভায়

---

২৭ পুরুবিক্রম নাটকের প্রথম প্রকাশ কাল ১২৮৬ সাল

২৮ নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ২য় সংস্করণ ১২৯১, পৃঃ ৪৪ দ্রঃ শনিবারের চিঠি ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ, পৌষ

২৯ রবীন্দ্র গ্রন্থ-পরিচয়, প্রথম সংস্করণ, পৌষ ১৩৪৯

৩০ "রবীন্দ্রনাথের একটি গান" দেশ, ২৬শে চৈত্র ১৩৫০

সম্বন্ধের অতি পরিচিত ছিল, জীবন স্মৃতি গ্রন্থে এর সাক্ষ্য আছে। রবীন্দ্র-জীবনী-কার এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর ভারতীয় আলোচনা অধ্যায়ের পূর্বে বাংলোনিকতা ও সঙ্গীতময়ী সত্তা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। ভারতীর প্রকাশকাল ১২৮৩ সালের শ্রাবণ মাস থেকে, সুতরাং গানটির রচনা তার পূর্বেই হওয়া সম্ভব। তবে কত আগে তা অনুমান করা কঠিন। ইতিপূর্বে যে গান তিনটির আলোচনা করা হ'ল তার একটিও রবীন্দ্র নামাঙ্কিত হ'য়ে প্রকাশিত হয় নি। "মেঘলা দিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ীর ভিতরের একটি ঘরে মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা শ্লেট লইয়া লিখিলাম 'গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে'।" এটি ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর প্রথম কবিতা। কিন্তু কবিতাটি ভারতীর প্রথম বর্ষ ১২৮৪ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তার পূর্বে ঐ সালেরই ভারতীর আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়

সজনি গো আঁধার রজনী ঘোর ঘনঘটা চমকিত দামিনী রে,

রবীন্দ্র নামাঙ্কিত রচনার মধ্যে প্রথম লিখিত গান "সহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে" এবং প্রথম প্রকাশিত গান "সজনি গো—আঁধার রজনী" এই মীমাংসায় আসা যেতে পারে।

প্রথম জাতীয় সংগীত ১২৮৪

রবীন্দ্রনাথের প্রাচীনতম জাতীয় সংগীত সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। "অয়ি অয়ি চিতা বিগুণ বিগুণ" (১২৮২) ও "একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন" (১২৮৩ ?) সম্বন্ধে প্রথম সংগীত রচনা অংশে আলোচনা করা হয়েছে। এই সময়ের আরও দুইটি জাতীয় সঙ্গীত রচনা পাওয়া যায়, একটিও রবীন্দ্র নামাঙ্কিত নয়। 'জাতীয় সঙ্গীত' গ্রন্থে[৩১] "ভারত রে তোর কলঙ্কিত পরমাণু রাশি" গানটি প্রকাশিত হয়। রচয়িতার কোন নাম নেই; কিন্তু 'ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী' গ্রন্থে গানটি রবীন্দ্রনাথের বলেই বলা হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের 'পুরুবিক্রম' (১২৮২) নাটকে গানটি আছে। আর একটি গান সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। গানটি লেখা হ'য়েছিল ১২৮৩ সালে হিন্দুমেলা উপলক্ষে। "অয়ি বিষাদিনী বীণা" গানটিও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' নাটকে আছে। দুর্গাদাস লাহিড়ী কর্তৃক সম্পাদিত 'বাঙ্গালীর

৩১ জাতীয় সংগীত (প্রথম ভাগ) ১ম সংস্করণ ১২৮২ ফাল্গুন

গান' গ্রন্থে৩২ এটি রবীন্দ্রনাথের নামেই সুর তালের উল্লেখসহ মুদ্রিত আছে। আলোচ্য গানগুলির একটিও রবীন্দ্রনাথের নামে প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু তাঁরই রচিত বলে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। রচনাকাল কোনটিরই জানবার উপায় নেই। প্রকাশকাল ধরলে "জল জল চিতা" গানটিকেই প্রথম জাতীয় সংগীত বলতে হয়। তবে রবীন্দ্র-নামাঙ্কিত প্রথম প্রকাশিত জাতীয় সংগীত "তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ" এটি প্রকাশিত হয় ভারতীতে ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা ১২৮৪ সালের আশ্বিনে।

প্রথম অভিনয় ১২৮৪

"নাট্যঘরে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ হইবার পূর্বে জ্যোতিদার 'এমন কর্ম আর করব না', প্রহসনে আমি অলিক বাবু সাজিয়াছিলাম। সেই আমার প্রথম অভিনয়" (জীবন স্মৃতি পৃ: ২০৬) "বিলাত যাইবার পূর্বে ষোল বৎসর বয়সে তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'এমন কর্ম আর করব না' প্রহসনে অলিকবাবুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন" (রবীন্দ্র জীবনী ১ম খণ্ড পৃ: ৮৮ পাদটীকা)। ১২৮৫ সালের ৫ই আশ্বিন রবীন্দ্রনাথ বিলাত যাত্রা করেন। তার পূর্বে চার মাস আমেদাবাদে ও দুই মাস বোম্বাইতে বাস করেন। সম্ভবত: ১২৮৪ সালের শেষ দিকেই এই অভিনয় হয় তবে এসব অভিনয় বাড়ীর লোক ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। প্রতিভা দেবী লিখেছেন,৩৩ (রবীন্দ্রনাথ) জোড়াসাঁকোর ঘরে প্রথম অভিনয় করেন 'বিবের ধপক্কে ও বিপক্কে'। উক্ত বইখানার উল্লেখ মাত্র অন্যত্র পাওয়া যায় না। সম্ভবত: ইহা কোন নাটকের অভিনয় নয়—আলোচনা সভা। প্রথম প্রকাশ্যে অভিনয়—১২৮৭ সালের ১৩ই ফাল্গুন শনিবার দিবসে। বিদ্বজ্জন সমাগম সভা উপলক্ষে "বাল্মীকি প্রতিভা গীতিনাট্যে রবীন্দ্রনাথ মিলিত ভদ্রলোকদের সমক্ষে প্রথম প্রকাশ্যে অভিনয়

---

৩২ বঙ্গবাসী, আশ্বিন ১৩১২

৩৩ সমকালীন—বৈশাখ ১৩৬৮ পৃ: ২৮

৩৪ এই তারিখটি পাওয়া গিয়েছে ১২৮৮ সালের বৈশাখ সংখ্যা আর্য্য-দর্শন থেকে। কবি রাজকৃষ্ণ রায়ের "বালিকা প্রতিভা" নামে কবিতাটির পাদটীকায় তারিখ ছিল।

করেন। রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকি এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা দেবী৩৫ (১৮৮৫-১৯২২) সরস্বতী সাজিয়াছিলেন। বাল্মীকি প্রতিভা নামের মধ্যে—সেই ইতিহাসটুকু রহিয়া গিয়াছে (জীবন-স্মৃতি পৃঃ ২০০)।" সেদিন সেখানে কোলকাতার বহু গণ্য-মান্য-সম্ভ্রান্ত সাহিত্যিকগণ উপস্থিত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (৪৩) গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (৩৭) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (২৮) তাঁহাদের অন্যতম।

প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়—১২৯২ সালের ফাল্গুন মাসে "বাল্মীকি প্রতিভা"র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, "আদি ব্রাহ্মসমাজের জন্য টাকা তুলিবার প্রয়োজন হইলে তাহার থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করা হয়, মনে হয় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে কবির অভিনয়ও এই প্রথম এবং টিকিট বেচিয়া অর্থ সংগ্রহও এই প্রথম।"

স্ব-লিখিত গানে প্রথম সুর-সংযোগ

বিলাত যাত্রার পথে রবীন্দ্রনাথ মাস চারেকের জন্য সত্যেন্দ্রনাথের আমেদাবাদের সরকারী বাসা শাহিবাগ প্রাসাদে বাস করেছিলেন। বাদশাহী আমলের ইমারত প্রাসাদ, একপাশে "ক্ষীণ বহ্নিস্রোতা" সাবরমতী নদী। "শুক্লাপক্ষের গভীর রাত্রে সেই নদীর দিকের প্রকাণ্ড ছাদটাতে একলা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো আমার আর একটা উপসর্গ ছিল। এই ছাদের উপর বিশাচর্য্য করিবার সময়ই আমার নিজের সুর দেওয়া সর্ব্বপ্রথম গানগুলি রচনা করিয়াছিলাম।"

'জীবন স্মৃতি'র পাণ্ডুলিপিতে কবির সেই প্রথম গানের চারিটি চরণ উদ্ধৃত হইয়াছিল :

নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়,
ধীরে ধীরে অতি ধীরে গাওগো।
ঘুমঘোর ভরা গান বিভাবরী গান,
রজনীর কণ্ঠ সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো।৩৬

---

৩৫ তৃতীয় ভ্রাতা বেণেন্দ্রনাথের কন্যা। হাইকোর্টের বিচারপতি আশু চৌধুরীর স্ত্রী।

৩৬ ভারতী—১২৮৭ ফাল্গুন পৃঃ ৫০৮ দ্রঃ রবিচ্ছায়া পৃষ্ঠা ১ সমগ্র গানটি

প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ (১২৮৫)

"প্রথম বৎসর ভারতীতেই 'কবিকাহিনী'৩৭ নামক একটি কাব্য বাহির করিয়াছিলাম···এই 'কবি-কাহিনী' কাব্যই আমার রচনাবলীর মধ্যে প্রথম গ্রন্থ আকারে বাহির হয়" । 'কবি কাহিনী' প্রকাশ করেন কবিবন্ধু প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। প্রকাশ কাল ১২৮৫ সালের ২০শে কার্তিক। "পুনা" জাহাজ যোগে ১২৮৫ সালের ৫ই আশ্বিন রবীন্দ্রনাথ বিলাত যাত্রা করেন। সুতরাং বিলাত যাত্রা পথে কিংবা বিলাত পৌঁছানর পর "কবিকাহিনী" প্রকাশিত হয়। "আমি যখন মেজদাদার নিকট আমেদাবাদে ছিলাম তখন আমার কোনো উৎসাহী বন্ধু এই বইখানা ছাপাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া আমাকে বিস্মিত করিয়া দেন " সম্ভবতঃ উক্ত বইখানা মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হবার পূর্বের প্রেস কপি।

প্রথম পত্রাবলী (১২৮৬)

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত পত্রাবলী সাহিত্যের সূচনা হয় বিলাত যাত্রা পথেই। রবীন্দ্রনাথ ঐ যাত্রাপথের এবং প্রবাস কাহিনীর বিবরণ ভারতী পত্রিকায় ১২৮৬ সালের বৈশাখ সংখ্যা থেকে "য়ুরোপযাত্রী কোনো বঙ্গীয় যুবকের পত্র" নামে ধারাবাহিক রূপে প্রকাশ করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গীকৃত হয়ে "য়ুরোপ প্রবাসী পত্র" নামে ১২৮৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

প্রথম গীতি নাট্য ১২৮৭

"আমাদের বাড়ীতে মাঝে মাঝে বিদ্বজ্জন সমাগম নামে সাহিত্যিকদের সম্মেলন হইত·····এই সম্মেলনী উপলক্ষেই 'বাল্মিকী প্রতিভা' রচিত হয়" "ইহা সুরে নাটিকা। অর্থাৎ সঙ্গীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্যবিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র—স্বতন্ত্র সঙ্গীতের মাধুর্য্য ইহার অতি অল্প স্থলেই আছে। 'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতিনাট্য ১২৮৭

"ভগ্নহৃদয়"এর ৬ষ্ঠ সর্গে আছে। রবিচ্ছায়া (১২৯২) প্রকাশের সময় গানটি কিছুটা পরিবর্তন করে দেন।

৩৭ ভারতী, ১ম বর্ষ ১২৮৪ পৌষ—চৈত্র সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

সালের ফাল্গুন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১২৯২ সালের ফাল্গুনে বাল্মীকি-প্রতিভার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় তা বহুলাংশে পৃথক গ্রন্থ। "কালমৃগয়া" থেকে ১০টি গান অধুনা চলিত বাল্মীকি প্রতিভায় সংযোজন করা হয়। এ ছাড়া আরও ২০টি গান নূতন রচনা ক'রে দেয়া হয়। তেমনি কয়েকটি বর্জিত হয়। 'জীবন স্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ যে 'বাল্মীকি প্রতিভার' বিষয় আলোচনা করেছেন সেটি তার দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম মূল রূপটির কথা তাঁর স্মরণে ছিল না। 'বনদেবী' অংশ প্রথম সংস্করণে নেই। বনদেবীর কণ্ঠের আইরিশ সুর-বসান গানটিও প্রথম সংস্করণে নেই।

প্রথম নাটক ১২৮৮

"রুদ্রচণ্ড" রবীন্দ্রনাথের রচিত অভিভাবকের হুকে লেখা প্রথম নাটক। গ্রন্থখানি দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রার প্রস্তুতির সময়ের রচনা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে গ্রন্থখানি উৎসর্গ করার সময় লিখছেন, "সে-স্নেহ আজ তোমাকে ছেড়ে যেতে হবে পরবাসে। তাই বিদায়ের আগে এসেছি তোমার পাশে"। রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিলাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন ১২৮৮ সালের ৯ই বৈশাখ। তার পূর্বেই গ্রন্থখানা মুদ্রিত হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরী-ভুক্ত হয় ১২ই আষাঢ় ১২৮৮। রবীন্দ্রনাথের নাটক রচনার প্রথম প্রয়াস হিসাবে এর মূল্য, সাহিত্যিক মূল্য সামান্য।

প্রথম প্রবন্ধ পাঠ ১২৮৮

"দ্বিতীয়বার বিলাত যাইবার পূর্বদিন সায়াহ্নে (১২৮৮ বৈশাখ ৮) বেথুন সোসাইটির আমন্ত্রণে মেডিকেল কলেজ হলে আমি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। সভাস্থলে এই আমার প্রথম প্রবন্ধ পড়া। সভাপতি ছিলেন বৃদ্ধ রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবন্ধের বিষয় ছিল সঙ্গীত।"

প্রথম প্রকাশ্য সংগীত ১২৮৮

এই সভাতেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম গান গাহিয়া শোনান। ইতিপূর্বে নাটকে অভিনয়ের সময় ব্যতীত একক সংগীত গান নি। "আমার প্রবন্ধে লিখিত অংশ অল্পই ছিল। আমি দৃষ্টান্ত দ্বারা বক্তব্যটিকে সমর্থনের চেষ্টায় আগা-গোড়াই নানাপ্রকার সুর দিয়া নানাভাবের গান গাহিয়াছিলাম। সভাপতি মহাশয় 'মধে বাল্মীকি গোকিলং' বলিয়া আমার প্রতি প্রচুর সাধুবাদ প্রয়োগ করিয়াছিলেন।"

প্রথম প্রকাশিত কবিতা পুস্তক ১২৮৮

"সন্ধ্যা সংগীত" প্রকাশিত হয় ১২৮৮ সালে। "সন্ধ্যা সংগীতকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যগ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; ভানুসিংহের পদাবলী পূর্বে রচিত হইলেও মুদ্রিত হয় পরে"। 'দুঃখের আবাহন' বোধহয় এই কবিতাগুচ্ছের আদি রচনা।

প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ ১২৯০

"গঙ্গার ধারে বসিয়া সন্ধ্যা সঙ্গীত ছাড়া কিছু কিছু গদ্যও লিখিতাম··· এই ছোট ছোট গদ্য লেখাগুলি এক সময়ে বিবিধ প্রসঙ্গ নামে গ্রন্থ আকারে বাহির হইয়াছে।" 'বিবিধ প্রসঙ্গ'ই রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ গ্রন্থ। লেখাগুলি ১২৮৮ সালের শ্রাবণ মাস থেকে ১২৮৯ সালের বৈশাখ পর্যন্ত মাসে মাসে প্রকাশিত হয়। বিবিধপ্রসঙ্গ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১২৯০ সালের ভাদ্র মাসে।

প্রথম গদ্য নাট্য ১২৯০

"১২৯০ সালের ২৩শে অগ্রহায়ণে আমার বিবাহ হয়, তখন আমার বয়স ২২ বৎসর। ঠাকুর পরিবারে আনন্দ উল্লাস যেন কানায় কানায় উছলিয়া পড়িতেছে···"। পরিবারের সকলেই কলকাতায়। স্থির হ'ল, নূতন ধরণের একটি নাটক অভিনয় করতে হবে। অভিনেতারা স্ব স্ব ভূমিকা নিজেরাই লিখে নেবেন। মোটামুটি প্লট খাড়া করা হ'ল। অভিনেতারা নিজেদের ভূমিকা লিখে নিলেন। কিন্তু বারোয়ারীভাবে লেখা নাটক মনঃপূতো হ'ল না। "শেষকালে রবীন্দ্রনাথকেই সেই খসড়াকে কাটিয়া ছাটিয়া একটি চলনসই নাটক খাড়া করিতে হইল। নাটকখানির নাম রাখা হইল 'বসিলী'। রবীন্দ্রনাথের প্রিয়নাম। ইহাই তাহার প্রথম গদ্যনাটক। নাটকটি লেখা হ'ল কিন্তু অভিনয় করা আর সম্ভব হ'ল না। ১২৯১ সালের ৮ই বৈশাখ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যা এবং ঐ বৎসরই ১৪ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে তৃতীয় ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু নাটকটির অভিনয়ের পূর্বেই শেষ যবনিকা টেনে দিল।

প্রথম ও শেষ আধা-বাংলা আধা-হিন্দিতে অপ্রকাশিত রচনা ১২৯০

১২৯০ সালে বর্ষার সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর দ্বিতীয় ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথের

নিকট নাসিকে বেড়াতে গেলেন। সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ তখন কলকাতায়। রবীন্দ্রনাথ সেই সময় আধা-বাংলা আধা-হিন্দিতে একখানা কৌতুকপূর্ণ পত্র লেখেন। পত্রটি কবিতায় লেখা। কিন্তু এটি তার কোন গ্রন্থেই স্থান পায় নি। কবিতাটির প্রথম চারিটি চরণ উদ্ধৃত হ'ল।

কলকত্তামে চলা গয়ো রে সুরেনবাবু কেরা,
সুরেনবাবু, আসল বাবু, সকল বাবুকো সেরা।
মুড়া সাবকো কামকো নহি পড়িয়া রেখো বাচ্চা
মহিনাভর, কুচ খবর মিলে না ইধেত দহি আচ্ছা।

প্রথম বাংলা ছন্দ বিষয়ে প্রবন্ধ ১২৯৯

'বাংলা পদ্য ও ছন্দ' প্রবন্ধটি সাধনায় (১২৯৯ শ্রাবণ) প্রকাশিত হয়। "...ইহাই বোধহয় ছন্দ সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ"।

প্রথম সংগীতগ্রন্থ ১২৯১

১২৯০ সালে প্রকাশিত 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত সংগীত পুস্তক। 'ভানুসিং ঠাকুরের পদাবলী'র প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় ভারতীর ১ম বর্ষ ১২৮৪ সালের আশ্বিন মাসে। কবিতাটি "সজনি গো, আঁধার রজনী ঘোর ঘনঘটা" কিন্তু কবিতাটিতে সে সময়ে সুর দেওয়া হয়েছিল কিনা জানা যায় না। প্রথম প্রকাশকালে কুড়িটি কবিতা ছিল। ভানুসিংহের পদাবলীতে বৈষ্ণব পদকর্তাদের অনুরূপ এক জাতীয় গানই আছে। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গানের প্রথম সংকলন গ্রন্থ যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র কর্তৃক ১২৯২ সালে প্রকাশিত "রবিচ্ছায়া"। এ গ্রন্থখানিতেও "অনেক গুলি গানে রাগ রাগিণীর নাম লেখা যাই। সে গানগুলিতে এখনও সুর বসান হয় নাই"—গ্রন্থকারের নিবেদন। রবীন্দ্রনাথ।

প্রথম স্ব-লিখিত কবিতার ইংরেজি অনুবাদ ১২৯৫

১২৯৫ সালের প্রথম থেকে বর্ষার শেষ দিক পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে বাস করছিলেন গাজিপুরে। "গাজিপুর কবির বাসার নিকটে বাস করতেন সিভিল সার্জেন। তিনি ছিলেন মিলিটারী বিভাগের লোক। কবির সঙ্গে তাহার পরিচয় হয় এবং কবি কি লেখেন তাহা জানিতে তাহার কৌতূহল হয়। কবি আমাদের বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার কবিতা তর্জমা তাঁহাকে

শুনাইতেন।" অনুদিত 'নিষ্ফল কামনা'র অনুবাদ বোধ হয় এই সময়েই প্রথম করেন। সম্ভবতঃ ইহাই কবির ইংরেজী অনুবাদের প্রথম প্রয়াস প্রথম কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ উদ্ধৃত করা হল।[৩৮]

All fruitless is the cry,
All vain this burning fire of desire.
The sun goes down to his rest
There is gloom in the forest,
and glamour in the sky

প্রথম সাহিত্য সম্পাদনা ১২৯৮

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনা সাময়িক পত্রিকাকে আশ্রয় করেই সার্থক হ'য়ে উঠেছে। প্রথমে ভারতীর ও প্রতিবিম্বে ভারতীতে তারপর বালকে তাঁর লেখা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ভারতী ও বালক ছিল তাঁদের পারিবারিক পত্রিকা। সম্পাদনার কাজে এখানেই তাঁর হাতেখড়ি। ১২৯৮ সালে সাপ্তাহিক হিতবাদী পত্রিকার প্রথম প্রকাশ থেকেই সাহিত্য সম্পাদক রূপে রবীন্দ্রনাথের প্রথম আবির্ভাব। "কৃষ্ণকমল (ভট্টাচার্য) বাবুকে প্রধান সম্পাদক, আমাকে সাহিত্য সম্পাদক এবং মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়কে রাজনৈতিক সম্পাদক করা হয়েছে।" কিন্তু হিতবাদীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক মাত্র তিনমাসের জন্য স্থায়ী হয়েছিল।

প্রথম সম্পাদনা ১৩০১

১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ মাস থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় "সাধনা" পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। ১৩০১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে চতুর্থ বর্ষ শুরু হ'লে রবীন্দ্রনাথ প্রথম সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

---

৩৮ দ্রঃ Poems, Visvabharati 1942 p. 196-97
কৌতূহলী পাঠকের জন্য মূল বাংলা চরণ দুটি দেওয়া হ'ল।

বৃথা এ ক্রন্দন
হায় রে দুরাশা,
"রবি অস্ত যায়
অরণ্যেতে অন্ধকার, আকাশেতে আলো।"

চিত্রকলা নাবলা। ১৩০৭)

চিত্রবিদ্যা শিখবার ইচ্ছা তাঁর দীর্ঘদিন থেকেই ছিল। "এক একটি বিশেষ দৃশ্য এক একটি বিশেষ রসে-রঙে নিষিক্ত হইয়া আমার চোখে পড়িত। এমনি করিয়া নিজের মনের কল্পনা পরিবেশও পড়িয়া তুলিতে তারি ভাল লাগিত। সে আর কিছু নয়, এক একটি পরিস্ফুট চিত্র আঁকিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা।···তুলি দিয়া ছবি আঁকিতে যদি পারিতাম তবে পটের উপর রেখা ও রঙ দিয়া উতলা মনের দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতাম কিন্তু সে উপায় আমার ছিল না।" সেই চেষ্টা সুরু হ'ল ১৩০৭ সালে। আচার্য জগদীশচন্দ্রের এক পত্রের উত্তরে লিখছেন "শুনে আশ্চর্য হবেন একখানা Sketch book নিয়ে বসে বসে ছবি আঁকচি।·····প্রতিজ্ঞা করলুম, এবারে বোল আনা ফুতেমিতে মন দেব তখন ভেবে ভেবে এই ছবি আঁকাটা আবিষ্কার করা গেছে। এই সম্বন্ধে উন্নতি লাভ করবার একটা মস্ত বাধা হয়েছে এই যে, যত পেন্সিল চালাচ্চি তার চেয়ে ঢের বেশী রবার চালাতে হ'চ্ছে, সুতরাং ঐ রবার চালনাটাই অধিক অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে।"[৩৯] বহুদিন থেকেই রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুর পেনসিল স্কেচ ও কালির দ্বারা অলঙ্করণের উপযোগী কিছু কিছু স্কেচ করেছেন, এই সকল স্কেচ আঁকার কাজে তিনি কলম ও তুলি উভয়ই ব্যবহার করতেন।···১৯১৩ সালে তিনি প্রকৃতির অনুকরণে কয়েকটি পোট্রেট আঁকেন, ১৯১৫ সালে তিনি গ্রাম ও পল্লী অঞ্চলের কয়েকটি দৃশ্য অঙ্কন করেন।···তিনি শান্তিনিকেতনে একটি শিল্প বিদ্যালয় (কলাভবন) প্রতিষ্ঠা করিতে মনস্থ করেন। ১৯১৮ সালে এই বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয়। ১৯২০ সালে এই বিদ্যালয়ে তিনি একটি প্রতিযোগিতা প্রবর্তন করেন। এই প্রতিযোগিতায় তিনি অংশগ্রহণ করেন।[৪০] ১৩০৭ সালে কলাসী দেশে তাঁর চিত্রাবলীর একটি প্রদর্শনী হয়। সাধারণের নিকট চিত্র-শিল্পী হিসাবে এই তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ।

এই সম্বন্ধে তার মনের ভাব বোঝাবার জন্য দুখানা চিঠির কিছুটা উদ্ধৃত করে দেওয়া হল।

---

৩৯ পত্রাবলী, শিলাইদহ ১লা আশ্বিন ১৩০৭

৪০ চিত্র-শিল্পী রবীন্দ্রনাথ—অমিন ওবোরাইয়ের। উত্তরায়ণী—রবীন্দ্র শতবর্ষ সংখ্যা ১৩৬৮

"রাণী আজ আমার জন্মদিন·····আমার ছবি প্রদর্শনী চলছে। ইংরেজী পীতাঞ্জলি প্রকাশের সময় বিস্ময়ের কারণ হ'য়েছিল, ছবি নিয়েও প্রায় তেমনি হল। বর্ণনা করে কোন লাভ নেই—এদের দেখার মধ্য দিয়ে দেখলে তবে ঠিক বুঝতে পারতে।"৪১

"ছবির কথা অল্প যত শুনেছ তার চেয়ে বেশী করে বলা আমার পক্ষে শোভন নয়। তার চেয়ে অন্যায় হবে যখন তোমরা অহঙ্কৃত স্বরে বলতে সুরু করবে আমরা তো আগেই বলেছিলুম। বুঝতে পারবে না তোমরা যে রকম করে বলেছিলে এ বলা সে রকম নয়, এর মধ্যে আস্ফালনের কীণতা নেই। সে জন্য মার্জনা করিয়ো—কেমনা আমি নিজেই বুঝিনি, তোমরাই আমার চেয়ে বুদ্ধিমান, ঠিক কথাটা স্পষ্ট বুঝেছিলে একথা বলতে আমার দুর্বল মন বারো পাঁচ স্পর্ধা করে বলতে ইচ্ছে করে কেমন, এখন কী বলো।"৪২

একমাত্র ইংরেজী মূল কবিতা রচনা (১৯১২)—১৩১৯

১৯১২ সালে লাইমার প্রকাশিত "দালিয়া" গল্পটি অবলম্বন করে The Maharani of Arakan নামে একখানি নাটক ইংলণ্ডে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন বিলেতে। এই নাটকের জন্য একটি ইংরেজী মূল গান রচনা করে দেন। বোধহয় এটিই তাঁহার এক মাত্র Rhymed ইংরেজী কবিতা।

প্রথম নৃত্যনাট্য

নৃত্যনাট্য রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বয়সের রচনা। 'চিত্রাঙ্গদা' (১৩৩২ ফাল্গুন প্রথম প্রকাশিত ও অভিনীত) পরিশোধ পরে শ্যামা (প্রথম অভিনয় ১৩৪৩ আশ্বিন প্রথম প্রকাশ ১৩৪০ কার্তিক,) চণ্ডালিকা (প্রথম প্রকাশ ও প্রথম অভিনয় ১৩৪৪ ফাল্গুন), মায়ার খেলা (১৩৪৪, পাণ্ডুলিপি রথীন্দ্র ভবনে রক্ষিত) প্রথম অভিনয় ঐ বৎসরই শান্তিনিকেতন আশ্রমে দোলপূর্ণিমার উৎসব উপলক্ষ্যে। এই চারখানি পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্য রবীন্দ্রনাথ

৪১ নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত পত্রাবলী। জন্মদিন ১৩৩৭ (১৩৩৭) দেশ ২৪। আষাঢ় ১৩৬৮।

৪২ নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত পত্রাবলী।
(১৩৩৭) দেশ ২৪। আষাঢ় ১৩৬৮।

রচনা করেন। তারিখের দিক থেকে বিচার করলে চিত্রাঙ্গদাই তাঁহার প্রথম নৃত্যনাট্য। কিন্তু পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছিল অনেক দিন থেকেই। বাল্মীকি প্রতিভা, (ফাল্গুন ১২৮৭), কালমৃগয়া, (শ্রাবণ ১২৮৯) গীতিনাট্য পরবর্তী-কালে কিছু নৃত্য যোগ করা হয়। নটীর পূজা (১৩০১) নাটক, কিন্তু এতে নটীর নৃত্য আছে। শাপমোচন (পৌষ ১৩০৮) "নৃত্যশীত ও কথকতার সম্মিলনে অনুষ্ঠিত কবির এই রচনা বিভিন্ন অভিনয় উপলক্ষে বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছিল" : তাদের মেল "একটা আষাঢ়ে গল্পের" (সাধনা আষাঢ় ১২৯৯) নাট্যরূপ। ১৩৪০ সালের ভাদ্রমাসে প্রথম প্রকাশ। পরে ১৩৪৬ সালের মাঘমাসে বর্তমান রূপ নেয়। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে গীতিনাট্য তারপর নৃত্য গীতি নাট্য এবং সর্বশেষে পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্য রচনা করেন। এগুলি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সুরে তালে বাঁধা, কোন অংশই শুধু সংগীত কিংবা কাব্য আবৃত্তির আদর্শে রচিত নয়।

তাঁর প্রথম রচিত নৃত্যনাট্যে কবি স্বভাবতই একটি বিস্তৃতির প্রয়োজন বোধ করেন। সুতরাং চিত্রাঙ্গদার ভূমিকায় আমরা "এই গ্রন্থের অধিকাংশই গানে রচিত এবং সে গান নাচের উপযোগী। ...কাব্য আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য্য নয়।' চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যে রবীন্দ্র পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্পূর্ণ নূতন রূপ নেয়, সূচনায় কবি বলেন "সমস্ত চণ্ডালিকা নাটিকায় গদ্য ও পদ্য অংশে সুর দেওয়া হয়েছে।" বস্তুতঃ কবি শেষ বয়সেও "চির নূতনের ডাকে" সাড়া দিয়েছেন এবং সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক চিন্তাকেও রূপ দিতে দ্বিধা করেন নি। তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্য "চিত্রাঙ্গদা"কে তিনি নৃত্যনাট্য রূপে প্রথম সৃষ্টি করেননি, নাট্যকাব্য হিসাবে এর প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১২৯৮ সালে ; অবশ্য খসড়া প্রস্তুত হয়েছিল উড়িষ্যার পাণ্ডুয়া কুঠিতে ২৮শে ভাদ্র ১২৯৮ সালে। এবং প্রথম অভিনীত হয় এমারেল্ড থিয়েটারে ১২৯২ সালের পৌষ মাসে।৪০ নৃত্যনাট্য হিসাবে চিত্রাঙ্গদার প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৪২ সালে। প্রথম অভিনয় হয় কলকাতার মিনার্ভা থিয়েটারে ঐ বৎসরের ফাল্গুন মাসের শেষে (১১, ১২, ১৩ই মার্চ)। প্রথম নৃত্যনাট্য হওয়ার কতগুলি অংশে নৃত্য সহযোগ গান নয়, কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে রচিত।

---

৪০ দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ভারতীয় নাট্যকলা পৃঃ ৪৬

কুয়াশার ছবি

(হেমিংওয়ের অনু)

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রবৃদ্ধ বীরত্ব তার কাজ শেষ ক'রে
প্রেমের কঙ্কাল বুকে এখন ঘুমায়
হৃদয়ের শত্রুতার থেকে ঢের দূরে
নির্জন শান্তিতে একা। চারপাশে গোঙায়

অসীম সমুদ্র রাত্রি, অন্ধ পৃথিবী
কুয়াশা প্রহারে অন্ধ! কথা ভুলে যায়

কে নারী প্রলাপ বকে?···ঘুমের ভেতরে
প্রাক্তন রাজপুত্র আরো রোগমুক্তি চায়
স্বেচ্ছায় স্বাধীন মৃত্যু; কুয়াশার ছবি।

সকলই অমৃত হ'তো

সকলই অমৃত হ'তো যদি
মানুষের হৃদয়ে ঈশ্বর
আর রক্ত ক'রতো না বমি
হটাতো না ভীষণ রোগের

যন্ত্রণা। সকলই হ'তো সোনা
যদি টীন কনস্টান্টিনোপল
এথেন্স প্যারিসে চিকিৎসক
প্রাজ্ঞ হ'তো, সর্বকলাজ্ঞান

নিরাময় মন্ত্রে। এ পৃথিবী
ঋষির গানের কবিতায়
আবিরে রাঙাতো চোখকেও,
যদি জ্বলতো মনের মনের

আরোগ্য চেতনা। তবে কেন
যেতো পাষণ্ডকে প্রেম দিয়ে॥

কবিতা পরিষদের 'বই মেলা'য়

আমরা সবাই চাঁদের আলোয় যাবন
ব'সে আছি অনন্ত ইথারের
একটি বিন্দু কোটিতে ভাগ ক'রে
এই পৃথিবীর কয়েক কোটি মানুষ ;
এবং ক'জন মার্কাস্ স্কোয়ারে।

আমরা সবাই ক্ষুব্ধ ইভর যাবন
চাঁদের আলোয় যে যার মুখ দেখে
অন্য সময় মাথার চুল ছিঁড়ি
আয়না ভাঙি ; তবু এখন অবাক
ঘাসের ওপর মার্কাস্-স্কোয়ারে।

কবিতা শুধু কবিতা চার দিকে
যেন জীবন এখন কালপুরুষ
সপ্তর্ষির চেতনা ; যেন চুমা
ইভর মুখে চোখে, ইভর বুকে
আধকোটা এই মার্কাস্ স্কোয়ারে।

আমরা ক'জন নৈরালোকের যাবন
কয়েকটি রাত বাঁশির মত বাজি॥

আ মরি বাংলা ভাষা

(কাছাড়ের শহীদদের স্মরণে)

অরুণ ভট্টাচার্য

জন্মসূত্রে কি কি পাইনি আমি তা জানিনা ;
কিন্তু কি পেয়েছি জানি। অন্যতম, ভাষা।
রক্তের ভিতর অস্ত্র, অস্ত্রের ভিতর
মুখ সন্তানের মত আমাকে বাঁচায়
বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে, দৃঢ় দাবী অন্তগত,
আমি তাকে মা বলে ভাববো, অন্নদাত্রী,
গৌরবে যে মহীয়ান, মমতায় স্নিগ্ধ
অরুপণ দানে তার আমি বড় ঋণী।

এ জন্মের অন্যতম গর্ব, সুতরাং,
—অন্নদাত্রী বাংলা ভাষা চৈতন্যে গভীর
প্রতিদিন ব্যবহারে এবং চিন্তায়
সত্তায় নদীর মত চিরপ্রবাহিত—
ভুলতে পারবোনা তাকে। অন্যথা আমার
বিশ্বাস মিশ্চিত। সে যে দীপ্ত অন্তর্দাহ।

আনন্দিত

কারা কারা হাসপাতালে শুয়ে আছে সমস্ত সকাল।
সুদূর আকাশী নীল প্রজাপতি সৌখীন ডানায়
বিছানার চারপাশে ঘুরে ঘুরে উড়ছে নিয়ত। আত্মীয় স্বজন বন্ধু
এল একে একে, কমলালেবুর খোসা, চকোলেট, খেলনার সাজ সরঞ্জামে
অপূর্ব সংসার জমে। শুশ্রূষণ, ঘরভর্তি বৃদ্ধ শিশু যুবারা সকলে
উৎসাহিত সাথী যেন।

ঘণ্টা বাজল, আলো জ্বলল ঘরে ঘরে ফের
নির্জন দীপের মত, ঘরে বাইরে বিষণ্ণতা সাথী।

কারা কারা হাসপাতালে ছাড়া পেল? আত্মীয় বন্ধুর সাথে
চলে গেল গণ্ডীর বাইরে, অসুস্থতা পাশ ভেবে? একবার তাকালে দেখবে
দেখতে পেত প্রজাপতি তখনো উড়ছে, ঘরে ঘরে বিছানার পাশে।
দুঃখ তার দুঃখ নয়, মৃত্যু তার সোপান প্রেমিক। দৃশ্য শুধু অন্তরালে
আনন্দিত ডানায় সৌরভে, কয়েকটি প্রজাপতি, সুখী ভোরবেলা
সব ইচ্ছা দুঃখ স্মৃতি জীবনের ঘনিষ্ঠ প্রভাতে,
কিছু কিছু উজ্জ্বল অক্ষর বুক ভরে চিহ্ন রাখবে ছবি।

স্বার্থপর প্রেমিক

প্রণব মিত্র

মনোলীনা সেই নারী তাকে খুঁজি তোমার সীমায়
তোমার দেহের বর্ণ-ঘ্রাণ তার অপূর্ব উপমা।
কমলিনী সে-রাত্রিকা তাকে আমি আমার তোমায়
ত্রিভিশ বসন্ত ধরে পলে পলে দিয়েছি সুষম।

কত ঋতুবদলের রং তার কপোলে, চুলে,
তার ওষ্ঠ অধরেতে রেখে গেছে মায়াবী রঙ্গনা।
সে তোমার দেহ-ঘরে প্রসারিত মধুরে-উচ্ছলে
তোমার দু'চোখে তার কামনার উত্তপ্ত লাঞ্ছনা।

তোমাকে যে ভালবাসি সে যে এক মূঢ় আত্মরতি,
অস্তিতার অভিক্ষেপে চারুকল্প দ্বিতীয় রচনা,—
এ-কথা নিশ্চিত জেনে মনে মনে বলেছি, নিয়তি
তোমারই নির্দেশ হোক জয়যুক্ত ; অগত্যা বঞ্চনা
পরম প্রণয় হোক জীবনের মৃগতৃষ্ণিকার ;
তুমি শুধু জেনে রেখো স্বার্থপর প্রেমিক তোমার।

দুটি কবিতা

শামল রায়চৌধুরী

বরণীয়াসু

এইমাত্র যারা এসে তোমার মৃত্যুর কথা বলে গেল, তারা
কোন্ পৃথিবীর লোক, কি তাদের ভাষা, কেউ জানে ?
আমি তো শুনিনি কিছু কান পেতে, শুধু চারিদিকে
পাতা ঝরে-যাওয়া দেখে বুঝলাম বসন্ত অদূরে।

তুমি বলেছিলে শীত ফাল্গুনের গন্ধভরা মাঠের ভিতরে
রৌদ্রের সিংহাসন রেখে চলে যাবে শব্দহীন—
কিন্তু কোন চিহ্নে আমি জানবো তাতো বলোনি সেদিন
আজ শুধু বেলাশেষে কয়েকটি পাখীর উচ্চারণে
সমস্ত বাগান কেন নিথর হয়ে ঝরালো পাতার অশ্রুজল।

এমন বিচ্ছেদবার্তা কোনদিন পাবো তা ভাবিনি

দুটি কবিতা

তোমার প্রস্থানে রৌদ্র বাঁকালো গ্রীবার ভঙ্গী, তীব্র অভিমানে
চিরদিন যেন বেলা গোধূলির ম্লান রেখা পশ্চিমগগনে
তুমি তো দাঁড়াতে পারো এখন উদ্যত পাখা দৃষ্টির ওপারে
মৃত্যু কি তোমাকে টানে অন্য বুকে, তুমি কি আমার কেউ
ছিলে না কখনো ?

আকস্মিক

ছেলেরা হঠাৎ থেমে গেছে, পড়া বন্ধ, শিক্ষাপাঠ, স্থির ধারাপাতে
মাঝে মাঝে হলদে দাগ, সেইখানে অন্যমনস্ক কিশোর আঙুল
স্থবির। ইশারা পেলে তবে ওরা কলঘরে যাবে।
ক্ষণিক বিরতি, কেউ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, দীর্ঘ দুপুরের
ছায়াতরু পার হবে অনন্তরী অথচ বিপুল···

মাষ্টারমশাই কিছু দেখতে পাননা। তাই শূন্য আমগাছতলা
চারিদিকে শিরশিরে হাওয়া, সীম পরিচিত গলা
শুনতে পাচ্ছে পড়ুয়ারা রাজপুত্র কোটালপুত্রের ক্লান্ত ঘোড়া
শিরিষগাছের ডালে বাঁধা যেন, ক্রেষারব অদ্ভুত নীরব।
তবুও শিক্ষক কেন অচেতন ? কেন যে অশান্ত
ওইসব চোখ তার জামার অপরপারে দেখে একজোড়া
লোবাণী রঙের রথ, চিত্রিত গল্পের ডাকে ছুটি হলো অদ্ভুত ঘণ্টায়।

অন্তর্জলি করবনা

সোজন সোম

অন্তর্জলি করবনা : ইহলোকে পারলৌকিক
সকলের কামাকড়ি গুণবনা ; ইদানীং যদিও তিমির
ক্রমশঃ আসন্ন ; মাঠে বিষণ্ন শীতের
হিমবর্ণ চেলাকাঠ ; খোঁড়লে গভীরে
মুষিক আসন্ন কর্মে ব্যস্ত : বড়ো সরলরী মুষিক।

ঈশ্বরকে ভেঙে ভেঙে বানিয়েছি অজস্র ঈশ্বর
চতুর্দিকে নির্বিকার ইতস্তত: খণ্ড খণ্ড শিলা……

দক্ষিণ দিকের শেষ তুরঙ্গম চলে গেছে, তার
অপ্রতিম শ্বেতপুচ্ছ···বর্ণকেশ···গ্রেষা···মাংসা স্ফূরিত উল্লাস
টগবগে অশ্বত্ত ভঙ্গী·· যদি আমি হতাম লওয়ার !
যদি আমি লাফ দিয়ে চড়তাম সম্বল পৃষ্ঠে, বলিষ্ঠ মুষ্টিতে
টানতাম লবল রাশ, যদি দ্রুত পবনের বেগ
আলোর মতন কেটে পৌঁছোতাম পূর্বের তল্লাটে !
দক্ষিণ দিকের শেষ তুরঙ্গম চলে গেছে, আর
সমস্ত ধূলোর চিহ্ন ধূলোর অধির হাত মুছে দিয়ে গেছে
বাজেনা চপল ক্ষুর·ধূলাস্ত অশ্বিলে
যদি আমি হতাম লওয়ার!

অধির উদ্বেগে কাল ষড়ভঙ্গ বলিরেখা লেখে।
ইলাসিং দ্বিধাগ্রস্ত বিশ্বিপ্ত হৃদয়, আমি চির পদাতিক
বিশ্বিত মুকুরে কিংবা বিকল্পে জলের বুকে খুঁজিনি প্রতিমা···
ভীষণ তাড়না নিত্য তাড়িয়েছে পশুর মতন।
যূথের মানস বলে কিন্তু সেই অথচ যূথের
অদম্যী প্রবণতাকে কিয়ৎকাল ধ্রুব ভেবে আত্মপ্রবঞ্চনা···
বিশ্বাসের পাকা ভিতে সংশয়ের অশথ অঙ্কুর···

অন্তর্জলি করবনা, ইহলোকে পারলৌকিক
আস্তিক উদ্বৃত্তি ইদানীং ঘৃণার বিষয়
অন্ধকারে কে প্রভুর খোঁজে। মূর্খ। নিজেকে পাতক
ভাববার অকূট দাবি তোর জন্মগত অধিকার ?
কী পাপ, কী পুণ্য, কোন্ সীমারেখা সুস্পষ্ট দাহভাগ !
দ্রবিত মৃত্তিকে দেব কিম্বিধে অন্তের অনুশোচ
কিন্ন উচ্চারণ নিয়ে ভুই আর হবনা এখন···

অন্তর্জলি করবমা

অনুবন্ধ যুথ ঐ দলে দলে চলে অন্ত আলোর সন্ধানে
আগত বিকীর্ণ সন্ধ্যা একটি তারা চিত্রলিপিবৎ

স্বাগত অনন্ত মৃত্যু···অন্তর্জলি আমি করবমা।

একা একা বৃষ্টির বিকেলে

অসিতকুমার ভট্টাচার্য

একা একা বৃষ্টির বিকেলে
জানালার ধারে চেয়ে আছি।
কবে তুমি ঘুরে চলে গেলে
নদীপারে এই ঘর ফেলে,
হারানো ধ্বনির মৌমাছি
ভিজে হাওয়া এলোমেলো ক'রে।

কেউ আসে কে আছে এ ঘরে?
ভিজে হাওয়া জানায় কাতরে,
এখনও তোমার কাছাকাছি
অবাক দু-চোখে চেয়ে আছি
কোন্ ছায়া এই ঘর ভরে?

ঢেউ ভাঙে বিকেলের তটে···
কাছে আসি। কিছু কথা বলি।
আবার ধুলোয় পথ চলি—
তবু, সব আলো চলে গেলে
তুমি জল, হাওয়ার বিকেলে
তোমার-ই প্রাণের পদাবলী।

'বোলান দরোজা'র দিকে তাকিয়ে

শটকৃত যে

রবে না কিছুই !
সময়ের দু'ই-দু'ই
হাত,
একদিন বন্ধ, বহু বড়ো,
আরো
রাজকীয়
প্রভায়, আলতো ক'রে, স্পর্শ করবে
তোমাকে, আমাকে এবং নিশ্চিত, সবকে—
যৌবন, সুন্দর, প্রিয়,
অপ্রিয়-কে।
এখানে পৃথিবী-খ্যাত মাথা-উঁচু দীর্ঘ-দরোজার
সর্ব।
ওপাশে মুটোয়, আহা, ভেঙে-যাওয়া, খসে-পড়া নিবর্ণ দেয়াল,
শিউলি মধুর কাল
যাকে, কাছে টেনে নিলো !
বিলাপো
আমি-আমিত্বের মেলা !
খর্ব।
···অথচ, প্রিয়ার রঙ সময়ের মুখে মেখে সে তো
তারি কাছে পেতো
যৌবনের স্বর্গ,—
স্বপ্ন,
শান্তি,
ছায়া,··

'ষোলাপ গরোজা'র দিকে তাকিয়ে

আজকে সন্ধ্যায় কোনো পথিক স্রষ্টার চোখে
যদিবো তা,
প্রিয়া-স্মৃতি
নাকি, শুধু
মায়া ?

[কতেহ্‌পুর-সিক্রী : ১৯৬১]

সবুজ উদ্যানে

অসিত দত্ত

সবুজ উদ্যানে চল, এখনও মাঝে মি ছায়া জেগে।
রৌদ্রের বন্দুক ফুল ছড়ান রয়েছে ঘাসে ঘাসে
এক ঝাঁক ব্যস্ত কাক খুঁটে নিচ্ছে নিপুণ প্রয়াসে,
চল যাই হেঁটে হেঁটে অপরাহ্নে ইডেন উদ্যানে।

এস, হাতে হাত রাখি, লঘু পায়ে হাঁটি পাশাপাশি।
অনন্তার কৌতূহলী কেরানীর অবসন্ন চোখ
ফুড়ি মেরে চলে যাই, ভুলে যাই দ্যুলোক ভূলোক
এসব পুরণো দৃশ্য অপরিবর্তিত নই বাসি।

কী করে যে এসে গেছি পরিচিত সবুজ উদ্যানে !
মনে হোটা ঘাস পাতা কাকা বেঞ্চ, মৃদু শব্দ কথা,
কখন নিবেছে ভুলে সূর্য তার ক্ষীণ মমতা
কারা যেন উঠে গেল চুপিসারে দ্রুতপদে থামে।

চিন্তাপিত জলে নৌকো, ঘুরে আলো অথবা মশাল
ভাঁড়ি ভাঁড়ি ছায়া নামে, অন্ধকারে বীবরের জাল।

অমেৎসবার্ত্তাইন ৪০
পশ্চিম জার্মানী

রাজার বাড়ি অনেক দূরে

দিব্যেন্দু পালিত

রাজার বাড়ি অনেক দূরে। তুমি
পথ দেখালে যেতে পারি।
সকালে হোক, বিকালে হোক,
রাত্রিবেলা—
নিতলে আলো ; হলুদ সবুজ ঘাস পেরিয়ে ;
হাওয়ার থেকে পথের মতো
আসতে পারি ঘাস ;—
সকালে হোক, বিকালে হোক ;
শুধু তোমার ইচ্ছা যদি থাকে।

নিলাম আমার ভালোবাসা,
তুলে দিলুম তোমার হাতে।
ভালো লাগছে, সুখী। আমার
কতোকালের ইচ্ছা ছিলো
দুঃখে-সুখে, দুঃখে-শোকে
তোমার কাছে
রাখবো আমার প্রণত বিশ্বাস।
কিন্তু ভয় : সত্যি কিছু আছে না কি।
দুরন্ত দিন, কলস মাঠ ?
যাকে পাবার ইচ্ছা ছিলো ?
জানিনা তা। এখন শুধু
তৃষ্ণা, আমার
রক্ত। এবং তরল আঁধার—

নেবে আসছে, নেবে যাচ্ছি হঠাৎ যেন
সিঁড়ির শাঁচ অন্ধকারে।
তবু—
হতাশ হবার আগে যেন
শান্ত হ'তে পারি।

বন্ধুদের জন্য

যতীন্দ্রমোহন দত্ত

(১)

বিশ্বাস বুদ্বুদ হয়ে ফেটে গেল সমুদ্রে সমুদ্রে,
চতুর্দিকে প্রতিধ্বনি বিশ্বাসের মৃতদেহ ঘিরে।
তাদের কেমন করে আবার, আবার কাছে ডাকি,
বন্ধুর আসন পেতে সন্তর্পণে অপেক্ষায় থাকি!
বাল্য হতে যারা ছিল সহচর অকৃত্রিম বান্ধব,
তাদেরি আত্মীয় জেনে, হাতে হাত রেখে এই ঘরে
এসেছি নির্ভয় মিত্রে, বুকে তৃষ্ণা দুর্লভ সন্ধানে!
: সদর্প যৌবন স্পর্ধা যন্ত্রযুগে স্বর্গ বিজয়ের।

তারা সব কোথায় লুকালো কোন শাশ্বতের মোহে
কোথায় আশ্চর্য ফল পেকে আছে অমৃত গৌরবে
তার-ই মোহে চলে গেল, আমি একা নির্বান্ধব গৃহে
চলচ্চিত্র দেখি এই সহরের রেস্তোরাঁ কেবিনে
সমবেত যুবকেরা উল্লসিত বন্ধু-নিকেতনে;
আহা ওরা প্রীত হোক, বেঁচে থাক মুহূর্তের সুখে।

(২)

এরা হাসি মুখে আসে মুখে চোখে রঙিন সৌরভ।
এদেরি লালন করি অনভ্যস্ত ঐশ্বরিক হাতে।

তোমাদের থেকে যত দূরে থাকি ততই মঙ্গল,
এ যেন সুলভ প্রীতি, এইসব প্রেমের হাসিতে
দেখি শত বিষধর সর্পের অমৃত আলিঙ্গন।
তোমরাই প্রীতির স্বর্গ। এক এক জন মূর্ত পরশর,
কী পেলে যে খুশী তোমরা, সে সংবাদ ঈশ্বর-অজ্ঞাত।
হে ঈশ্বর, এই সব বালকের ক্ষমা কোরো তুমি।

ওরা ভালবাসে শুধু নরম মাংসই ছিঁড়ে খেতে,
শত্রুদের মত ওরা খোঁজে পচা কুকুরের দেহ।
চিরকাল যৌবনের আজন্ম ইচ্ছার ক্ষতটিকে
ওরা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে দেয় স্বার্থের আঘাতে।
ওদের প্রেমের স্বাদে পচা ইঁদুরের গন্ধ পাই
হে ঈশ্বর, এই সব বন্ধুদের ক্ষমা কোরো তুমি।

যা করে যে প্রজাপতি

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

বিষন্ন ঘুমার মতো ভবিষ্যের অগ্রিম কাহিনী
শুনবে কেন। কে যেন বলেছে আগে অন্ধকার, দামী
বিচিত্র জটিল ছক পাশাপাশি, প্রায়শ অজানা
কাহিনীকে রূপ দিয়ে যায় যাঁকে প্রাণের মোহিনী।

যে স্বপ্ন রাতের তারা দিতে গেলে সকালের রোদে
মৌনশব্দে বিষণ্ণ জীবনের নৈরাশ্য-বোধে
হায় রে অবোধ মন বিষন্ন ঘুমার মতো ক্ষমা
এখনো লালিত মনে প্রবন্ধের দাক্ষিণ্যেও অমা
প্রাপিবে সকল জন্ম প্রেম প্রীতি পৃথিবীর সোমা,

এই আলো এই সত্য অলীকারে প্রাণের প্রতিমা

উজ্জ্বল দিনের মতো, (ভবিষ্যের অস্ত্রিম কাহিনী
ভাববে কেন,) বিধর যুবার মতো হাতের রেখার দিকে চেয়ে
জানবে প্রাণের সত্য, জানতেও পারবেনা কোন সিঁড়ি কোন
পথ বেয়ে
ংশ দিতে কে এলো কে চলে যাবে এ ঘর ডিঙিয়ে
নিজ ঘরে
কে এলো কে চলে যাবে, একটি একটি আগে কিংবা পরে
জানবে কেন, বিমল যুবার মতো হাতের রেখার দিকে চেয়ে
বসে থাকো! ফুল থেকে অন্তফুলে কী ক'রে প্রজাপতি কোন
পথ বেয়ে
হাওয়ার তরঙ্গ তুলে চলে গেল দেখতে পেলে কিনা?
হে সুন্দর যৌবন কেন আত্মমুগ্ধ প্রাণের ছলনা,

কী ক'রে যে প্রজাপতি···জানিনা, জানিনা।

ভাষা।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

এ কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ তোমার এ কার অন্ধকার
স্পষ্ট করে বেবে বলে আজ এই বাংলাদেশের ভারতবর্ষে
এত রক্ত আলোর উল্লাসে তুমি, সূর্যদেব, আকাশে আবার!
আমাদের আলোতে ঘুমাতে বড় কষ্ট হয়, তাই জাগরণে, যেন
প্রথম প্রবাসে,
আমি সেই ওঙ্কারধ্বনি করেকার অঘোষ জন্মের
গর্ভের পাষাণ ভেঙে চীৎকার পৃথিবীর প্রথম বাতাসে।
আলো, আলো, চতুর্দিকে আলো তবু বিদগ্ধ দেহের
কোন ছায়া আজ আর পড়েনা মাটিতে; আলো আলো
সমস্ত শরীর দিয়ে সূর্যের উল্লাস, শুধু মুখের ওপরে নেই আলো।

নদীর সম্মুখে

আশিস সান্যাল

বিশাল প্রান্তর বেঁধে এই নদী। খুব স্বাভাবিক প্রবাহিত নীল ধারা।
দু'পাশে বিস্তৃত ছায়া, নীরব অঞ্জলি।
একাকী মুলত বৃক্ষ। দূরের অতল শান্ত স্থির নির্জনতা। পরম আত্মীয়।
যতো পরিচিত এই ফুল। চন্দন শোভিত বৃক্ষ, শ্যাম তরুলতা।
বিদগ্ধ বুকের প্রান্তে এই যে নিবিড় ভালোবাসা
সে কি জানে, আজন্ম ভিখারী কোনো মুগ্ধ রাঘব
দু'হাতে এনেছে এই রিক্ততার ডালা? শুধুমাত্র তার কথা ভেবে।

দক্ষিণে সমুদ্র ছিল। অথচ কি অভিসার বলা যেতে পারে—
নদীর স্বচ্ছতা তার বুকের গভীরে মেখে নেবে। তাই
এসেছে নদীর খোঁজে। সূর্যোদয় সূর্যাস্তের স্মৃতি
ভুলে গেছে বহুকাল। এখন সে জানে শুধু, চোখে মেখে তীব্রতম মাতাল
পান করে পুষ্পবনে। চতুর্দিকে অন্ত অভিসার।
নরকের মতো তীব্র। অভিলাষ বেঁচে যায় অবন্তী নগরে।

এই যে বিদগ্ধ নদী, চন্দন শোভিত এই শ্যাম তরুলতা
সে কি জানে, আজন্ম ভিখারী এক মুগ্ধ রাঘব
এসেছে অনেক রাতে, শুধুমাত্র তার কথা ভেবে।
এইখানে। প্রান্তর ছাড়িয়ে এই নদীর স্বচ্ছতা
মেখে নেবে বুকের উপরে। কে আছে সন্ধ্যার মতো জ্ঞানী?
আলতো আঁধারে থাকে, অথচ কি মনোরম শান্ত এই বালা,
দূরত্বীরে নিকটে ডাকে। মুগ্ধ করে। বুকের ভেতরে
পূর্ণিমার স্নিগ্ধ জ্বালে মেখে নেব আনন্দের অনন্ত পূরবী।

আলোকপ্রতিমা

প্রকৃতি ভট্টাচার্য

অনহাব অন্ধকারে ওরা যেন রবিঠাকুরের
ছবির শিল্পনে মন অরণ্যের আদিমতা। কী যে
তীব্রানক আকর্ষণ—দিবারাত্রি টানছেই তাকে।
সমস্ত রাত্রিকে নিয়ে কেন ওরা খেলা করে খেলা?
আয়গায় আয়গায় ওই ঘনকালো অন্ধকারে সব—
সব মন্ত্র কিরকম? কিছুতেই প্রেমিক তাহার
কেরাতে পারেনা মুখ, স্বভাবের সহিত বিলবে।

আমরা সবাই তার মূর্তিমান আলোকপ্রতিমা!

স্থিরচিত্র

অনিরুদ্ধ কর

শব্দে কী শিখা আলো প্রিয়তমা সুন্দরী আমার
নিলর্গ-লালিত প্রেমে দিশাহারা আলোর প্রহরী;
দৃষ্টির অদূরে স্থির কৌতূহলী গাঢ় অন্ধকার
এবার সাজাবে ঘর, খুলে মেবে বন্দরের তরী
অচেনা জলের দেশে। তরঙ্গ তরঙ্গ। স্রোতে ঘর
উদাত্ত গম্ভীর, মিশে যাবে ঘুরে উদ্‌ভ্রান্ত বিদেশে।

কিন্তু এ না পরদেশ; মা ছুঁয়িত বিশাল অন্তর,
মেখে কি চিত্রিত শিল্প, হস্তে প্রেম শান্ত হয়ে এসে
বসতি করেছে; মালাবদলের সুখী ঘরিখামি
স্মৃতির বাসরে খোলে, আত্মীয় আত্মীয়। কেনা ও অচেনা
মৃত্তাবলী ছায়া-ছায়া ক্লান্ত; কেউ কি জানো? আমি জামি

পাতালের নীচে দেখা-যায়-না এতদূর নীচে, কে ? না,
উজ্জ্বল আলোয় যাত্রা, শব্দ শুনি বিশাল ধ্বনিতে
স্পষ্ট। উচ্চারণ। স্রোত। ক্রূরতা। বিষাদ। স্মৃতির করুণ,
অভিজ্ঞতা ছায়া-ছায়া ক্লান্ত, ঐতিহাদিক পরীতে
প্রপাতের হাহাকার হয়ে যাচ্ছে মন্ত্র প্রস্তরম।

মৃত্যুর উদ্দেশ্যে

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

ও-মুখ বিষাদময়, বিষাদের মূর্ত প্রতিচ্ছবি
যেমনি সর্বাঙ্গ তোর জ্বলসে গেছে খরকান্তিতাপে
চোখের গহ্বরে বহুযুগাতীত প্রান্তির পূরবী
যেন শতলক্ষ বর্ষ নিমজ্জিত তোর শূন্য পাপে
ও দেহ বিষাদময়, বিষাদের মূর্ত প্রতিচ্ছবি।

কুমারী অক্ষতযোনি কী ঘর্মাক্ত তোর ছায়া দেখে
নারকী কুকুর, তোর লোলুপতা সর্বত্র বিদিত
শবদেহ ছিঁড়ে খেতে রে পাষণ্ড ! যাবেনা বিবেকে
এমন কি হুতাশন তোর ক্লিন্ন স্পর্শ হতে ভীত
পবিত্র কুমারী মাতা কী ঘর্মাক্ত তোর ছায়া দেখে।

তুই সর্বভুক্। পিতৃপিতামহ পূর্বপুরুষেরা
ঝোলে বৃক্ষশাখে, কাঁদে ঊর্ধবাহু সূর্যের সকাশে :
সবিতৃদেবতা, দেখো, পুণ্যধামে অমৃত শাবকেরা
কে করে তর্পণ ? সব সমাধীস্থ বিপুল বিলাসে—
নশ্বরে কাঁদেন পিতৃপিতামহ পূর্বপুরুষেরা।

অসীম অসার আর্ত যৌবনের বিফল প্রতীক
সেই পুণ্যাত্মকের আগমনে আনন্দ আহ্লাদ

মৃত্যুর উদ্বেগে

ঘৃণায় কুঞ্চিত নাসা, ওষ্ঠে ঠোঁটে কোটে পাশবিক
আত্মার উল্লাস, যাচে, যন্ত্রণায় করে আর্তনাদ
বিকল ব্যথায় আর্ত যৌবনের বিকল প্রতীক।

হে ঘৃণ্য লুণ্ঠক তুমি কাপালিক হিংস্র ব্যবাচারী
কত রক্ত চাস্ তুই করোটির কঠিন আধারে?
বালক যুবক বৃদ্ধ সদ্য শিশু পতিব্রতা নারী
কে পায় ক্ষণিক মুক্তি তোর তুষ্টি বিনা কদাহারে
রে ধূর্ত কলুষ ধূর্ত কাপালিক হিংস্র ব্যবাচারী!

তুই সে পুরুষ যার স্পর্শে ওঠে আনন্দের রোল
তুই সে রমণী যার ভাসভাগে চিরনিদ্রা রাজে
নরকের দ্বাররক্ষী হিংস্রমূর্তি সেবানা পাগোল
লক্ষ লক্ষ নরকের ঘোর মৃত্যু চৌদিকে বিরাজে
প্রতিষ্ঠ সবতাস, তোর স্পর্শে ওঠে ক্রন্দনের রোল।

সর্বদা সর্বথা তোর ঘোর মৃত্যু রে মুক্ত পুরুষ!
ক্ষণিক বিশ্রাম নেই তপোরত তাপসের মতো
অজস্র শবের পরে স্থিতাসনা প্রমত্ত কলুষ
হে ত্রিকালদর্শী! তোর বহুরূপী শরীর অক্ষত
যেদিকে তাকাই তোর ঘোর মৃত্যু রে মুক্ত পুরুষ।

ভিন দেশালের ছবি

শান্তি লাহিড়ী

কি করে যে তোর মোহ জমাল আকাশের চাঁদে।
দিদ্যি আরামে পুরোনো বাড়ীর শিহনের ঘর
ভরে তুলেছিলি সকাল সন্ধ্যা, যন্ত্রণাতে

সামনে উঠানে বিকেল হলেই সন্ধ্যামালতী
পাপড়ি মেলতি।
বাইরে আকাশ—কার্নিশ ঘেঁসা আকাশের চাঁদ।
শিহনের ঘর ছবির মতই আরেক দৃশ্যে
রূপকথা হল। বন্ধ, স্তাবল, পৃথিবীর ছবি
অদৃশ্য বাঁকে। শিহনের ঘরে
তাকের ওপর তেলের প্রদীপ, দাশরথী রায়।
সন্ধ্যামালতী।
কি করে যে তোর মোহ জড়াল আকাশের চাঁদে।

দুই।

ব্রাহ্মণ মাতিনা আর, তন্বীদেহে মাতিনা সুন্দরী।
বিষণ্ণ স্বর্গের চক্ষু, প্রতিবিম্ব, পর প্রত্যাশিনী,
মা-মা, আমি যন্ত্রণায় যেতে আছি। বিবর্ণ ঈশ্বর
আমাকে নূতন দৃশ্য তুমি আর কি দেখাতে পার?
বাগানে আকন্দ আর জবারা দাঁড়ায়ে স্মিত মুখে,
রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে কার যে অবাক কণ্ঠ ঘরের দেয়ালে
মা-মা, আমি দীর্ঘদিন পৃথিবীতে বেঁচে থাকবনা।

আমি এক নরীসৃপ, রমনীয় অন্ধকারে ওরা,
ওই সব ঝাঁকাবাঁকা জীবনেরা, ওদের পিপাসা
আমার যন্ত্রণা, আমি উন্মত্ত হবনা অন্ত বিষে।
তুমি আর দাঁড়াবেনা লোকচক্ষু-বিদ্ধ অভিসারে।
ব্রাহ্মণ মাতিনা আর। পিছিল গোপানে আলো নেই,
সেইখানে নিয়ে চল, দৃষ্টিহীন বধির ঈশ্বর
প্রতিবিম্ব দেখে যদি বিকল্প স্বর্গের খোঁজ করে।

আমি তাকে সঙ্গে নেব, তাকে আমি সঙ্গে নেব অন্ত অন্ধকারে।

তিন।

সারাটা সকাল ধরে কাল ওখানে শিউলি ঝরে গেছে

তিন দেয়ালের ছবি

আজ তার কোন চিহ্ন নেই। শুধু মধুবাতা ঋতায়তে,
চন্দনের সর্পিল শরীর আর স্মৃতির কঙ্কাল।

কবে সে হয়ত কবে আমি যে ছিলাম ওইখানে,
ওই তৃণাকৃতি বনে, শ্বেতশুভ্র দিনান্তে দিনান্তে,
মণিকর্ণিকার ঘাটে, লালাফুলে, কপিক অশ্রুতে।

কি দেখেছে? আমি নাই, আমি নাই, আমি কোনখানে
নাই। আমি ওই অন্ধবালকের হাতের ওপরে
তীব্র অভিমান নিয়ে রাত জেগে সকালে শুকাব।

অন্ধবালকের চোখে অন্ধকার পৃথিবীটা
ভুল হবে প্রতিভাত হবেনা কখনো।

জনম-যন্ত্রণা

পরিমল চক্রবর্তী

মনে রেখো, চিরায়ত যৌবনের জনম-যন্ত্রণা
ব্যর্থতার অন্ধকারে কোনোদিনো আত্মঘাতী নয়।
যদিও বা আকাঙ্ক্ষার ব্যভিচারী অনেক যন্ত্রণা
স্পষ্ট হয় সেই লগ্নে, তবুও তো নৈষ্কর্ম্যের জয়

অনায়াসে জয় করে আপনার স্বকীয় অন্বয়ে
যৌবনের কামুকতা জেগে ওঠে প্রাণের প্রাঙ্গনে;
তাছাড়া তাখোনা কেবে: শোক-দুঃখ-মৃত্যু-জরা-ক্ষয়ে
শুধু এই জীবনের চারিধারে মাঠ নদী বনে

কেমন বিবর্ণ চিত্র বেঁচে আছে আজন্ম আবেশে!
অথচ যাঁধার শিলা চূর্ণ করে জীবন-কাবেরী
বয়ে চলে মহাবেগে সাফল্যের সমুদ্রের পাশে।

উত্তরসূরী

এ-চিত্রের পাশাপাশি তুমি আমি মরণের শেষে
একটু স্থানের জন্ত লালায়িত : জনমের ফেরি
চিরকাল ছোটে তাই যৌবনের দুর্নিবার টানে।

বুড়ো লোকটা আর সমুদ্র

(আর্নেস্ট হেমিংওয়ের স্মৃতিচারণ)

দেবব্রত চক্রবর্তী

কোথায় চলেছ তুমি, এখুনি কোথায় যাবে এমন অধৈর্য।
পথ বেয়ে ? কাকে চাও ? কী তোমার আকাঙ্ক্ষা ? বলো তা
আমায় বলো, একটিবার থামো। হায় সমুদ্র থামে না,
থামে নি, থামবে না কভু !—বুড়ো লোকটা জানতো সে কথা।

তাই সে পিয়েছে শুধু ঘুরে ঘুরে আরো ঘুরে আদিগন্ত নীলে
নিবিড় কেনার মতো। উত্তর পেতেই হবে। আজ এইখানে
অনেক শীতের শুধু নীরবে পেরিয়ে আসা রক্তের মিছিলে
পেয়েছে নতুন স্বর অভিসারী জীবনের লোনা জল ছেনে।

পথের তো শেষ নেই, এখনো অনেক বাকি, শ্রান্তির বেলাতে
সাদা কাশার দাগ জমে আর কপালে ক্লান্তির বলিরেখা ;
পাশের আসনটি খালি, আহা থাকত যদি ! তবু সে দু'হাতে
মকরের মুখ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে তার আগামী অদেখা।

তারপর একদিন বুড়ো লোকটা শেষ ক'রে সব বেচাকেনা
ফিরেছে মাটির ঘরে, জেনে গেছে জীবনের সমুদ্র থামে না।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা

শোভন সোম

যুক্তির পক্ষে, আলোচনার খাতিরে তত্ত্বাদির বিশিষ্ট উদ্ধৃতি, বিদেশী কবিতার বিচ্ছিন্ন নজীর এবং বিশেষ কোনো সাহিত্যকীর্তিকে ক্রস যেপে তার আলোকে আলোচ্য বিষয়ের তুলনামূলক ভেদ তখনও অপরিহার্য্য কিনা—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে এ প্রশ্ন আমাকে গভীর ভাবে চিন্তিত করেছে। আধুনিক বাংলা কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে বিদেশী কবিতার উত্থাপন, সম্প্রতি যখন আধুনিক বাংলা কবিতা যথেষ্ট উচ্চ মান অর্জন করেছে, সেক্ষেত্রে অতঃপর সর্বত্র বাঞ্ছিত কিনা, আজ ভেবে দেখা উচিত বৈকি। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খাঁটি বাঙালী কবি এবং দেশ ও ভাষার প্রতি তাঁর অকপট ভালবাসা তাঁকে বৃহত্তর পৃথিবী এবং মানবিকতার প্রতি নিবিড় ভালবাসার মন্ত্র দিয়েছে।

পাঠকদের সঙ্গে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার প্রধানতম শর্ত ভালবাসা এবং সরলতা। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এই হতাশার যুগে, মানবতার চরম সর্বনাশের দিনেও আশাবাদী। এই শতকের চতুর্থ দশক আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকার অধ্যায়। চতুর্থ দশকের সূচনায় ঐশ্বর্যতম—রবীন্দ্রনাথের তিরোধান, এবং অন্তে নিজবাসভূমে পরবাসের যন্ত্রণা। মন্বো দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, রাজনীতি, দেশ বিভাগ এবং সমগ্র জাতির দেউলে হয়ে-যাওয়া। এমন অস্বস্তিকর পরিবেশে সুস্থ মানবিকতা জীইয়ে রাখা আশ্চর্য্য প্রত্যয়ের পরিচয়। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই দশকের কবি হয়েও 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'এর কবি হননি কিংবা শেলীর মত কল্পিত মোক্ষের সুরভি ইচ্ছা প্রকাশ করেননি এবং তারো চেয়ে আশ্চর্যের কথা, সম্মুখে রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতার বাহক ত্রিশের কবিদের অঘোষ উপস্থিতি সত্ত্বেও তাঁর কবিতায় আমরা কোনো অনুসরণ বা ছায়া দেখতে পাইনা। ত্রিশের প্রভাব থেকে মুক্তি চল্লিশে তো বটেই, পঞ্চাশের কবিদের পক্ষেও তাঁদের কবিজীবনের প্রারম্ভ কালে প্রায়

অসম্ভব ছিলো। তাঁর আবির্ভাবের যুগের কথা স্মরণে রেখে এবং তাঁর কবিতার বিশেষ লক্ষণের দরুন—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার আলোচনা তাঁরই কবিতার আলোকে না-করে উপায় নেই।

চল্লিশের যুগে বাংলাদেশে তথাকথিত রাজনৈতিক কবিতার জন্ম হয়েছিলো এবং পাশাপাশি, বাস্তব সমাজ ও যুগচিন্তা চল্লিশেই প্রথম প্রত্যক্ষভাবে কবিতাকে স্পর্শ করে; কবিরা স্বরচিত কল্পনার বৃহ ভেদ করে মানুষের গভীরে প্রবেশ করার তাগিদ অনুভব করেন। রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়েসের আক্ষেপ এবং ক্রমবর্ধমান জীবন সংগ্রাম থেকে এই তাগিদের আংশিক উৎপত্তি হয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের কবিতা ও গান, নজরুলের বিদ্রোহাত্মক কবিতা, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাধারণ মানুষের কথা বলা কবিতা কিংবা যতীন সেনগুপ্তের তীব্র শ্লেষাত্মক কবিতার পর্যায় পেরিয়ে চল্লিশের যুগে রাজনৈতিক আদর্শবাদের গন্ধযুক্ত বিশেষ ধরণের কবিতা লেখা হতে লাগলো। এমন কি, চল্লিশের যে সব কবি আজ পরোক্ষে নিরাশাবাদী ও রোমান্টিক কবিতা লেখেন, তাঁদের কারো কারো প্রারম্ভিক পর্যায়ের কবিতায় আমরা সোচ্চার বিদ্রোহ ও রাজনৈতিক আদর্শের স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পাই।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রাজনীতি মানবিকতা; তাই তাঁর রাজনৈতিক কবিতার আবেদন সর্বজনীন। তাঁর কবি-মন কোনো আরোপিত বাহ্যিক আদর্শবাদে বিভ্রান্ত নয়। তাঁর 'রূপকথা', 'ফিনা অফিসের সামনে', 'যুদ্ধের বিরুদ্ধে' 'চোখের জল জমে' এবং আরো বহু কবিতা আমার উক্তির স্বপক্ষে উল্লিখিত হতে পারে। তাঁর এ ধরণের কবিতার ক্রমবিকাশ পাঠকদের কৌতূহলী করে তোলে। ১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে লিখিত তাঁর একটি কবিতায় আমরা পাই:

'নতুন প্রভাত! এসেছে দুয়ারে নতুন জীবন, বান্ধবি।
হাসরে, স্নেহের আরতি আলালো এ শিশু তোমার, স্বর্গ।
মম আজকের শ্রেষ্ঠ শপথে শেষ হলে তুমি, বান্ধবি।
রক্তে মাংসে শিরায় শিরায় দান করে গেল স্বর্গ॥'

(সূর্যোদয় ১৯৪৬-৪৭)

এবং ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে 'ফিনা অফিসের সামনে' কবিতায়:

'মুটি কঠিন পাথরের মুখ
খোদাই করা

বিভাগ দুই জোড়া ঘোলাটে চোখ
অনুক্ত রক্তের তোলপাড়ে একই অধিকারে মৃত পিতাকে স্মরণ করেছিলো।
আর এখন এমন দিনে
যদি সে দুখ আবার মনে পড়ে, রক্তে বাজে না-দেখার কঠিন ব্যর্থতা
তখন কোথায়, কোন রাস্তায় এসে দাঁড়াবে
দুটি সৎ ভাই? সমগ্র আকাশটাই যেখানে দেয়াল দিয়ে আপাদমস্তক ঢাকা।

আর ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি অনুভব করেন :

'কোথাও একটি দুখ নেই যন্ত্রমতীর আশ্রিত
পাথর প্রতিমা করবে যেই সিলা, শ্রষ্ট পিতৃপুরুষের পাপে
প্রেমের রক্তাক্ত দেহ কাঁধে নিয়ে মানব চৈতন্য আজ
সর্বত্র হ' ফুট জমি মাপে।' (যখন যেদিকে যাই)

এতদসত্ত্বেও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অস্থির চরিত্র কবি। তিনি কখনো তীব্র রোমান্টিক, কখনো তীক্ষ্ণ বাগ্‌প্রিয় এবং কখনো রাজনীতিক। প্রেমে তাঁর কোনো অনীহা নেই ; মানুষের প্রতি শেষ পর্যন্ত তিনি গভীরভাবে বিশ্বাসী। তাঁর অস্থির চরিত্র, বিভিন্ন প্রসঙ্গে যত্রতত্র বিচরণ, তাঁকে নিরন্তর সৃষ্টিতে মগ্ন রেখেছে এবং চল্লিশের কবিদের মধ্যে তাঁরই কবিতার সংখ্যা সর্বাধিক। তিনি কোথাও স্থূল নন, কোথাও বিরতির আনন্দ তাঁকে স্থির করে রাখেনা এবং অনুভূতিই তাঁর প্রেরণার উৎস। তাঁর আশ্চর্য রোমান্টিক কবিতা সুরের আপাত ভিন্নতা ও আঙ্গিক লাবণ্যের জন্য পাঠককে বিস্মিত করে। 'সোনার চাঁদ ছেলে', 'কবিতার জন্ম', 'চিরন্তনী উমা', 'সহবাস' প্রভৃতি কবিতাকে তবু আমি নিছক রোমান্টিক অভিধায় চিহ্নিত করিতে পারি না, কেননা উক্ত কবিতা সমূহে রোমান্টিক আবরণের ভিতর অন্য গভীরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ আমার নিকট অত্যন্ত সহজ লক্ষ্য।

প্রথমেই উল্লেখ করেছি, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার অন্যতম শর্ত সরলতা। অতীতির বহির্লক্ষণ তাঁর কবিতায় কখনো ইচ্ছাকৃত ভাবে প্রকট হয়ে ওঠেনা বলে তাঁর কবিতা শাব্দিক ও তাত্ত্বিক কাঠিন্য থেকে সর্বদা মুক্ত এবং আধুনিক কবিতা লেখকের পক্ষে এমন কৃতিত্ব ঈর্ষণীয় সৌভাগ্য। এই সরলতাই কবিতায় ছন্দ ও শব্দ প্রয়োগ সম্পর্কে তাঁকে দ্বিধামুক্ত করেছে। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা সাধারণতঃ ক্রত লয়ের ছন্দে বাঁধা হলেও

তিনি গদ্য এবং গদ্য মিশ্রিত ছন্দে অবতি বোধ করেননা। তাঁর নির্বাচিত কবিতা 'সহবাস' গদ্যের আদিকে রচিত এবং সাম্প্রতিক বহু কবিতায় তিনি গদ্যের ব্যবহারে আগ্রহী।

চল্লিশ পঞ্চাশ এবং ষাট এই তিন পর্যায়ের ক্রমবিকাশ তাঁর কবিতায় দৃষ্ট হলেও, কবি এর জন্য অতি পরিশ্রমশীল কিংবা ইচ্ছুক এমন ধারণা হয়না। এই ক্রমবিকাশ স্বাভাবিকভাবে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে এবং এই পরিণতির পিছনে রয়েছে কবির ছুরন্ত অতৃপ্তি। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা তৎসত্ত্বেও অপ্রবুদ্ধ; তাঁর কবিতা একাধারে আনন্দ-বেদনা সুখ-দুঃখ আলো-অন্ধকার চেতনা-অচেতনার দুর্লভ চিত্রশালা। স্বল্প রেখায় গভীর ব্যঞ্জনা, ঈষৎ বর্ণে ছায়া ও উজ্জ্বলতা সম্পাত তাঁর কবিতার মূর্ত বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে রোমান্টিক চেতনার দুর্লভ সামুজ্য সাধন তাঁর কবিতাকে বহুর মধ্যেও উজ্জ্বল করে রেখেছে। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা ইত্যাকার গুণের দরুনই কেবল নয়, বক্তব্যের নবীনতা এবং স্পষ্টতার জন্য এমন এক স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে, যার বলে পাঠক প্রথম পাঠেই তাঁর কবিতাকে চিনে নিতে পারেন। অপ্রার্থিত বর্তমান, মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব তাঁকে গভীর ভাবে চিন্তিত করে, তবু সমস্ত বিঘ্ন এবং হতাশাকে তিনি তুচ্ছতা ভিন্ন অন্য মর্যাদা দিতে পারেননা। চল্লিশের যুগের নিদারুণ অস্তিত্বতা থেকে তিনি বাঁচবার এবং মানবিকতাকে বাঁচিয়ে রাখার এমন দৃঢ়তা অর্জন করেছেন।

তবু তাঁর মধ্যে দুটি বিবদমান সত্তা বর্তমান। একটি আপাত অস্থির অপ্রত্যয়, যা এই শতকের বহু পর্যায়ে অতি স্বাভাবিক,—এবং অন্যটি তাঁর স্থির প্রত্যয়—যে ধ্রুব তাঁকে বিশ্বাসে অবিচল রেখেছে। তাই 'বিষণ্ণতা' কে 'হৃদয়ে পাব বলে' তাঁর ইচ্ছার পরিশেষে 'কোথায় তুমি বিষণ্ণতা, কোথায় রে যৌবনে ক্লান্তির আনন্দ' তিনি বলতে পারেন। তাঁর কবিতাকে তাঁরই কথায় 'অতৃপ্তির রঙে খেলে চিত্রীর আশ্চর্য' বলা যায়।

কাব্যনাটিকা রচনায় চল্লিশের কবিগণ ইতিমধ্যেই সপ্রশংস নিপুণতা ও সফলতা অর্জন করেছেন। কবিতার এই বিশেষ ধারাটি ত্রিশে অবহেলিত ছিলো। চল্লিশের কবিগণ কাব্যনাটিকাকে নবতম মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁরা কাব্যগন্ধী বিশুদ্ধ কাব্যনাটিকা রচনা করেননি; প্রতীকের মাধ্যমে, অনুভবের উজ্জ্বলতায় জীবনের তথা বর্তমানের বহুবিধ চেতনা ও অভিজ্ঞতাকে কাব্য

নাটিকায় প্রয়োগ করেছেন। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'ভাইয়ের মুখ', 'তীর্থ-মিলনির ভীড়ে', 'মায়ের মুখ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কাব্যনাটিকা। উক্ত কাব্যনাটিকা সমূহের পাত্র এক একটি অর্থবহ প্রতীক রূপে সংলাপের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। এতদ্ভিন্ন, শব্দের প্রতীকী তাৎপর্যেও তাঁর কবিতা উজ্জ্বল। 'অন্ধকার' 'সূর্য', 'খিদে', 'বৃক্ষ', 'পিতামহ' প্রভৃতি শব্দ তাঁর কবিতায় প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইতিপূর্বে প্রচলিত প্রতীকের ব্যবহার ভিন্ন অন্যান্য শব্দের মধ্যেও প্রতীকী তাৎপর্য আরোপেও অক্লান্ত। তাই 'লুম্বিনী' 'ঊষাদাগার' 'গঙ্গোত্রী' প্রভৃতি শব্দ স্বাভাবিক প্রতীক হিসেবে তাঁর কবিতায় আসে।

শব্দের ব্যবহারেও তিনি সংস্কার-মুক্ত। 'অশ্রুর কোমল', 'শান্তির কোমল' 'মোহনিয়া বন্ধুরে', 'বিষ্যার বলিন' প্রভৃতি ব্যবহার শব্দের শক্তি সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করে তোলে। পংক্তির গঠনেও তাঁর আশ্চর্য দক্ষতা নিয়ে উদ্ধৃত পংক্তি সমূহ সপ্রমাণ :

১ 'ও তনু তোমার কলস ভরার ছল'। (যমজ)

২ 'ওরে তার গঙ্গোত্রীর আশ্চর্য প্রার্থনা···। (চিরন্তনী উমা)

৩ 'পরিতপ্ত মানবতাই জীবন।' (শ্বেতকারদের জন্য) এবং,

৪ 'আজ সে রূপোলী জ্যোৎস্না নেই, কোনো শরীর নেই, পিপাসা নেই—
একাদশীর বিধবা আকাশকে জড়িয়ে ধরে বসি আর অন্ধকারে মাথামাখি
পড়ে আছে একটা পাড় ভাঙা চাঁদ।' (সোনার চাঁদ ছেলে)

৫ 'মায়ের মুখ দেখবো বলে আমি
দ্বিপ্রহরে পাষাণ মন্দিরে
পাগল হয়ে ঘুরেছিলাম। মা
মুখোশে ঢাকা কালো পাথর মুখ।' (মায়ের মুখ)

৬ 'কালো মেঘের কিটন চ'ড়ে
কালিঘাটের বস্তিটাতেও আষাঢ় এলো।
সেখানে যত হরহাড়া পলিরা ভিড় ক'রে
খিদের জ্বালায় হুগলি-গন্ধাকেই
রোগা মায়ের স্তনের মত কামড়ে ধ'রে
বেহুঁশ প'ড়ে আছে।' (বর্ষা)

আকাশিনী ও মৃন্ময়ী ॥ বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ। কলিকাতা-১২।

ক'টি কবিতা ও একলব্য ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। জ্ঞানদাস বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ। কলিকাতা-১২।

অন্ধকার বারান্দা ॥ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। কৃত্তিবাস প্রকাশনী। কলিকাতা-৪।

মিলিত সংসার ॥ অরুণ ভট্টাচার্য। কবিতা মেলা। কলিকাতা ১২।

রবীন্দ্রনাথের পর থেকে নয়, রবীন্দ্রনাথের শেষের দিক থেকে কবিতার যে ধারা বা রীতি, ছন্দ বা অলংকার রূপ পরিগ্রহ করেছে, তার উজ্জ্বল উপস্থিতি আজো বিরাজিত। আজো রবীন্দ্র প্রকৃতির উপস্থিতি লক্ষণীয়, আধুনিক কবিতার সংকলনগুলিতে যেখানে পঞ্চাশের তরুণকবিরা পর্যন্ত আমন্ত্রিত, সেখানে সুরু হয় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। সে কারণেই, আজকের আধুনিক কবিতার চিন্তা, কর্ম, নৈপুণ্য, ছন্দ অলংকার পর্যন্ত হাওয়াবদল হলেও রবীন্দ্রনাথের মাটি ও প্রকৃতির পালা বদল হয়নি। কিন্তু উনিশশো তিরিশ বা চল্লিশের উল্লেখযোগ্য কবিরা সেই আলোয় স্নান করেন নি, সে আলোয় চোখ খুলেছেন, মুখ তুলেছেন; অভিভূত হন নি, স্তম্ভিত হন নি, বরং সে আলোয় নিজেকে স্পষ্ট দেখতে পেলেন, দেখে নেবার সুযোগ হওয়ায় নিজেকে সতর্ক করে নিয়েছেন। তিরিশ ও চল্লিশের মধ্যে যাঁরা নিজেদের আসন নির্দিষ্ট এবং চিহ্নিত করে নিয়েছেন তাঁরা সংখ্যায় খুবই অল্প কয়েকজন হলেও, বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল।

সব যুগেই বিভিন্ন শিল্পকর্মের সুরুতে নিয়োজিত হন অনেকেই, কিন্তু বৈশিষ্ট্যে অলংকৃত হন কয়েকজন মাত্র। তিরিশের কবিদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যতীত আর কারো নাম মনে আসে না; অন্যান্য অনেকের মধ্যে অনুকরণ বৃত্তিই যেখানে সহজ সুলভ, সে ক্ষেত্রে বৈপরীত্যে প্রধান জীবনানন্দ,

সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নজরুল ভট্টাচার্য, বিষ্ণু দে, তেমনি চল্লিশের কবিদের মধ্যে সেই বিশিষ্টতায় যাঁরা উজ্জ্বল তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কামাক্ষীপ্রসাদ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, সুকান্ত, মঙ্গলাচরণ, অরুণকুমার সরকার, বীরেন্দ্র চক্রবর্তী, অরুণ ভট্টাচার্য প্রভৃতি। এঁরা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র, ব্যক্তিত্বপূর্ণ চরিত্রবান কবি।

চল্লিশের কবিদের মধ্যে একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হলো তাঁদের অস্থিরতা। যে অস্থিরতা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দিনের পর দিন পরিবর্তন এনে দিয়েছে, সে লক্ষণ যেমন জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের মধ্যে দেখতে পাই, চল্লিশের কবিদের মধ্যেও কয়েকজনের মধ্যে সেই অস্থিরতা বর্তমান। এ যন্ত্রণা আবিষ্কারের, স্বীকৃতির। চিন্তা বিবর্তনের। শুধু অস্থিরতা নয়, শাস্ত্রসমাহিত স্থিরতার মাঝখানেও কয়েকজন কবির শিল্পায়ন স্মরণীয়। কোন কোন কবিকে ছন্দ নিয়ে যাদু খেলতে দেখেছি, তাদের হাতে ভাষা ও শব্দের ওপর আশ্চর্য দখল উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও চল্লিশের কবিদের প্রস্তুতিপর্বে মহাযুদ্ধের সুর, বাংলার কাব্য সাহিত্যে যার ফলে স্পষ্টত দিক পরিবর্তন ঘটেছে।

বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানত রোমান্টিক কবি। তাঁর প্রথম কবিতার বই 'অবতামসী আবার রাত্রি'র উৎসর্গ থেকে কটি পংক্তি উদ্ধৃত করছি,

এ-জীবনে কতো প্রাণ দূর হ'য়ে গেলো—
কতো গান।—তারে যায় দিক এ কবিতা।
ঊর্মিল সহস্র কতো উল্লাস হারালো,
কতো দুখ ধ্রুব হ'লো, দুখের মুকুতা—

এখানেই বিষ্ণুবাবুর কবিতার বিষয়বস্তু মোটামুটিভাবে বিধৃত। বিষ্ণুবাবুর প্রথম বইখানিই উল্লেখযোগ্য বই। এই দশকের সেই যন্ত্রণা, সেই অস্থিরতা দেখতে পাই বিষ্ণুবাবুর প্রথম দিককার কবিতায়। ছন্দ নিয়ে প্রচুর পরীক্ষা নিরীক্ষা তিনি করেছেন। 'অবতামসী'র কবিতা, কোনো মৃত্যু-শিয়রে আবহমান, আসন্নের পতন, যাদবীর দিকে প্রভৃতি অনেক কবিতাই এর সাক্ষ্য দেবে।

'আকাশিনী ও বৃশ্চিকী' বিষ্ণুবাবুর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। বিষ্ণুবাবু কোন গভীর তত্ত্ব বা তর্কে আক্রান্ত নন। রাজনৈতিক বা সামাজিক বাঁজেও তারাক্রান্ত নন। সমসাময়িক কোন ঘটনা বা জীবনযন্ত্রণা তাঁকে ব্যথিত করে না।

তিনি অনেকটা আপন চিন্তার ছক, ও ভূমিতে একটি স্বর্গ রচনা করে নিয়েছেন। সেখানে কোন হট্টগোল, চীৎকার নেই, তিনি একা, এবং বিশ্ববাবু স্মৃতিকে, অতীতকে ভুলতে না দিয়ে বরং প্রীতির সঙ্গে মনে রাখতেই ভালবাসেন। কোথাও কোথাও তিনি এমন রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করেন যে পাঠকমন মুগ্ধ করে দেন। যেমন বৌ-ডোবা দিঘি ও ভাঙা মহল কবিতাটি :

হঠাৎ যাওয়ার খাস ছাতে যদি চৌধুরীদের ভাঙা মহল
হঠাৎ যাওয়ার কেঁপে ওঠে যদি বৌ-ডোবা পানা দিঘির জল
স্মৃতির শিহরে কেঁপে ওঠে বোবা মরণ তিল
নূপুর কাটিয়ে জেগে যায় যদি ঘুঙুর চিল
বুক চিরে চিরে কান্নার মতো করুণ ডাক
বাকিটা বলুক চৌধুরীদের ভাঙা পাঁচিল।

কবিতার নামকরণ থেকেই তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু ধারণা করা যায়, যেমন, মিলের রাতের প্রেমের কবিতা, হাসি তবু হলো ইতিহাস, বিবর্ণ বিকেল, কথারা ঘুমোলে পর, বিষণ্ণ বৈশাখী, আষাঢ়ের দিবা স্বপ্ন, প্রেমোত্তর প্রেম, একটি গাঁয়ে দুটি ভোর প্রভৃতি।

অন্ত্যমিল বা অন্ত্যানুপ্রাস সম্পর্কে আধুনিক বাঙালী কবিরা অতিমাত্রায় সচেতন। নিঃসন্দেহে তাতে প্রভূত বৈচিত্র্য ও সৌকর্য সৃষ্টি হয়েছে। এই অন্ত্যমিল বা অন্ত্যানুপ্রাসে বিশ্ববাবুরও বেশ খানিকটা স্বাভাবিক ঝোঁক বা দুর্বলতা আছে। এবং তিনি অনুপ্রাসপ্রিয়, একথা বললে অত্যুক্তি হবে না।

দুর্গম বড়ো ঘাসফুলে ওধারে দুর্বল তুই ফিরেই চল।
দুর্বল মেলা চক্ষে ঘনায়……

এনেছে এ-পথে দুর্বিষ আশা দুর্বার ভাবে প্রায় টেনেই। (উত্তর-পৌরুষিক)
বা, ধুসর বন, হে নির্জন অর্জনে দাও ভ'রে, (ধুসর বন, হে নির্জন)
বা, ঠোঁটে যার অলকার নায়িকার বিরহের চিঠি। (আষাঢ়ের দিবাস্বপ্ন)
বা, সে কার আসার কথা বাতাসের বাসার উদ্ভিদ্ভ। (বিষণ্ণ বৈশাখী)
'আকাশিনী ও বৃশ্চিকী'তে এমনি অনেক উদাহরণ ছড়িয়ে আছে।

কবিতার শরীর গঠন নিয়ে বিশ্ববাবুর অস্থিরতার শেষ নেই, ফলে, বিশ্ববাবুর মধ্যে বহুবিধ পরীক্ষা দেখতে পাই। বহু প্রকার ছন্দের মাত্রা মিলের চর্চা তিনি করেছেন। তবে মাত্রার ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে পাঁচ মাত্রার কবিতা

চনায় তাঁর আগ্রহ ও নৈপুণ্য বেশি। কাব্যশরীর নিয়ে অধিক চর্চার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মার অন্তর্ধানই প্রকট হয়ে পড়েছে। যেমন কোথাও কোথাও তাঁর ভিন্নমাত্রার মিলগুলি (চিত্রাচারিণী কবিতা দ্রষ্টব্য) খুব হয় নি. বালক-পালক, অনেক-কণেক, এলেমা-খেলেমা, নিশ্বাস-বিশ্বাস, পার-অপার। দুমাত্রার মিলও বৈচিত্র্যহীন দুর্বল মনে হয়,

"ক্রমাগত বলে, কই ? বলো তবে ? বলো, বলো, বলো—
শুনে শুনে নদী জল আরো যেন হ'লো ছলোছলো।

(হাসি শুধু হলো ইতিহাস)

'ডাক পাখি' একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। এই কবিতার ক'টি পঙ্‌ক্তি ও শব্দ নিয়ে আলোচনা করব। যেমন দশম লাইনে,

'গানই যদি হয় তবে কী যে তার মানে
প্রাণ অন্তত তার কিছু-কিছু জানে'

এই অন্তত শব্দটি ক' মাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছে ? নিশ্চয়ই চার মাত্রায়। অন্যত্র

তীক্ষ্ণ চঞ্চু, রক্তাক্ত চিবুক—
ডাক তার খেলা কিংবা হবে কোনো যুদ্ধের কৌতুক।

এখানে তীক্ষ্ণ, চঞ্চু, ডাক, তার প্রভৃতি শব্দ দু মাত্রা এবং রক্তাক্ত, যুদ্ধের, কৌতুক প্রভৃতির ত্রিমাত্রিক ব্যবহার। 'অন্তত' শব্দটিকে চার মাত্রায় পড়তে গেলে 'ন্ত' যুক্ত অক্ষর ভেঙে পড়তে হয়, এমনি আরো দুটি শব্দ দেখা যাক্।

'বিবর্ণ যতো দাগ ; কে কবে দিয়েছে বেঁধে সেই সে ওষুধ রাখি
ভুলে গেছি ; ফেলেছি সে সব নকল—
বুকের পরতে তবু ঢেকে রাখি এ পিশাচ পাখি।'

যমন বিবর্ণ ও নকল শব্দদ্বয়। 'অন্তত'র তার এদেরও টেনে টেনে পড়তে হবে, নতুবা চার মাত্রা হয় না। প্রসঙ্গত বুদ্ধদেব বসুর 'পাহাড়' শব্দটিকে টেনে চার মাত্রায় নিয়ে উচ্চারণ করতে হবে নির্দেশ করে পড়ল। এবং এক মাত্রার শব্দকে দুমাত্রায় ব্যবহার লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে অবশ্য শব্দগুলি না বলে বললেও চার মাত্রায় টেনে নিয়ে পড়তে হবে,

"এরা তো বাঙালী নয়, কী করে বুঝবে
মা, বাবা, ভাই, বোন, স্বামী স্ত্রী
এ সব কথার মানে কী।

এখানে তিনি মা, স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতি শব্দকে দু'মাত্রার নিয়ে উচ্চারণ করিয়েছেন।

বিশ্ববাবুর 'ক্লান্তি' কবিতায় ক্লান্তিকে তিনি বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাখ্যা করেছেন। কবিতাটি উপভোগ্য।

টেবিলে যখন বসি সাহিত্য সামনে
মুখোমুখি সেও থাকে একা গৃহ কোনে
অসীম বিস্ময় নিয়ে শকুনের মতো চোখ
এক দৃষ্টে বিভৃষ্ণা ছড়ায়—

অন্যত্র বলেছেন, আলিঙ্গনাশ্লিষ্ট শত্রু—এই ক্লান্তি উন্মাদিনী নারী

প্রেম-বিরহ এর সর্বনাশা গাঢ় আলিঙ্গন—

আবার, এই ক্লান্তি নিশীথের ক্রুদ্ধ অন্ধকার,
তিমিরে উৎকীর্ণ মূর্তি অমেয় ক্ষুধার।

এবং পাশের শয্যার প্রান্তে তিমির-দেহিনী কোনো বিবসনা নারী—

এই 'পাশ' শব্দটি কবি কি অর্থে ব্যবহার করেছেন বোঝা গেল না, কোনো নারী মিলনের প্রতি কবিতায় পাশ শব্দটির আরেক অর্থের সূচনা করে।

পাশের মতো সোহাগ তার, পাশের মতো মিষ্টি
জেগেছে তবু হয়েছি তারই মাধুরী-অনুরক্ত।

পশ্চিমী মেয়ের মধ্যে কবির চোখে শুধু তার নিটোল দেহের ঢেউটাই চোখে পড়ল। 'একটি গাঁয়ে দু'টি মেয়ে' কবিতায়,

পশ্চিমী মেয়ে নিটোল দেহের ঢেউ
দুলে হাটে চলে সজী-পসরা নিয়ে।

বর্ণনায় কোথাও কবি অধিক উগ্র হয়ে পড়েছেন, মনে হয় একটু স্পর্শকাতর,

বিশারী হ'লো তখন থেকে তুষার-শুভ্র তার
বুকে পাহাড়,
নাম রেখেছি চুড়ালা রাণী অনেক চুড়া দেহে। প্রভৃতি

তিরিশ-দশকের অন্যতম কবি বুদ্ধদেব বসু বাংলা কবিতায় চুলের যে প্লাবন এনেছিলেন বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থও (প্রকাশকাল ১৩৬৬) যে সে প্লাবনের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে নি, এ অত্যন্ত দুঃখের কথা নয় কি। 'পরিনারী' কবিতাটি বিশেষভাবে পরীক্ষামূলক। বিভাপতির হাতক দরপণ, মাথক ফুল। নয়নক অঞ্জন, মুখক তাম্বুল। হৃদয়ক মৃগমদ,

পীয়ক হায়। যেহেক সরবস, গেহেক লয়ে॥ কবিতাটির বাসহারে লিখিত। কিন্তু এতো 'চুল' কেন?

(১) দেখে দেখে যে বাঁধলো বৈকালে চুল··(২) ভেসে গেলো কেশগন্ধী বৈকালী বাতাসে···(৩) গল্পিনী তারো শুধু রাত আছে চুলে···(৪) চুলের—চুলের—সব মেহের সীমায়। প্রথম কবিতাটিতে, (৫) চাষ-করা-চুল শুকানো চুপুর···(৬) উর্বার মতো চুল যার আর ইত্যাদি ইত্যাদি। অন্তত এবিষয়ে বিষ্ণুবাবুর চেতনায় বুদ্ধদেব বসু বড্ড বেশি আচ্ছন্ন হয়ে আছেন।

'হেমন্ত সন্ধ্যায় : শুকতারাটে একটি সার্থক কবিতা।

একটি সুখ তারকা ধ্রুব উত্তরের আর যা নাই কুয়াশা শিরবাসি

অন্যত্র বলেছেন, আকাশে আর মাটিতে সেই নিগূঢ় পরিণয়

জীবনভর পরের পর তারি তো গান গাই—

নতুন নয়, পুরোনো সেই পুরোনো কথাটাই।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় এই দশকের একজন বিশিষ্ট কবি। রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ কবিদের মধ্যে মঙ্গলাচরণ অন্যতম। মঙ্গলাবাবুর শ্রেষ্ঠত্ব স্বাক্ষরিত হয়ে আছে তাঁর 'মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়' বইটিতে। তাঁর কবিতায় যেমন যুদ্ধের প্রভাব, তেমনি সমসাময়িক পরিস্থিতির ছায়াপাত লক্ষ্যণীয়। বিচ্ছিন্ন সংসারের নানা খণ্ড চিত্র, অনেকটা টুকরো-টুকোরা অমৃত ঈশ্বরের মত—কুটিকুটি সংসার ছড়িয়ে আছে ম্যাটকর্মে—বেদনাময় চিত্র, জীবনের, সংসারের ঘরছাড়া কতদিনের জর্জর হৃদয়ের যন্ত্রণাকাতর ছবি,—ধরণী কবির হাতে এই সব জীবনের ছবি জীবন্ত হয়ে উঠেছে—

এসে দেখে যাও কুটিকুটি সংসার।

চৈতনের ম্যাটকর্মে ছড়ানো যে-আজ সংসারে (এস দেখে যাও)

যাদুমন্ত্রে খণ্ডিত করে ঈশ্বর নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। নিজেকে বিশ্লিষ্ট, বিদলিত, বিতাড়িত, বিধ্বস্ত করেছেন। রাজনৈতিক চিন্তাধারায় শুধু শক্তশালিত্ব করেন নি। মানব জীবনের যন্ত্রণাকাতর দুর্দশাগ্রস্ততাই তাঁকে আলোড়িত করে নি, রাজনীতি চক্রের পাকে-পাকে যেখানে সাধারণ মানুষ নিষ্পেষিত, লাঞ্ছিত হচ্ছে, সেখানে কবির ব্যথিত দৃষ্টি সমবেদনায় বিদ্রোহী। যাকে খুঁজতে তিনি পাথরের মধ্যিখে যান নি, যাকে খুঁজে পেলেন

"শিরালদার প্ল্যাটফর্মে আছড়ে-পড়া উদ্বাস্তু সংসারে
বিষাদ প্রতিমা
মা তোমার ঘর নেই। (শুকনো মুখ উস্কোখুস্কো চুল)

মাত্র পনেরটি কবিতা ও 'একলব্য' নিয়ে বইখানি সম্পূর্ণ। এই পনেরটি কবিতার মধ্যেই মঙ্গলাবাবু তাঁর পরিচয় স্পষ্ট করে রেখেছেন। 'মা গাইছে' কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। দুঃখ মিলের পরীক্ষা নিরীক্ষায় তাঁর রুচি সহজে মেলে না।

চৌকাঠে মোরগঝোড়ায় যারা চুলছে ঘুমে, কবি তাদের মাথা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়াতে আহ্বান জানাচ্ছেন,

'এই তো দেশান্তরীর সময়—নেই মমা নেই আকাশ
ঘুম ঝাড়ানি ঘরটাকে তোর চাবুক মেরে তাগাদ :
ল্যাজ তুলেছে পিঠে ওই তাখ ঘর-পালানো আকাশ।
(আশ্বিনের আকাশ)

জীবনযন্ত্রণার উজ্জ্বল প্রকাশ যন্ত্রণা কবিতাটিতে। 'যন্ত্রণা, আমাকে তুমি সাতপাকে অনন্ত বেঁধেছ।' সংসারে এমন একটি সুস্থ মানুষ নেই, যার জীবনে কোন যন্ত্রণা নেই, এবং এই অর্থেই কোন মানুষ সুস্থ নয় :

"—একটা ছুরির মুখ বিঁধে আছে সমস্ত জীবনে
সমস্ত জীবন ভরে কৌটায় কৌটায় রক্ত কৌটায় কৌটায় রক্ত
একটা আলায় শুধু ঝি ঝি করে মন (যন্ত্রণা)

'শিরীষ গাছের নিচে' কবিতা পড়ার পরেও চোখের সামনে ফুটে ওঠে ওই মরা মেয়েটার চোখ দুটো, মনে পড়ে,

"পেটে-পিঠে-এক হয়ে মেয়েটা ফুটপাতে শুয়ে আছে
কেবল তাকিয়ে ওর অবাক চোখ দুটো।"

বিষয়বস্তুতে বিশ্ববাবুর সঙ্গে মঙ্গলাবাবুর কোন মিল নেই। জাতিত্ব রয়েছে দুঃখের বিচিত্র পরীক্ষায়। মঙ্গলাবাবু রাজনৈতিক চিন্তায় এত বেশি চিহ্নিত যে কোথাও কোথাও তাঁর কবিতা কাব্যরস বঞ্চিত হয়ে পড়েছে, উত্তেজনায় তাঁর বড় বেশি হয়ে পড়েছে,

'দিনে দিনে ভরে উঠবে লক্ষীর ভাণ্ডার ছুরাইল
বাসিন্দুর জোরা-ইয়াংসি-ইয়াসু সাতসুরে সারা মুখ
আর যৌথখামারের চাষী, তালিন মোটর-কারখানার মজুর

এশিয়ার মুক্তিফৌজ কোরিয়া ভিয়েতনাম মালয়
কিংবা, পরস্পরের হাত ধেকে ধরব আমরা, চোখে চোখ রাখব,
ডাকব : তালিন, কমরেড তালিন।

অন্যত্র বলেছেন,

'মানুষের মত দাড়া হবে দাঁড়াব আমরা
শীতের কাটাযো একটা হিংস্র চিৎকারে কেটে পড়ব হঠাৎ : তালিন।'

বুঝলাম না, হিংস্র চিৎকারে কেটে না পড়লে কি মানুষের মত দাঁড়াতে না কাজ করতে পারা যায় না। তাকে কি সত্যি একদিন হিংস্র হয়েই উঠতে হবে?

এ বইয়ের বিষয়বস্তু না পটভূমি বিশেষ করে রাজনীতি, দেশবিভাগ, কুটনাতের ছড়াযো সংসার, শিয়ালদার ব্যাটকর্ম, ভিখিরী মেয়েটা, ক্ষুধা, তালিন, কলকাতা, মিছিল, মিটিং···এ সবের মধ্যে কবির মনের অস্থিরতা নয়, বিক্ষিপ্ততাই দেখা যাচ্ছে। অনেক বলিষ্ঠ লাইনের পাশে,

'মা কত ডাকে, কত ডাকে বাপি
পিসিরা ডাকে, 'আয় আয়' বলে
শোনে কি, ঘোরে শুধু ঘর ছুড়ে···'

এই লাইনক'টি যেন দুর্বলতায় এলিয়ে পড়েছে।

একই শব্দকে বারবার ব্যবহার করে পাঠকের মনে বাপ কাটার চেষ্টা মঙ্গলাবাবুর মধ্যে বিভমান, যেমন,

ছেলেটার নির্বাক চাউনি প্রহর গুনবে
প্রহর গুনবে
প্রহর গুনবে ঘুরে মরু ভারতবর্ষ

অন্যত্র,

কবে
কবে দেখা দেবে কবে···

এসব আয়গায় মঙ্গলাবাবুর মধ্যেই শক্তিমত্তার পরিচয় পাই।

ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রথম কবিতার বই 'নীলবির্জন' প্রকাশিত হয় ১৩৬১ সালে এবং দ্বিতীয় কবিতার বই 'অন্ধকার বারান্দা' দু' বছর ব্যবধানে প্রকাশিত হয় ১৩৬৭ সালে। 'অন্ধকার বারান্দা'র প্রতিটি কবিতার রচনাকাল উল্লেখ থাকায় সময়ের সঙ্গে কবির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। 'নীলবির্জনে'র

কবির পালাবদল হলো 'অন্ধকার বারান্দা'র। এখানে বীরেনবাবু তাঁর সহজ রোমান্টিক মনকে সংবৃত করে নিয়েছেন, বিচার, বিশ্লেষণে এবং রূঢ় ও সত্য সম্পর্কিত বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় ব্যস্তুত হয়েছেন। শব্দের ওপর বীরেনবাবুর দখল প্রশংসনীয়। বীননির্জনের সেই মিষ্টি পঙক্তিগুলি,

এখানে ঢেউ আসে না, ভালোবাসে না কেউ, প্রাণে
কী বাসা অলে রাত্রিদিন, মরুকঠিন হাওয়া···
আঁচলে কাঁচ বাঁধে সবাই হেসে না কেউ সোনা :
এখানে মন বড় কৃপণ, এখানে নেই আলো
ঘরে না ঢেকে পড়ে না ঢেউ—এখানে থাকবো না। (ঢেউ)

অবশ্য আর 'অন্ধকার বারান্দা'র দেখা যায় না।

এই দশকের কবিদের বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় যে তাঁদের মধ্যে জীবন ও প্রেম সম্পর্কে অমাবস্যার প্রাচীর গড়ে ওঠে নি; বরং তাঁরা বিশ্বাস করেন জীবনকে, আশা রাখেন ভবিষ্যতের দিকে।

'ক'টি কবিতা ও একলব্য'র পরে 'অন্ধকার বারান্দা'য় এসে মনে হয় সহরের কোলাহল থেকে পাহাড়তলীতে এলাম। স্নিগ্ধ ছায়া, প্রাণের নিবিড়তা আত্মার সঙ্গে মিশে গেল। গভীর জীবনবোধ এখানে বিশ্লেষণে কর্কশ বা রূক্ষ হয়ে ওঠে নি, বরং মধুর ও কোমল, বেদনায় আর্দ্র হয়ে উঠেছে। সুন্দর পৃথিবীর অফুরন্ত প্রকোষ্ঠগুলিকে কবি পরিত্যাগ করে নির্জনে অন্ধকার বারান্দা নির্বাচন করেছেন :

তাই সবার প্রণম্য হিমিহিমি
শেষ হয়ে গেলে সেই প্রেমিক আবারও বুঝি পারে
হৃদয়ে জাগিয়ে দিতে আর-এক প্রণয় ভালবাসা
বারান্দার এই মৌন বসন্ত বাহারে। (বারান্দা)

কিন্তু তাঁর শেষ উপলব্ধি ও বক্তব্য হলো : 'অন্ধকার নয়'। বারান্দার অন্ধকারকে তিনি ঠেলে ফেলতে চেয়েছেন, অন্ধকারের হাত থেকে তিনি মুক্তি চেয়েছেন; 'অবাস্তব অন্ধকারে' 'তবুই আলোর ইচ্ছা' লালন করেছেন, 'আলোর অসীম ইচ্ছা নিয়ে' জেগে আছেন। বলেছেন,

অন্ধকার ভাল নয়। যদিও সে আত্মীয় আমার
যদিও আমারই রক্ত এই অন্ধকারের শরীরে

প্রবাহিত। ? (অন্ধকার ঘর)

তাঁর দেয়াল কবিতাটি অন্ধকারেরই অন্তধাম। কে চায় দেয়ালে বন্ধ হয়ে থাকতে, এক জীবনে মৃত্যুর সঙ্গে বারবার দেখাসাক্ষাৎ করতে কেই বা পছন্দ করেন, বরং মুক্তির মধ্য দিয়েই বাঁচতে চায় সকলে। জীবনকে না ভালবাসতে পারলে মৃত্যু সতর্ক হলেও এতো সুন্দরতর হয়ে ওঠে না।

এখন আমি অন্ধকারে, একা।
চারদিকে চার দেয়াল, চোখের দৃষ্টি মিবে আসে,
শিউরে উঠে অন্ধকারের কঠিন পরিহাসে : (দেয়াল)

জীবনের সঙ্গে মৃত্যুও যেন বন্দী হয়ে আছে চার দেয়ালের অন্ধকারে। কবি মুক্তি চাইছেন আলো হাওয়া বন্ধ ওই ঘরের থেকে।

শব্দের চয়নকারিতের সঙ্গে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর চিত্রধর্মী মন। অল্প কয়েকটি কথায় একটি পরিপাটী অঙ্কনে তাঁর তুলনা মেলেনা।

'দূরে হেলন্তের পাহাড়, পাহাড়তলি
ছাড়িয়ে শিপলকোট্টির চড়াই, আর
তারপর সাঁকো। বাঁয়ে গেলে গঙ্গার
ধারে সেই গ্রাম, অযোধ্যা রঙ্কোলি। (হাতে তাঁর দীপ)

কোথাও চরিত্র এঁকেছেন কয়টি কথায়,—

যন্ত্রণাজর্জর মুখ। বেদনায় বিপন্ন। বাঁ গালে
মস্ত একটা ক্ষত চিহ্ন। চিন্তার রেখায়
মুদ্রিত কপাল। চক্ষু ছানি-পড়া। দু হাত তাকালে

জিজ্ঞাসা মিহিত তার ওষ্ঠে, জ্রূযুগলে। (পুনরাগমনায়)

নীলনির্জনে দেখা যায়া 'ভয়' শব্দটির ওপর তার মোহ জন্মেছিল। তিনি অজস্রবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই ভয়ের কথা বলেছেন। যদিও তাঁর 'ভয়' আমাদের ভীত করেনি, বরং ভালই লেগেছিল ; সারা ঘরে বিবর্ণ আলোর ভয় ; সর্বনাশা ভয় থেকে মুক্তি দাও আমাকে, হায় ভীরু মন ; সারা জনবনে ভয়ের বন্যা ফুলে ওঠে ; আমি আর মনে ভয় নাবে ; সাদে ছায়া ছায়া ভয় সারা মন ছুতে, ধবল ছায়া ছায়া ভয়, জ্যোৎস্নার সাদা ভয়গুলি, এমনি 'ভয়ে'র বহুবিধ সুচারু অভিব্যক্তি দেখতে পাই। নীলনির্জনে কবির

যে হারাই-হারাই ভয় ছিল, এখানে তিনি তা জয় করেছেন, বলেছেন,

অন্ধকারে হারিয়ে যাস যে একটু দাঁড়া
এই যে একটু-একটু আলো এই যে ছায়া ফিকে-ফিকে,
এরই মধ্যে দেখে নেব সন্ধ্যাবেলার প্রথম তারাটিকে।

(মাঠের সন্ধ্যা)

'অন্ধকার বারান্দা'র আরেকটি বন্ধুদের ইঙ্গিত দেখতে পেলাম, যা পাইনি 'নীলনির্জনে', তা হলো কাব্যনাট্যের লক্ষণ। দৃশ্যকে আরো দৃশ্যময় করে তুলেছেন। দেখে তাখ নির্জন বাতাসে কাউয়ের প্রণয়; এবং তাখো, দিনেদিনে যেন কী করে মিলিয়ে যায় খামার-ঘরবাড়ী; তাখো এখন সেই মেয়েটিকে। যা-রে যা-রে, তাখো যা-রে; তাখো পারো কি না এই সংসারের অসুখ সারাতে। (অসুখী সংসারে) মনে হয়, এই তাখো-তাখো শব্দগুলি কবি ও পাঠকের মধ্যে আরো নিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টি করে, পরস্পরকে আরো ঘনিষ্ঠ করে দেয়, কবিতায় আবার ক্ষেত্রে কাব্যিক প্রবাহকে পুরোপুরি বর্জন করে' যে ঘরোয়া আন্তরিক সহজ সুরটি রচনা করেন, এটি তাঁর একান্তই নিজস্ব।

মানুষের মন চিরকাল এক রকম থাকে না, চিরকাল রোমান্টিক হয়ে থাকতে পারেন না, অন্ধকার বারান্দায় কবি বাস্তব জীবন যাত্রার, খুঁটিনাটি সুখ দুঃখে জড়িয়ে পড়েছেন, কোথাও দেখি ক্লান্ত সংসারের চিত্র, কোথাও আশা আকাংখা, হতাশার ছবি। আমলকাস্তি রক্তাক্ত হতে চেয়েছিল। প্রত্যেকের জীবনেই রক্তাক্ত হওয়ার স্বাদ আগে, অন্ততঃ একটা মুহূর্ত আসে যখন সে রক্তাক্তই হ'তে চায়, কিন্তু তারপর অনেক অভিজ্ঞতা, দুর্দশা, ব্যথা, দুঃখের চাবুক তাকে সেই রক্তাক্ত হওয়ার স্বাদ থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। আমলকাস্তিও রক্তাক্ত হতে পারে নি। ইতিপূর্বে তাঁর কবিতায় মানুষ চরিত্রে এমন খোঁচা দেখতে পাইনি। "কত অনায়াসে আমি দিতে পারি বারবার··· অনায়াসে দিতে পেরে তবুও যেহেতু কিছুই দিই নি অনায়াসে" (দিতে পারি, তবু)। 'বৃদ্ধের স্বভাবে' কবিতা "রোগা চাষা বৃদ্ধ···পাতের উপরে দিয়া অধিয়েছে মাংসের পাহাড়। ঘনিষ্ঠ খাচ্ছে না। তবু মাংসল স্মৃতির তীব্র মোহে ক্রমাগত বলে যাচ্ছে—'আমো হে, আমো হে'। ক্লান্ত সংসারের কথা, 'ক্লান্ত স্ত্রীকে মেজাজ-রাগে-ঝাপা তবুও খাইবে, কুটকে-যাওয়া বালিশটাকে ভাঁজিয়ে রেখে, ঘুমন্ত ছেলের ইজেরের দড়িটাকে আর-একটু আলগা করে

দিয়ে, (অল্প একটু আকাশ) প্রভৃতি খুঁটিনাটি ঘটনায় তাঁর দৃষ্টি জড়িয়ে গেছে, কিন্তু এ সবের মধ্যে কবি জড়িয়ে থাকতে চান নি, তাঁকে-তাঁকে তাই বারান্দায় চলে যান, 'যেখান থেকে অল্প-একটু আকাশ দেখা যায়', সে তাই বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। চায় সেবালের অন্ধকার ঘরের চেয়ে হোক বারান্দা ভালো, হোক তা অন্ধকার আসলে সেখান থেকে আলো দেখা যায়, আলোর আনন্দ স্পর্শ করা যায়। সিতাংশুর ঘরের বেরাল 'স্থির নির্বিকার মৃত্যুহীন'··· 'যেখানে ঈশ্বর নেই, শয়তান নেই, কোমোঝিম্ নেই, প্রেম নেই, ঘৃণা নেই, সেখানে যাব না।' 'বড় বেশী অন্ধকার তোর ঘরের ভিতরে।'

মৌলিক শিবাদে তাঁর জীবনযন্ত্রণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, 'পিতামহ আমি এক মিছুর সময়ে বেঁচে আছি।···আমি এক আশ্চর্য সময়ে বেঁচে আছি।'

যখন আকাশে আলো নেই,
যখন মাটিতে আলো নেই,
যখন সন্দেহ জাগে·····

মঙ্গলাবাবুর কবিতায় অনেক ক্ষেত্রেই 'মত' 'যেন' শব্দ পীড়াদায়ক ; বুকের ওপর বিশ মন পাথর যেন দুঃস্বপ্ন, শিয়রে সর্বনাশের মত ভয়ংকর, ভবিষ্যতের মত জেগে আছে···প্রভৃতি, কিন্তু নীরেনবাবু এ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন, খুব সতর্ক। মত, যেন শব্দ কখনোই ব্যবহার করেন নি, যেখানে তিনি 'মতন' ব্যবহার করেছেন, সেখানে কথার কথায় সুলভ ব্যবহারের লক্ষণ নয়, বরং মূলভাবেই প্রয়োগ করেছেন, 'কাপালিকের মতন আমি শ্মশানে জাগব না।' (না, আমি আর)। কোন শব্দকে জোর করে দীর্ঘ বা হ্রস্ব উচ্চারণে প্রয়োচিত করেন নি, বিষ্ণুবাবু যেখানে, 'বিবর্ণ মতো দাগ' লাইনটিতে 'বিবর্ণ'কে চার মাত্রার টেনে নিয়ে উচ্চারণ করিয়েছেন, নীরেনবাবু সেখানে জোরজবরদস্তি করেন নি, 'শিয়রে মৃত্যুর হাত সারা ঘরে বিবর্ণ আলোয়'···বিবর্ণকে তিন মাত্রাতেই রেখেছেন।

যে 'এবং' শব্দটি নীলনির্জনে কোথাও ব্যবহার করেন নি, সেই 'এবং' শব্দটি অন্ধকার বারান্দায় মুখর হয়ে উঠেছে, 'এবং' শব্দটিকে তিনি বরাবর তিন মাত্রায় ব্যবহার করে গেছেন, দু এক স্থানে ছাড়া। 'ছাদ'কে 'ছাত' ব্যবহার করেছেন। 'হোক' শব্দকে 'হক' বানানে নিয়ে এসেছেন, যা রুচিসম্মত পরীক্ষা বলে মনে হয় না।

এ যুগে হজুগের নেশা বেশী, এই দলকে বিশৃংখলা বেশী। এদল যেদিকে কলমলানো আলোয় চোখ ধাঁধায়, আকর্ষণ সেইদিকে। অরুণ ভট্টাচার্য এ মঞ্চে নাম লেখায় নি, এমন কি এ সকলমুতো দর্শকের ভূমিকাতেও তিনি অনুপস্থিত। অরুণবাবুর কবিতা প্রায় ক্ষেত্রেই বাচ্যাতিরিক্ত ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। সেখানেই তিনি সার্থক সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছেন। রাজনৈতিক গোলযোগ বা সাময়িক একটা হজুগ পেলেই ক'ছত্র পদ্য গানাগোছ নেশা অরুণ ভট্টাচার্যের নেই এবং এই হজুগ অভ্রিয়তার জন্যই তাঁর মধ্যে শান্ত গভীর নিরীক্ষা ও সমীহার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিজের চিন্তার প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাস আছে বলেই, তাঁর রচনাকে বাকচাতুর্যে বা অঙ্গভঙ্গীতে জাঁকালো করে তোলার চেষ্টা নেই। উচ্ছ্বাস সেই কোথাও, আপাগোড়া সংযম রক্ষা করে গেছেন। অরুণবাবুর কবিতার এইটেই প্রধান গুণ। এ যুগের কবিদের অত্যাধুনিকতার বিরুদ্ধে যে কারণে সাধারণ পাঠক দুঃখিত ও বিমর্ষ, অরুণবাবু সে-কারণ বর্জিত। তাঁর কবিতার দুর্বোধ্যতা আয়াসিত নয়, বরং মিশ্রিত, পরিত্যক্ত। আভাসিক শব্দ, গুচ্ছ, মিলে আশ্চর্য নিপুণ অধিকার। আধুনিকতার অর্থে যারা শুধু কিছু ওজনে ভারী শব্দের অর্থহীন প্রয়োগে নিজেকে বলিষ্ঠ মনে করেন, অরুণবাবু সেই ওজনওয়ালা শব্দগুলিকে সরিয়ে রেখেছেন, এই জন্যই তাঁর কবিতায় স্থূলতার পরিবর্তে সূক্ষ্মতার প্রাধান্য। তিনি কখনোই উত্তেজিত নন, সেই অর্থে চীৎকারধর্মি সূচক কবিতা তিনি পছন্দ করেন না। তাঁর কবিতায় অভিমান আছে, আছে অন্তর্বেদনা। আছে মনুষ্যত্বের প্রতি মর্মবেদনা।

আমি এই শতাব্দীর জরা নিয়ে গায়ে
একা বিছানায় শুয়ে আছি। (জ্বর)

বলছিলাম, উচ্ছ্বাসে উৎসাহ নেই অরুণবাবুর। বরং তাঁর শান্ত কোমল আবেগই মধুর ও বলিষ্ঠ হয়েছে। তিনি কোন পন্থীর (বাম বা দক্ষিণের) মুখ তাকিয়ে কখনো লেখেন নি, পন্থীদের চিন্তাকে ব্যক্তিগত জীবনে যা-ই মেনে নিন না কেন, কবিতার রাজ্যে তাকে টেনে আনেন নি; বা রাজনীতিকেই কোন কোন কবি যেমন নির্ভর করে টিঁকে গেলেন, নিশিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদ থাকা সত্ত্বেও সেই পক্ষপাতীত্ব বা দলীয় মনোবৃত্তি তাঁর কাব্যকে বিদ্ধ করতে পারে নি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দাবাড়ু', দ্বিতীয় 'মধুরাক্ষী'র পরে তৃতীয় এই 'মিশ্রিত সংসারে' কবিকে আরো দৃঢ় ও বিশ্বাসী, বিচার বিশ্লেষণে ও শব্দ প্রয়োগে

ছন্দ ও অলংকরণে নবীনতা সম্পন্ন দেখতে পাই।

সমস্ত যৌবন ধরে অবিরাম দীনতার ভার
প্রত্যহই ঠেকেছে শরীর,…
সংসার সমাজকে ধূলিমুঠি মনে করে
মানুষের দিকে চেয়ে উচ্চরোলে হেসেছি কেবল। (ঘর)

কিন্তু তবুও ভুল করে কবি কিছুটা আশ্রয় চেয়েছিলেন। ঘরের প্রতি এই মমতাতেই তাঁর রোমান্টিক মনের ব্যাথা পরিস্ফুট হয়েছে। সব অবস্থার মধ্যেই মানুষের একটি গোপন মন চায় সংসারের নিবিড়তায় সামান্য সুখটুকু ভোগ করতে। বিবিধ মন পাশাপাশি কাজ করে, একটি মন দিয়ে যে-সুখকে মিথ্যা মনে করে, উচ্চরোলে হেসে ওঠে—সংসার সমাজ সাধ সবি তাঁর কাছে মিথ্যা তুচ্ছ হয়ে উঠেছে—অন্তমনে তাকেই আবার আঁকড়ে রাখার নিরুপায় ব্যাকুলতার ব্যাখ্যায় কবিতাটি সার্থক হয়েছে। 'ঘর' এ-বইয়ের একটি অন্যতম কবিতা।

বিশ্বের অসুস্থতা, জরা, জর্জর অবস্থা তাঁর কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। এ রুগ্নতা বা অসুস্থতা কবির নয়, কবির একার নয়, সমস্ত বিশ্ব আজ নানান রোগের যন্ত্রণায় ভুগছে। কবির লেখনিতে এ অনুভূতি মুখর হয়ে উঠেছে,. কিন্তু কবির ভাষা সর্বত্র শান্ত, স্নিগ্ধ, সেই কোমল স্বরেই বলেছেন,

ঘুম ভাঙে নিরাময় ঘরে
আমারই সতীর্থ কেউ অন্য পাশে শুয়ে,—
মলিন চাদর তার, অসুস্থ শরীরে। (জরা)
…দাও
শান্তিতে থাকার
নিরিবিলি অবকাশ। কেন না বাইরে
প্রবল নির্দয় ভিড়।

ঘুম নই, দেহে মনে
আনন্দ জঞ্জাল,… (দরজা ও কবিরতা)
…দীর্ঘ আয়নার ভুতে

আমারই অন্তটি দেখ
বারবার দেখি।
নিজেকেই নিজে।

অথবা

যদ্দনা বিদ্ধির আমি, রোগে শোকে অন্তহর দেহ।

(ঘুঙুর অন্ত)

এই প্রতিবাদ হয়ত অরণ্যে রোদন। কারো কানেই উঠবে না। 'যেহেতু অদ্ভুত শাসিন নিয়ে পৃথিবীর 'পর অন্ধকারে একা ব'সে আছি।' সব প্রতিবাদ নিয়ে অন্ধকারে লাঞ্ছিত দেহে বসে থাকাই সম্ভবত এই শতাব্দীর অভিশাপ।

যাদের সঙ্গে অন্তর্বেদনা, দুঃখের সঙ্গে যন্ত্রণা প্রকাশে কবি সহজপ্রবৃত্ত। 'আমরা যখন শুধু লাঞ্ছনার চিহ্ন নিয়ে মনে, মিথ্যা যৌবনের দম্ভে জীবনের জটিল সত্যকে ঘুরেছি কেবল।···হর্ষাত দিয়েছে তাকে অপরূপ রঙ, মেঘমালা বেণী তার কুটিলা সাপের দেহ। মায়াবিনী রাজকন্যা যেন।' অরুণ

অক্ষয় বুদবুদ ক'টি। স্বচ্ছ কাঁচঘরে
বসেছি বিকেলবেলা সূর্যাস্তের নিচে।
তার কথা মনে হ'লো। মনে হ'লো
আমাদের জীবনেরও একরূপ অর্থ আছে—
যে অর্থ কেবল এই মায়াবিনী রাজকন্যা জানে। (কাঁচঘর)

'অরুণ ভট্টাচার্যর মেজাজ রূপদী এবং তাঁর কবিতা রাগসঙ্গীতের মত মিড়ি, শব্দ সীমিত, আয়তন প্রায়ই ক্ষুদ্র অথচ বিস্তার অধিক।'—অরুণ ভট্টাচার্য সম্পর্কে কোন তরুণ কবির এই মন্তব্য যথাযথ ও যুক্তিনির্ভর বলেই মনে করি। ইদানীং অনেকের মধ্যেই একটি লক্ষণ দেখা যাচ্ছে—কবিতায় শরীর দীর্ঘীকরণ। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এই দীর্ঘাকার রচনাগুলির শরীর অনেক অংশেই এলিয়ে পড়ে, সেদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। অরুণ ভট্টাচার্য দীর্ঘাকার কবিতা লেখার পক্ষপাতী নন। তাঁর এই অল্প কথায় অনেক কথা বলার উক্তিটি অতি মনোরম :

সূর্য সে। লাল্চে সকাল
নিখিল বিশ্বের দিকে পিঠ দিয়ে
নিজের ছায়াকে সে দেখছেই, দেখছে। (টিল লাইফ)

কিংবা, নিতান্ত বালক, তাই
শঙ্কিত বিধাতাও
সমুদ্রের কাছে গিয়ে ঘুরে তাকালো না। (মূর্খ বালকের কবিতা)

অথবা শরীর তার যন্ত্রণায় বিকলতায় কালো
রক্তপুঁজে মাখামাখি, অসুস্থতা, মৃত্যু
ঘরটি তার টানাটানা ঘরে, আয়না তার আলো।
(আয়না তার আলো)

এই অন্ত্য-কথায় বলা ও না বলার ব্যাপারে জীবনানন্দ ও অমিয়বাবুর মধ্যে যে বৈপরীত্য, সেই অর্থে বীরেন্দ্র চক্রবর্তী ও অরুণ ভট্টাচার্য বিপরীতধর্মী। অন্যদিকে মঙ্গলাচরণবাবুর মধ্যে স্বভাবতই যে আবৃত্তি প্রলোভন বা উচ্চস্বরে পড়ার একটা ইঙ্গিত রয়েছে, সে প্রবৃত্তি বীরেনবাবু কি অরুণবাবুর মধ্যে অনুপস্থিত। মনে হয়, কবিতার রস উপভোগের পক্ষে উচ্চস্বর-বর্জন স্পৃহাই অনায়াস পাঠে মনোরম।

(২)

'মিলিত সংসারে' শেষের দিকে একটি প্রতীকী নাট্যকাব্য 'তিন চরিত্র' এবং মঙ্গলাচরণবাবুর বইতে 'একলব্য' নামে একটি কাব্যনাট্য সংযুক্ত হয়েছে। দুটি রচনা সম্পূর্ণই বিপরীত বলতে পারি। 'একলব্য'তে ধনী দরিদ্র, উচ্চনীচ পর্যায়ের চিন্তাই প্রবল। একলব্য বীর্যবান বলিষ্ঠ তরুণ, সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায়। জীবন সম্পর্কে তার ধারণা, 'জীবন তো যোদ্ধা সওয়ার, প্রতিদ্বন্দ্ব যদ্যা ছেঁড়া গতি'। কিন্তু বয়সে দ্রোণ অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। তিনি দ্রোণ জানেন, বালকের এ দম্ভ কতক্ষণ। সে যে নিতান্তই বালক। তিনি বলেন, 'ওরে মূর্খ বীর, মূর্খ, ওরা রাজা। মানুষ না, রাজা। মানুষে মানুষে চলে দ্বন্দ্ব, প্রতি দ্বন্দ্ব সমানে সমানে প্রতিপক্ষ।' কি করে দ্বন্দ্ব চলবে? কিন্তু সম্পূর্ণ অসমান প্রতিপক্ষের মধ্যে দুই রাজার বিরুদ্ধে প্রজার বিদ্রোহ চলে, যুদ্ধ হয়। একলব্য আপাত দৃষ্টিতে কাব্যনাট্য মনে হলেও, কাব্যনাট্যাকারে একটি দীর্ঘ কবিতা বললেই ঠিক হয়। নাটকের ভঙ্গিই আছে মাত্র, আসলে নাট্যরস রহিত। দ্রোণ চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্ব নাটক রস পরিগ্রহ করেনি।

'তিন চরিত্র' কাব্যনাট্য নয়, নাট্যকাব্য। এখানে নাট্যরস নয়, কাব্যরসই

প্রধান। কাব্যনাট্য যদিও বাংলায় ইদানীং কিছু লেখা হয়েছে এবং হচ্ছেও, কিন্তু প্রতীকী নাট্যকাব্য দুর্লভ। 'তিন চরিত্র' বাংলা নাট্যকাব্যে একটি স্মরণীয় সংযোজন।

চতুর্দিক অন্ধকার। স্তব্ধ। ঘরের একাংশে একখানা প্রকাণ্ড আরশি। মানুষের সমান বয়েসী আরশি। নাটকের প্রথম চরিত্র। মানুষের সমান বয়েসী আরশি অর্থাৎ যে আরশির মানুষের সব কিছুই ধরা পড়ে, যে সব দেখতে পাচ্ছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, ত্রুটি-বিচ্যুতি, সুখদুঃখের লুকোচুরি. সেই আরশি পুরুষকে বলছে নিস্পৃহ কণ্ঠে, 'নিরবধি আমার বিকল আত্তির অন্ত এক নাম ভালোবাসা—তা তুমি নিতে পারো নি পারবে না।' 'এ ভালোবাসার অপর নাম বিফলতা মৃত্যু মত্ততা।' দ্বিতীয়দৃশ্যে প্রায় সমস্ত জায়গা জুড়ে আরশি। ঘরের উত্তর কোণে পাঁচটি উজ্জ্বল শিখা। নিয়াভরণ গৃহ। নারী দাঁড়াল দীর্ঘ আরশির মুখোমুখি, প্রতিফলনের মধ্যে দেখলো নিজেকে, নিজের স্বরূপকে, সত্তাকে, আরশির চোখে কোনো ফাঁক বা ফাঁকি টের পা, বললো, 'অহংকারের গলতে পুড়িয়ে নতুন করে বুঝলুম, আমার শরীর মনে মোহের কলঙ্কের কাহিনী লেখা।' বলছে, 'আমার যা কিছু তুমি সত্য ভেবেছো তা সত্যের মুখোশ, যা কিছু সুন্দর ভেবেছো তা কুৎসিত কামনার পোষাকী সংস্করণ।'

বাইরে ঝড়ো বাতাসের চীৎকার। পঞ্চপ্রদীপ নিবে গেছে। ঘরেটি অন্ধকারের ডুবে গেছে। 'ছেলেটির মাথা বুকে রাখলো, অস্থির হাতে বুকের ভেতর ঢেপে ধরতে চাইলো', নারী আরো কিছু বলতে চায়, আকাংখার হাত প্রসারিত করে, সমস্তা থেকে মুক্তি চায়, আদ্যা যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচতে চায়—সব কিছুর বিনিময়ে তার আকাংখা, তার বিশ্বাস, একজন বিশ্বাসী বন্ধু, সঙ্গী, একটু নির্ভর, নারীর চিরন্তন আবেদন,

'তোমার সবের ঘরে
আমাকে কিছুটা জায়গা ছেড়ে দিয়ো, দিয়ো
বাদিকটা আলো আর উত্তাপ।'

পুরুষের সংশয় জাগলো, দ্বিধা এসে পথ আগলে দাঁড়াল। বললো, 'এই আমার ঘর, আমার আকাশ, এধার ওধার শুকনো পাতার ভিড় ..... এলোমেলো এলোমেলো তীব্র প্রার্থনার মত্ততা,—এই আমার ঘর।·· এখানে নদীর মতো

সরলরেখায় বিস্তৃত।...সংসার আমাকে ডাকে ডাকুক...আর না, কোথাও যাব না।' নারী কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি সংসার। অন্ত চিন্তার অতিভূতা। সে দেখছে বাইরে 'জাতিমগাছকে আশ্রয় করেছে একটি নীলমণিলতা, আকাশের দিকে উঠেছে। আর সে দুর্বল নয়...। সে বলছে,

'কি আশ্চর্য দেখো, নীলমণিলতা তোরে
আমাকে ডাকছে যেন,...'

মানুষের সমান বয়েসী আয়নায় 'সুখী ভোরবেলা'র দৃশ্য উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। পুরুষ ও নারীর দুই জীবন ধারায় বন্ধনের অমরতা এনে দিল প্রেম। ঘটনাসংস্থান, চরিত্রচিত্রন এবং প্রসঙ্গের অবতারণায় আগাগোড়াই প্রতীকের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে; সেহেতু কবি হয়তবা 'নাটকীয় মুহূর্ত'কে আরো সাফল্যের সঙ্গে উপস্থাপিত করতে পারেননি। কিন্তু এই নাট্যকাব্যটিতে যে নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত আছে তা বাংলা কাব্যের এই ধারাকে আরো সার্থকতার পথে নিয়ে যাবে। 'তিন চরিত্র' তিনটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ। বাংলার নাট্যকাব্য ও কাব্যনাট্যের পরীক্ষা নিরীক্ষা আরো বেশী হওয়া উচিত। বিশেষ করে বাংলার প্রতীকী রচনাও যখন প্রায় নেই বললেই চলে।

অবেশরঞ্জন দত্ত

মৌমাছিতন্ত্র—শিবনারায়ণ রায়। রেনেসাঁস পাবলিশার্স, ১৫ বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। সাড়ে তিন টাকা।

সাম্প্রতিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের আলোচনা করা একাধিক কারণে কর্মসাধ্য ব্যাপার। বিষয়বস্তুর সংকীর্ণতা ছাড়াও যুক্তি ও যুক্তিগত মননের সঙ্গে গবেষক-চিত্তের সংযোগমুক্ততা আরো বেশি প্রকট। অথচ, প্রবন্ধ-সাহিত্য সম্পর্কে একথাই সর্বক্ষণ স্মরণীয় যে, যুক্তি-যুক্তি-আশ্রিত মনন ও চৈতন্যের মধ্যে একটি যথার্থ মিতাচার গবেষক চিত্তের সহৃদয়তার মাধ্যমেই প্রবন্ধ-সাহিত্য তার নিজস্ব মূল্যের প্রকাশ ঘটায়। প্রবন্ধ সাহিত্য পাঠক-চিত্তে যদি শুধু একটি আবেগের উচ্ছ্বাস জাগায়, তবে সেইটে তার নিজস্ব দুর্বলতা ব্যক্ত করবে। প্রধানত এবং একান্তভাবে যুক্তি-আশ্রিত এবং যুক্তি-গত চৈতন্য-সংজ্ঞাত চিন্তা ধ্যানের ভাষাগত রূপ হিসেবে প্রবন্ধ-সাহিত্য সহৃদয়, নির্বাচনক্ষম ও বিবেকী পাঠকের চিত্তে সেই ভাব-অনুভাবের সঞ্চার করে যা

পাঠকের নিজস্ব যুক্তি-বুদ্ধি ও মননকে আরো বেশি তীব্রতর করবে, আরো বেশি সক্রিয় ও আলোকিত করে তুলবে। শ্রীশিবনারায়ণ রায়ের প্রবন্ধ-সঙ্কলনটি পাঠ করতে করতে এ-কথা খুব বেশি মনে এলো। চিন্তার মধ্যে গবেষণার, তত্ত্বের সঙ্গে তথ্যের এবং বক্তব্যের বলিষ্ঠতার মধ্যে তাকে তীব্রতর করার যে প্রচেষ্টা প্রবন্ধ-লেখকের সাধনা বলে মানতে হয়, শিবনারায়ণবাবুর মধ্যে তেমন একটা ইঙ্গিত খুবই স্পষ্ট ও প্রতিশ্রুতিময়। অধিকন্তু, আমার ধারণায়, যুক্তির বলিষ্ঠতা এবং নিজস্ব-চিন্তার অসংকোচ প্রকাশ তখনই সম্ভব হয় যখন লেখক নিজেই সর্বপ্রকার মৌমাছিতান্ত্রিক মনোভাবকে অতিক্রম করতে পারেন।

চিন্তা ও বক্তব্যের দিক থেকে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের দরিদ্রতার মৌল ও প্রধান কারণ অনুসন্ধান করতে হবে যুগ-লক্ষিত মৌমাছিতন্ত্রের ব্যাপ্তি ও প্রসারতার মধ্যে। উনিশ শতকের চিত্তজাগরণের তীব্রতা ও সক্রিয়তার ফলে আমরা কিছুটা ওই আবহ থেকে মুক্ত হয়েছিলাম, কিন্তু আমাদের সমাজে ও চিত্তে মৌমাছিতন্ত্রের প্রভাব ও আকর্ষণ এতোই প্রবল ছিল যে, শুধু রামমোহন রায় নয়—রবীন্দ্রনাথের মতো বিরাট কবি ও ব্যক্তি-পুরুষের পক্ষেও তাকে সার্থকভাবে আঘাত করা সম্ভব হয়নি। অধিকন্তু, বিশশতকের সমাজ সংগঠন, রাষ্ট্রনীতি ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে সংকট ও বিপর্যয় এতোই গভীর ও ব্যাপক যে তা ব্যক্তি-মানুষকে তার নিজস্ব মহত্ত্ব, মূল্যবোধ ও যুক্তি-শীলতাকে ক্রমসঙ্কোচিত করে তুলেছে; ফলে, মৌমাছিতন্ত্রের সর্বগ্রাসী পথে অগ্রসর করে দিচ্ছে। অবশ্য, এক অর্থে, মানুষের ইতিহাস এযাবৎ মৌমাছিতন্ত্রের মধ্যে মানবতন্ত্রের সংঘাতেরই ইতিহাস। যুগে যুগে এই দুই বিপরীতধর্মী আদর্শের স্বরূপ বদলেছে। কিন্তু, আমাদের সমসাময়িক কালেই বোধহয় মানবতন্ত্রের মধ্যে, শাশ্বত মানুষী মূল্যবোধের সঙ্গে, বিজ্ঞান-বোধ ও যুক্তিবাদের সঙ্গে মৌমাছিতন্ত্রের বিরোধ সর্বাপেক্ষা তীব্রতর রূপ নিয়েছে। স্পেঙ্গলার, সরোকিন, বারডায়াফ, টয়েনবী ও হুসল প্রমুখ দার্শনিকদের ইতিহাস ও সমাজচিন্তায় এই বোধ অত্যন্ত গভীর ইঙ্গিতপূর্ণ।

কেননা, রেনেসাঁস-উত্তর সভ্যতার সংকট ও স্ব-বিরোধ আমাদের সমসাময়িক কালেই ব্যাপকতর হয়ে মানুষী মূল্যবোধের আশ্রয় ও ভিত্তিভূমিকে বিনষ্ট করছে এবং বিগত শতকের মধ্যভাগ থেকেই নাটকে উচ্চারিত অন্তরাত্ম বিনাশিক দুঃস্বপ্ন প্রকট হয়ে উঠেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকাল থেকে

ইউরোপীয় ধ্যান ও চিন্তায়, সমাজ ও ইতিহাস-চিন্তায়···সর্বোপরি, দার্শনিক মূল্য-বোধে ওই সভ্যতার অমোঘ গতন ও বিশ্বাসের শক্তা, কীর্তি ও প্রতিভূবি এতো প্রবল ও আবেগময়। বলাই বাহুল্য, মৌথাধিতন্ত্রের প্রতিভূলমাজ যে সৃষ্টিশীল মানবতন্ত্রের কথা শিবনারায়ণবাবু উল্লেখ করেছেন সেই মানুষী মূল্যবোধ ও জীবন-দর্শনের সর্বকথের পটভূমিতে নিশ্চতভাবেই তাই মৌথাধি-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এতটা বেশি যারাত্মক। যুক্তি-আশ্রিত নীতিবোধ মূল্য-চৈতন্যের অবক্ষয় বুদ্ধিজীবী চিত্তের উপর কী রূপ চরম প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম, তারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত মেলে মার্ক্সবাদী সাম্যবাদী চিন্তার ক্রমপ্রসারতায়। সম্প্রতি প্রখ্যাত চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক মাইকেল পোলানী "Personal Knowledge" নামক অতি মূল্যবান গ্রন্থে এ-বিষয়টা বিশেষ স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

আমার মতে, এই কথাগুলো শিবনারায়ণবাবুর মৌথাধিতন্ত্র প্রবন্ধ সংকলনটি অনুধাবনের প্রসঙ্গে স্মরণীয় এবং অনিবার্য। মৌথাধিতন্ত্র, উদারতন্ত্রের অবক্ষয়, গণতন্ত্র ও সংস্কৃতি এবং চার্চ, রেনেসাঁস ও মানবতন্ত্র—এই কয়টি প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে লেখক মৌথাধিতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ, তার সমাজ ও আদর্শগত প্রতিষ্ঠা ও প্রকাশ এবং অন্যদিকে রেনেসাঁসী-মানবতন্ত্রী ধ্যান, জ্ঞান, চিন্তা, প্রতিজ্ঞা ও প্রত্যয়—এক কথায় ওই জীবন-বোধ ও জীবনাচরণের নির্দেশ করেছেন।

মৌথাধিতন্ত্রের সাবেকি ধরনের দৃষ্টান্তহিসাবে শিবনারায়ণবাবু স্পার্টা ও সমাতন ভারতবর্ষের কথা তুলেছেন। কারণ, আমাদের হিন্দু গৌরববোধ ও প্রাচীনত্বে আঘাত লাগলেও মানতেই হয় যে, ভারতীয় সমাজ ও সামাজিক মূল্যবোধগুলো অনেকটাই স্পার্টার মতো বুদ্ধি-বিচার ও ব্যক্তিত্বের বিলোপ সাধনের জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিল। ঐতিহাসিক টয়েনবী 'Arrested Civilization' এর যে দুটো বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন (Caste এবং Specialisation) তা ভারতীয় সমাতন হিন্দুসমাজেও সমানভাবে ব্যক্ত ও গৃহীত। অবশ্য, শিবনারায়ণবাবুর প্রধান আলোচনার বিষয় আমাদের সমকালীন মৌথাধিতন্ত্র যার তিনটি রূপ ক্রমশই সর্বগ্রাসী এবং সকল পরিচয়গ্রাসী আদর্শ হিসেবে দেখা দিয়েছে। জাতিবাদ, ফ্যাসিবাদ ও সাম্যবাদের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লেখক উল্লেখ করেছেন যে, মৌথাধিতন্ত্রের দুইটি রূপের (ফ্যাসিবাদ ও সাম্যবাদ) সূচনা হয়েছে ফরাসী দার্শনিক রুসো থেকে। রুসোর সর্বগ্রাসী "General will"এর কাছে ব্যক্তিমানুষ বলিপ্রদত্ত; এবং তাঁর চিন্তায় যুক্তি-

শীলতা 'পরভাবের অন্ন' বলে নিন্দিত। সঙ্গতভাবেই, সৌভ্রাতিতন্ত্রের ব্যক্তি-বিরোধী ধারার প্রবক্তা রূপে রুশোকে প্রাধান্য দিতে হবে। কিন্তু, হেগেলের সর্বগ্রাসী ব্রহ্মবাদ ও ইতিহাস-দর্শনেই ফ্যাসিবাদ ও সাম্যবাদের বীজরূপ প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। এমন কি, সাম্যবাদী সৌভ্রাতিতন্ত্রের আদর্শগত উৎস হিসেবে রুশোর চাইতে হেগেলকেই বেশি গুরুত্ব দিতে হয়।

উল্লেখযোগ্য এই যে, সৌভ্রাতিতন্ত্রের আলোচনায় শিবনারায়ণবাবুর দৃষ্টি শুধু ফ্যাসিবাদ বা সাম্যবাদেই সীমাবদ্ধ নয়—ওঁর যুক্তিবাদী দৃষ্টিতে আমাদের রাজনৈতিক চৈতন্য, স্বদেশধর্ম ও দেশপ্রেমের সৌভ্রাতিতান্ত্রিক প্রকৃতিও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। লেখকের ভাষায়, "ফ্যাসিবাদের যেটি মূল প্রত্যয়—অর্থাৎ জাতির সমষ্টিগত সত্তার মধ্যে বিলোপে ব্যক্তির মোক্ষ—প্রায় সূচনা থেকেই সেটি আমাদের রাষ্ট্রিক আন্দোলনকে পরিচালিত করে এসেছে। রুশোর অনুকরণে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম আমাদের এই সৌভ্রাতিত্বের দীক্ষা দিলেন। তারপর বিবেকানন্দ, তিলক, অরবিন্দ প্রমুখ মহর্ষিদের দিব্যজ্ঞানের সমর্থনে যে মন্ত্র জপে ভারতীয় শিক্ষিত মনে তার প্রবল মোহপাশ বিস্তার করল। অবশেষে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব ঘটল। তিনি বিচার বুদ্ধিকে খারিজ করে দৈব নির্দেশকেই সামাজিক ব্যবহারের নিয়ামক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন।··· বঙ্কিমের যুক্তি-বিরোধী যুক্তির প্রভাব উচ্চ-শিক্ষিতদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। গান্ধী রামধুনের মন্ত্রসহযোগে একধারে চরকা কাটা এবং অন্যধারে অসহযোগের সরলপথে সর্বসাধারণের নেতৃত্ব অর্জন করলেন।" তথ্য ও যুক্তির বিবেচনায় লেখকের বিশ্লেষণধারা, মনে হয়, অনবদ্যকার্য। শুধু তাই নয়, আমাদের স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশধর্মের এই জাতিবাদী এবং ধর্ম-কেন্দ্রিক যুক্তি-বিরোধী বিবর্তন ধারার মধ্যেই হিন্দুজাতিবাদ ও মুসলিম জাতিবাদের ক্রমপ্রসারের সূত্র—বিদেশী শাসক ইংরেজের ভূমিকা খুবই কম। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে যে ধারার সূত্রপাত ঘটে তার একটা চরম পরিণতি ঘটে অরবিন্দের ধর্ম-কেন্দ্রিক স্বদেশ-প্রেমে এবং আরেকটি ধারার সার্থক প্রবক্তা হয়ে দাঁড়ান মহাত্মা গান্ধী।

তবুও শিবনারায়ণবাবুর মানবতন্ত্রী দৃষ্টিতে মানুষের যুক্তিবাদী সত্তার প্রতি বিশ্বাস অপরিসীম। কেননা, "শেষ পর্যন্ত মানুষ নিজের ভাগ্য-বিধাতা। সৌভ্রাতিতন্ত্রের প্রতি সে আকৃষ্ট হতে পারে; কিন্তু তার মোহপাশ থেকে উদ্ধার পাবার সামর্থ্য তার নিজের মধ্যেই বিদ্যমান। এ-সামর্থ্যের বিষয়ে

সচেতন হয়ে উঠলে তবেই তার মধ্যে মনুষ্যত্বের স্ফুরণ ঘটে।" মৌমাছিতন্ত্র থেকে মানুষ রেমেনাসের মাধ্যমে যুক্তিলাভ করে নিজের মহত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করবে —এই বোধ ও প্রত্যয় আছে বলেই রেমেনাস-আশ্রিত উদারনীতিবাদের অবক্ষয় এবং গণতন্ত্র ও সংস্কৃতির মৌল সংকট ও তাদের মূল্য বিনাশ লেখককে নৈরাশ্যবাদী করে তোলেনি।

শিবনারায়ণবাবুর চিন্তা অনেক বিস্তৃত। তাঁর প্রবন্ধ কয়টি এমন যা সমসাময়িক সমাজ চিন্তা দর্শনের বহুবিধ প্রশ্ন সম্পর্কে পাঠককে ভাবিয়ে তোলে। মানবতন্ত্রী জীবন-দর্শন ও মূল্যবোধ সম্পর্কে লেখকের আলোচনা যুক্তি-যুক্তি ও আবেগকে একটা সামগ্রিক রূপ দান করেছে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য কয়টি মৌল প্রশ্নও মনে আসে। যে ব্যক্তি-মানুষের নিজস্ব মহত্ত্ব, মর্যাদা ও যুক্তিশীলতার প্রতি অনন্ত বিশ্বাস মানবতন্ত্রের মূল কথা, সর্ব-বিরোধী বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের মারফৎ তা কতটুকু রাখতে পেরেছি? মৌমাছিতন্ত্র-কেন্দ্রিক আদর্শ নয়—বিজ্ঞান-আশ্রিত দার্শনিক চিন্তা ব্যক্তিমানুষের নিজস্ব মূল্য, মহত্ত্ব ও যুক্তিশীল সত্তাকে কতটা প্রতিষ্ঠিত করেছে—এই প্রশ্ন বোধহয় খুবই চরম। ব্যক্তিকে চরম বলে স্বীকার করার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও চিন্তা কিভাবে কার্যকরী হবে, সেইটে মানবতন্ত্রী দর্শনের একটা বড়ো দিক বলে মনে হয়। অধিকন্তু, মানবতন্ত্রী দর্শন যে অধিবিদ্যার উপর নির্ভরশীল, সেই অধিবিদ্যার ভিত্তিভূমিই বা কীভাবে গড়ে উঠবে?

সবশেষে আরেকটি কথা। শিবনারায়ণবাবুর ভাষা তাঁর মননধারার প্রকাশ, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু, প্রবন্ধে কথ্যভাষার প্রয়োগ বড়ো বেশি ঠেকেছে। মনে হয়, এতে যুক্তি ধারালো হয়না। বরং প্রবন্ধের স্বাভাবিক গভীরতা খণ্ডিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তা হয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস।

নির্মল মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ। প্রথম খণ্ড ॥ শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস ॥ প্রকাশক। কালিকলম ॥ পরিবেশক। জিজ্ঞাসা। কলিকাতা ৯ ॥ সাড়ে তিন টাকা

রবীন্দ্র সংগীতের ব্যাপক প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এই সংগীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও অগণিতরূপে বৃদ্ধিলাভ করেছে। এই সম্বন্ধে শেখবার ও জানবার

ঐকান্তিক আগ্রহও বহু ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে। নানা বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের বিশেষ আয়োজন থাকলে শিক্ষার্থীদের কাছে ধারাবাহিক অনুশীলনের পক্ষে সহায়কস্বরূপ একটি উপযুক্ত বইয়ের অভাবই এতকাল ধরে ছিল। 'রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ' এই অভাব বহুলাংশেই দূর করতে পারবে বলে মনে হয়।

ক্রমবর্ধমান মান অনুযায়ী বিভিন্ন পাঠক্রমের সমুনা-তালিকা সাজিয়ে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাগ-রাগিণীর এবং তালসমূহের পরিচয় দিয়ে দেওয়ায় শিক্ষার্থী-দের প্রভূত সাহায্য হবে। এ-সবের সঙ্গে পরিচিত না হয়ে শুধু 'ভালো লাগার' প্রেরণায় রবীন্দ্রসংগীত গাওয়ার মধ্যে ভ্রান্তিই বেশি পরিমাণে থাকে। রাগ ও তাল সম্বন্ধে বিভিন্ন পুস্তকে সন্ধান করে আহরণ করে নেবার সুবিধে ও ধৈর্য অনেকেরই থাকে না—একটি বইয়ে ভড়িয়ে দেওয়া থাকলে তা বেশ সুবিবেচনার হয়। বইখানা এদিক থেকেও খুবই প্রয়োজনীয় হয়েছে।

রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ক তত্ত্ব ও তথ্যাদি বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে আলোচিত হয়েছে যাতে বৃথা বাগাড়ম্বরে আসল উদ্দেশ্য পণ্ড না হয়। মূলানুগ রাগ-গীতের ছায়ানুগ গীতগুলির স্বরলিপি পাশাপাশি মুদ্রিত থাকায় শিক্ষার্থী ও অনুরাগী-দের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান হয়েছে। 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে' গানটি ইতিমধ্যে যে সুরে প্রচারিত হয়েছে তাতে জনসাধারণ কবিগুরুর গান সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হবেন বলে দুঃখ হয়। গানখানার আদি সুরের স্বরলিপি এই বই-খানাতে প্রকাশিত হওয়ায় গানটির ভ্রান্তিপূর্ণ প্রচার সংশোধনে সাহায্য হবে।

কবিগুরুর মনোভাবের সঙ্গে পরিচয়ের অভাবে রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে বহু ভ্রান্তিপূর্ণ মতবাদ ইতিমধ্যেই প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। 'রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ'তে কবিগুরুর নিজস্ব বহু উক্তি অকৃপণ আহরণে সঞ্চিত করে সে অভাব দূর করবার ব্যবস্থা করায় শ্রীমান প্রফুল্ল নিঃসন্দেহেই সকলের ধন্যবাদ লাভ করবেন। সব দিক থেকে চিন্তা করে বলতে গেলে সেই যে বইটি রবীন্দ্র-সংগীত সম্বন্ধে শিক্ষার্থী ও অনুরাগীদের যথার্থভাবে বন্ধুর মতো প্রেরণা দেবে।

সমরেশ চৌধুরী

'ঘরে-ফেরার দিন' প্রসঙ্গে : একটি চিঠি

[অমিয় চক্রবর্তীর সর্বাধুনিক কাব্যগ্রন্থ 'ঘরে-ফেরার দিন' সম্পর্কে বাংলা-দেশের কবি ও পাঠকদের অপরিসীম আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। বিশেষত, কবি নিজে তাঁর কবিতা সম্পর্কে কি চিন্তা ভাবনা করেছেন, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া কোন্ পথ দিয়ে ক্রমপরিণতি লাভ করেছে, অথবা কাব্যরচনার মূল উৎস কোথায় এমমতর প্রসঙ্গে সকলেরই ঔৎসুক্য থাকবে মনে করে' সম্পাদককে লেখা কবির একটি সাম্প্রতিক চিঠি প্রকাশ করা হ'ল। স: উত্তরসূরী]

as from Boston University
Boston 15, Mass
June 24/61

প্রিয়বরেষু

আপনার চিঠি পেয়ে সুখী হলাম—এখন "উত্তরসূরী"র বিশেষ সংখ্যা পড়বার জন্যে উৎসুক আছি। জানি আপনাদের রবীন্দ্রশতবর্ষ সংখ্যা খুবই উপভোগ্য হবে।

নানা জায়গায় এই দুইমাস ঘুরে—এখন এখানে ছুটি কিন্তু চিঠিপত্র ঠিক মতোই পাব। "ঘরে-ফেরার দিন" এক কপি আশা করি "মাতামা"র কাছ থেকে আপনার হাতে পৌঁচেছে।.....

বইটাতে ছন্দের—অর্থাৎ ভাবভঙ্গীরও—পরীক্ষা আছে। রূপসন্ধানের যে-যাত্রায় আমরা সকলেই যাত্রী এবং অভিনেতা তার মধ্যে অভিনয়ের ফাঁক ছাড়ালে প্রাণ নাটিকায় ব্যাঘাত ঘটে। তাই প্রত্যেকেরই দায়িত্ব পালা-বদলের সুর বিচিত্রভাবে কাব্যের হাওয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া; আমিও আমৃশিক সুর থেকে সেই সাধনা করেছি। "নীল চোখ", "একটি স্মৃতি",—এবং গদ্যের ধরণে রচা অন্যরকম দু'একটি কবিতা আপনার চোখে পড়বে। তাতে ছন্দ পদ্ধতির সূত্য আছে। "মার্কাস" আমার চিরদিনের কথা, কিন্তু নতুন প্রসঙ্গে

তাতে রং দিতে চেয়েছি। বইয়ের শেষ তিনটে কবিতায় আধুনিক যুগের প্রত্যাশা ও বেদনার মিশ্রিত ছবি দেখা দিয়েছে কিনা জানিনা। কিন্তু স্বদেশের কাহিনী যাকে এরা বলে "মফস্বলজিরা" তাতে ভরা এবং সেই ছেঁতকার মেশানো কাব্য এই বইয়ের একটি মূল সুর। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত ঘরের কথা, ধ্যানের কথা ঐ বইটাতে রইল।

লক্ষ্য করে থাকবেন অনেকগুলি কবিতা সম্পূর্ণ নতুন। এর পূর্বে কোথাও বেরোয়নি। নতুন রচনার সঞ্চয় ঢেলে দিয়েছি "ঘরে-কেরার দিন"—বইয়ের মাটির পাত্রে। বাংলাদেশের কোথাও যদি তার স্পর্শ পৌঁছয় তাহলে কৃতার্থ হব। পথে ঘাটে ব'সে বা চলতে চলতে ঘরের মানসে দূত পাঠিয়েছি —সেইখানেই আমার ঘরের দায়িত্ব অবসান। যদি একটিও নিজ পাখী পায়ে যায় সেটা আমার ভাগ্য।

ইংরাজীতে লেখা আধুনিক ভারতীয় এবং বাংলা কাব্যের পরিচয় এইসব দেশে পৌঁছন দরকার। কবিতার ধারা নির্ণয়ে তাতে সকলেরই সুবিধা হবে। আপনার রচনা পড়তে আগ্রহান্বিত হয়ে আছি।

শ্রীতি নমস্কারান্তে
আপনাদের
অমিয় চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর উক্তি : সমর্থনে 'দেশ' পত্রিকা

[সমালোচনার অধিকার, যোগ্যতা অনুযায়ী, সকলেরই হয়ত আছে এবং সেক্সপীয়র বা রবীন্দ্রনাথের মত মহৎ কবিদের রচনাবলী যে সমালোচিত হবেনা এমন নয়; বরং সাহিত্যে গতিশীলতার সেইটেই অন্যতম প্রমাণ। কিন্তু সমালোচকের অনেক দায়িত্ব, বিশেষ করে যুগস্রষ্টা জাতীয় কবি সম্পর্কে কিছু লিখতে হলে, পূর্ণ তথ্য ও গবেষণামূলক অনুসন্ধিৎসার দ্বারা তার সকল মতামতকে উপস্থাপিত করতে হবে। শিথিল অনুমান বা কিছু ব্যক্তিগত ধারণার 'পর নির্ভর করে এ-জাতীয় সমালোচনা নিশ্চয়ই অভিপ্রেত নয়। বুদ্ধদেব বসু আমাদের কাছে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সকল দেশের সকল কালের মানুষের কাছেই শ্রদ্ধেয়; সুতরাং রবীন্দ্রনাথের আলোচনা প্রসঙ্গে বু বসুর

বন্ধু যখন কিছু অনুমান ও কিছু ব্যক্তিগত ধারণার 'পর নির্ভর করে পত্রবার্ষিকী বৎসরে একটি ফরাসী পত্রিকার বিদেশীদের কাছে অনেক কিছু এলোমেলো মন্তব্য করেন তখন তার মৃদু প্রতিবাদ করা সাহিত্যচর্চার খাতিরেই কর্তব্য। এদিকে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় গোলযোগ হয়েছে বলে কোন কাগজে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে সে সম্পর্কে আমরা সম্প্রতি প্যারিস থেকে একটি চিঠি পেয়েছি। লেখিকা জানাচ্ছেন যে তিনি সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং অনুরূপ কোন গোলযোগ হয়নি। বস্তুত, ওঁকে সেই সভায় রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করতে হয়েছিল। আমরাও সেকথায় বিশ্বাস করি। ব্যক্তিগতভাবে বুদ্ধদেব বসুর প্রতি এজাতীয় কুৎসা রটনায় আমরাও দুঃখিত। স: উত্তরসূরী]

ইংরেজী প্রবন্ধের মন্তব্যগুলি ও তার প্রত্যুত্তর

বুদ্ধদেব বসুর একটি সামান্য রচনাকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি প্রচুর গোলযোগ সুরু হয়েছে। মূল ইংরেজী লেখাটি এবং বুদ্ধদেব বসু-কৃত সেই লেখাটির সরল বঙ্গানুবাদ, দুটিই পড়ে পাশ্চাত্যের (ফরাসী!) কবিদের কাছে রবীন্দ্রনাথ কতটা ঋণী ছিলেন তা সম্যক অনুধাবন করতে না পারলেও, এটা বুঝতে অসুবিধে হয় না যে মাত্র সাতে তিন পৃষ্ঠার সমালোচনায় তিনি কমপক্ষে সাতটি বিতর্কমূলক বিষয় উত্থাপন করেছেন এবং সবগুলিরই একদেশে রায় দিয়েছেন। মন্তব্যগুলি যথাক্রমে :

(1) Any perceptive reader of Bengali poetry must acknowledge that he was very much of a European.

(2) In late life he praised Sturge Moore—at the cost of Amy Lowell and Ezra Pound. Judging by the evidence left by himself, we cannot even be sure of his taste.

(3) We suspect his admiration for the west was warmer than he felt it to be compatible with the political status of his nation; and that was why he strove hard to conceal or disguise it in his writings.

(4) One can detect an insidious war going on in Rabindranath's mind : between the poet and the Indian nationalist, the artist and the religious and social reformer, the lover of beauty and the avowed enemy of imperialism.

(5) And the other aspect — revealed only in a body of

deceptively simple verse—the other aspect was that of a romantic in the best nineteenth century tradition, dark and turbulent and passionate.

(6) The best pieces in Kshanika are no doubt the outcome of a happy encounter between the Hindu Sage and the Frenchified German Jew.

(7) His poem Niruddesh Jatra, bears a strange resemblance to Baudelaire's The Voyage and the Drunken Boat of Rimbeaud. Let us note that the mysterious woman in it is a foreigner and the golden boat is journeying westward. Is not that a veiled confession of Tagore's debt to the West?

প্রত্যেকটি মন্তব্যই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কমূলক। শুধু তাই নয়, কোথাও কোথাও বুদ্ধদেব বসুর ইংরেজী ভাষার ব্যবহার এমন পর্যায়ে গিয়েছে যে তাতে শালীনতার প্রশ্নেও যথেষ্ট আপত্তির কারণ ঘটতে পারে। কোনো প্রমাণ উপস্থিত না করে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নিছক মনগড়া অলীক মন্তব্য উপস্থিত করা এবং তাও বিদেশী পাঠকদের কাছে (যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে সামগ্রিকভাবে ও কবির মাতৃভাষার এবং দেশকাল এর পারম্পর্যে বোঝবার সুযোগ কোনদিনই পাবেন না,)—এ কি সাহিত্য সমালোচনার রীতি? তর্ক উপস্থিত করলে প্রত্যেকটি বিষয়েই স্বতন্ত্র দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখতে হয়। সেকারণে কয়েকটি ইঙ্গিত দেওয়া হল মাত্র।

(১) প্রথমত, একথা সত্য, শত শত বৎসরে যাঁরাই য়ুরোপীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ রেখেছেন তাঁরাই কিছু পরিমাণে দেশের সংস্কৃতি আত্মসাৎ করেছেন; কিন্তু রামমোহন, বিদ্যাসাগর বা রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট প্রতিভাধর মনীষী ও স্বাদেশিকতার উদ্বুদ্ধ দেশপ্রেমিকগণ ভারতীয় সংস্কৃতিকে পরিপুষ্ট করবার জন্যই পশ্চিমী সংস্কৃতির কাছে কিছু ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। এজন্য তাঁদের কাউকেই য়ুরোপীয় বনে যেতে হয়নি। একথা বুদ্ধদেব বসুকে অজানা নয়, দীর্ঘ শতাব্দী ধরে ফরাসী সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেও ইংরেজ কবি বা শিল্পীরা "very much of a French" হয়ে যান নি।

(২) দ্বিতীয়ত, 'taste' শব্দটিতে কি ইঙ্গিত করেছেন সেকথার বিতর্ক না তুলেও বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ যখন সত্তর বৎসরের পরেও আধুনিক ইংরেজী কবিতা সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন (কবি অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে এবিষয়ে তাঁর পত্রালাপই যথেষ্ট সাক্ষ্য দেবে), এলিয়টের অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন,

আধুনিক ইংরেজী কাব্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখবার চেষ্টা করেছিলেন তখন এ অনুযোগ কিছুটা অমূলক নয় কি? উপরন্তু, কার কবিতা ভালো লাগা মন্দ লাগা অনেকটা ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার। সুধীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দ উভয়ের প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করবার পরও এমন হওয়া কি যে কোন পাঠকের কাছে বিশেষ একজনের লেখাই বেশী ভালো লাগছে? সুতরাং এ অবান্তর প্রশ্ন এনে আধুনিক কাব্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কটাক্ষের প্রয়োজন ছিল কি?

(৩) তৃতীয় মন্তব্যটিতে—'suspect' ক্রিয়াপদটি কি প্রচলিত অর্থে খারাপ ইঙ্গিত বহন করে না? 'we suspect' না লিখে 'possibly' অথবা 'we presume' লিখলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা যেতো না কি? হয়ত বুদ্ধদেব বসুর ইংরেজীর সমাক ইঙ্গিত আমরা ধরতে পারিনে। কেননা, বাঙালীদের কাছে ইংরেজী প্রবন্ধ 'দুর্গম' মনে হয়ে থাকে বলে তিনি জানিয়েছেন। যাই হোক, এই মন্তব্যটিতে রবীন্দ্রনাথকে হেয় করা হয়েছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। যাঁরাই রবীন্দ্রচরিত্র সামান্য অনুধাবন করেছেন তাঁরাই জানেন, কোন সত্য বা আদর্শের খাতিরে বা বিশ্বাসের প্রশ্নে তিনি নিজের সঙ্গে কখনোই প্রতারণা করেননি। তাঁর অজস্র লেখার মধ্য থেকে বুদ্ধদেব বসু কি একটি ইঙ্গিতও দিতে পারবেন যেখানে তিনি শক্তিমের প্রতি তার "admiration" লুকোবার চেষ্টা করেছেন!

(৪) 'Insidious' শব্দটির অর্থ কি? treacherous বা deceptive অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই মন্তব্যের সঙ্গে এরকম বিশেষণের যৌক্তিকতা কোথায়! তত্ত্ব তাবাবে লেখা যেত না কি "continual war"—কেননা, পরের অনুচ্ছেদটি পড়লে মনে হয় বুদ্ধদেব বোঝাতে চেয়েছিলেন যে সারা জীবনব্যাপী রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দুটি বিরুদ্ধ শক্তি কাজ করেছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে insidious শব্দটির ব্যবহার সার্থক, বা রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাব্যঞ্জক! অপরপক্ষে, জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতার পূজারী দেশপ্রেমিকের সঙ্গে কোন কবিসত্তার, শিল্পীর সঙ্গে সমাজকর্মীর বা সৌন্দর্যের উপাসকের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীর ঘোরতর বিরোধী ব্যক্তির বিবাদ হবেই এমন কি কথা আছে? একটি কি অন্যটির পরিপূরক হতে পারেনা? অন্তত, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে কি তাই হয়নি? ইয়েটস্ কি একই সঙ্গে কবি ও জাতীয়তাবাদী স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন না? মিল্টন, শেলী বা কীটসের জীবনী আমাদের কি শিক্ষা দেয়? উপরন্তু

তিনি রবীন্দ্রনাথের জীবনে 'paradox'এর সন্ধান পেয়েছেন। ('many of the paradoxes we encounter in his life and literary works') এর চেয়ে হাস্যকর প্রস্তাব আর কি হতে পারে। মনে পড়ছে, রবীন্দ্রচিত্রকলা প্রসঙ্গে শিবনারায়ণ রায় একবার রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা বলেছিলেন, বুদ্ধদেবও হয়ত তাই ভেবেছেন। কিন্তু paradox কি অন্তর্দ্বন্দ্বের ইংরেজী পরিভাষা?

(৫) একথা সর্বপ্রথম তরুণ যে dark, turbulent and passionate রচনাই romantic কবিতার best tradition—অবশ্য মারিও প্রাজ্ এর The Romantic Agony পড়ে হঠাৎ এমন মন্তব্য করা অস্বাভাবিক নয়; বস্তুত romanticism এর যে সুস্থ শিল্পচেতনা ইংলণ্ডে ওয়ার্ডস্বার্থ কোলরীজ প্রমুখদের রচনায় অন্তর্লীন করেছিল, একথা তারও ভেকাডেন্স্ এর সন্ধেপাত হয়। ইতালী ও ফ্রান্সে এই ডেকাডেন্সের নঞর্থক স্ফুরণ হয় (অবশ্য প্রাজ্ মধ্যযুগেও এ জাতীয় শিল্পচেতনার ইঙ্গিত দিয়েছেন)। বস্তুত বুদ্ধদেব বসু যা ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন তা decadent romanticism হলে য়ুরোপীয় সাহিত্যে সুপরিচিত। Cynicism, sadism এবং morbidity—এই কাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণ; এবং ইংলণ্ডে বায়রণ, ফ্রান্সে বাদ্‌লেয়ার ও নার্, ইতালীতে দান্নুন্‌সিও এই আন্দোলনের প্রতিনিধি। অন্যদিকে, ১৭৯৮ সালে Lyrical Ballads এর প্রকাশকাল থেকে যে রোমান্টিসিজমের জন্ম, তার ধার্মিক ভিত্তি, শিল্পচেতনা ও স্বাধীনতার বিষয়ে ও তার সুস্থ জীবনাদর্শের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসু হয়ত ততটা সচেতন নন। এবিষয়ে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের Reason Romanticism and Revolution গ্রন্থটী আগ্রহী পাঠককে পড়তে অনুরোধ করি। দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রকাব্যে তিনি কোথায় 'dark and turbulent' কবিতার সাক্ষাৎ পেলেন? "passionate" কবিতা রোমান্টিক কবি মাত্রেই লিখে থাকবেন; যদিও একথা সর্বজনবিদিত, রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালে passionate কবিতাও বিশেষ লেখেননি, সম্ভবত 'বিজয়িনী' কবিতাটিই এজাতীয় রচনার শেষ নিদর্শন।

(৬) 'কণিকা'র শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলিতে হাইকুর প্রভাব আবিষ্কার করেছেন বুদ্ধদেব বসু। যদিও রবীন্দ্রনাথ 'কণিকের গান গা রে আজি প্রাণ' বলে প্রস্তাবনা করেছেন, তথাপি 'কণিকা'র কাব্যগুলির মূল সুর নিছক কণিকত্বের

যায়। একদিকে পুরাতনের প্রতি রোমান্টিক আকর্ষণ, অন্যদিকে মানবজীবনের প্রবহমান ধারার প্রতি সচেতনতা। এই কবিতাগুলিতে কবি অনেক স্থানে নিজেকে নবযৌবনের প্রতীক হিসেবে কল্পনা করেছেন, আবার আলোকে উদ্ভাসে উদ্ভাসিত, সংগীত ও আনন্দমুখরিত পৃথিবীতে সকলকে সাদরভাবে আহ্বান জানিয়েছেন: এসো গো সকল স্বপন ছুটায়ে; এসো হেসে সহজ বেশে; আজ ভোর থেকে নাই গো বাদল, আর গো আয়; তোমার তরে হবে গো ঠাঁই। এসো, এসো ত্বরে; ইত্যাদি। অন্যদিকে, হাইনে সম্পর্কে যু' একজন বিশিষ্ট য়ুরোপীয় সমালোচকের উক্তি মনে রাখলে এই প্রভাবকে অবশ্য-কল্পিত বলেই মনে হবে। হাইনের কাব্যে "sardonic self consciousness" এর পরিচয় অন্যতম বৈশিষ্ট্য, বিশেষত "it is his ironic poetry that has best withstood the changes of fashion"—কবিকার কোন্ কবিতায় এই দুটি লক্ষণ বর্তমান, জানতে ইচ্ছে করে। রবীন্দ্রকাব্যের দ্বিতীয় পটভূমিতে তাঁর মূল কাব্যধারার সুরে কোথাও ironyর প্রকাশ আছে কি? বস্তুত, সাহিত্যে 'প্রভাব' সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় তখনই যখন একজনের কবিতার মূল সুর অন্যজনের কাব্যকে সংক্রামিত করে।

(৭) 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' প্রসঙ্গে বোদ্‌লেয়র বা র‍্যাঁবোর প্রভাবও তেমনি অনাবশ্যক কল্পনা। রবীন্দ্রনাথ 'বিদেশিনী' কে কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে 'অপরিচিতা' বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ অপরিচিতা অর্থেই 'বিদেশিনী' শব্দটি এখানে ব্যবহৃত। দ্বিতীয়ত, কবিতাটির কোন অংশেই এমন উল্লেখ বা ইঙ্গিত নেই যে পশ্চিম অর্থেই য়ুরোপ। সূর্য ডুবছে—এই প্রসঙ্গেই পশ্চিমের কথা আছে এবং সূর্য নিশ্চয় পশ্চিম দিকেই ডোবে। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতাটি, উপরন্তু, 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত এবং সেই সময় 'সোনার তরী' রবীন্দ্রকাব্যে নানাস্থানে একটি সার্থক ও সতত প্রতীক হিসেবে বার বার ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং 'woman in it is a foreigner and the golden boat is journeying westward' এমন মন্তব্য শুধুমাত্র অমূলক নয়, যুক্তির উদ্দাম কল্পনায় আর একটি নিদর্শন মাত্র।

এই ছোট্ট প্রবন্ধটিতে বার বার উৎকট প্রচেষ্টা রয়েছে এই কথা প্রমাণ করবার যে রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপের কবিদের কাছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ঋণী কিন্তু সে সকল প্রভাবের অস্তিত্ব অথবা উৎস আমরা জানতে পারিনা,

কেমনা, রবীন্দ্রজীবনীর বালমসলা আমাদের কাছে অত্যন্তই অল্প, এমনকি রবীন্দ্রনাথ কি পড়েছেন তাও সঠিক জানা সম্ভব নয়। য়ুরোপের একটি পত্রিকায় বুদ্ধদেব বসুর এহেন প্রচেষ্টা কি অতীব দুঃখের কারণ নয়?

মন্তব্যগুলি প্রমাণনিরপেক্ষ, শুধু অনুমানের 'পর নির্ভরশীল

'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত বাংলা রচনাটি পড়ে (পাঠক, লক্ষ্য করবেন, বাংলা ও ইংরেজীতে অনেক প্রভেদ রয়েছে!) এও বুঝতে পারছি যে বুদ্ধদেব বসু ইদানীং বাঙালী পাঠককে করুণা করতে শিখেছেন, নিজেকে নিছক এ-দেশীয় লেখক বলে মনে করে নিতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে (যেভাবে "মাতৃভূমি" শব্দটি উচ্চারণ করেছেন তা সত্যিই বেদনাদায়ক নয় কি?) এবং সর্বোপরি প্রকৃতই গূঢ় কোন বিষয়ে, হঠাৎ যা-মনে-এলো তাই বলে যাওয়াতেও তিনি ক্রমশঃ অভ্যস্ত হচ্ছেন। লেখাটির মধ্যে সারবান পদার্থ সত্যিই কতটা আছে আমার উপরের আলোচনাই তার সাক্ষ্য দেবে। যে লেখা কোন বিষয়েই উল্লেখযোগ্য নয় তা আলোচিত হবার সার্থকতা কি—এমন কথা ভাবতে গিয়ে মনে হচ্ছে সম্ভবত লেখাটির গুরুত্ব নয়, বরং রবীন্দ্র প্রতিভা সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর এরূপ তাচ্ছিল্যের প্রকাশই লেখাটিকে উল্লেখযোগ্য করেছে, এবং এই মনোভাবই বর্তমান আন্দোলনের মূল কারণ। উপরন্তু, যেখানে একটি দ্বিতীয় বিদেশী পত্রিকা (Two Cities) বিশেষভাবে শত-বার্ষিকী বৎসরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি "Hommage" জানাবার জন্যই উক্ত সংখ্যাটি প্রকাশ করেছেন সেখানে মাত্র সাড়ে তিন পৃষ্ঠায় এমন একটি গুরুত্ব বিতর্কমূলক বিষয় অবতারণা করে' এমনতরো এলোমেলো মন্তব্যের উচ্চারণ সেই উষ্মার অন্যতম কারণ। এবং একথা মনে করবারও সঙ্গত কারণ রয়েছে যে তিনি বিষয়টির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন নি এবং যথোচিত শ্রদ্ধাও প্রকাশ করতে সম্ভবত সঙ্কোচ বোধ করেছেন! সমগ্র বহির্ভারতে রবীন্দ্রনাথ যখন আমাদের একমাত্র সাংস্কৃতিক পরিচয়, তখন জাতীয় কবি সম্পর্কে বিদেশী পত্রিকায় এরকম রচনা সকলকেই যে ক্ষুব্ধ করেছে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

ইংরেজীতে Casual বলে যে শব্দটি আছে বস্তুত সমস্ত রচনাটিকে একমাত্র সেই বিশেষণেই ভূষিত করা চলে না কি। যে মেজাজে বুদ্ধদেব বসু একদা রম্য-রচনা লিখে সুনাম অর্জন করেছিলেন অনেকটা সেই হাল্‌কা মেজাজেই পৃথিবীর

অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষীকে কেন্দ্র করে এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা উপস্থিত করেছেন—যা প্রকৃতই তর্কসাপেক্ষ। তাছাড়া 'ভক্টরেট ডিগ্রী-প্রার্থী' পণ্ডিতদের সম্পর্কে তিনি কটাক্ষ বর্ষণ করেছেন অথচ এই বিষয়টি সত্যই কি গবেষণার কাজ নয়? বুদ্ধদেব বসু এমন কোন প্রমাণ এখনো পর্যন্ত কি দিয়েছেন (এমনকি, বর্তমান রচনাটিতেও) যাতে আমরা জানি তিনি একজন সার্থক গবেষক? উপরন্তু, গবেষণার প্রতি তাঁর এতই যদি প্রবল অনীহা তবে এজাতীয় আলোচনায় তিনি প্রবৃত্ত হন কেন যা পর্যাপ্ত গবেষণা ব্যতিরেকে এবং প্রকৃত তথ্য সন্নিবেশ না করে প্রমাণিত করা সম্ভব হয় না? যাকে মধ্যে মধ্যে মতুন কথা বলে তিনি পাঠককে অনেক সময় চমকে দেবার চেষ্টা করেছেন (যেমন মাইকেল ও সংস্কৃত কাব্য সম্বন্ধে; অবশ্য সেটুকু আলোচনায় তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম সহকারে প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন), কিন্তু সে সকল উক্তিকে এপর্যন্ত কোন্ কবি সমালোচক বা সাহিত্যরসিক যথেষ্ট গুরুত্ব দান করেছেন? তিনি একথা জানেন না, রবীন্দ্রনাথ 'দীর্ঘ জীবন ধরে কোন কোন বিষয়ে এবং কি পরিমান পুস্তক পাঠ করেছেন'। অথচ, 'রবীন্দ্র সদন'এর সাহায্য নিলে এবিষয়ে তিনি অনেক তথ্যই জানতে পারতেন। বুদ্ধদেব বসুর আরো বক্তব্য "রবীন্দ্রনাথের সেই ভূতলবর্তী মনোলোক তাঁর কবি সত্তার যা ভিত্তিভূমি—আমি বলতে চাই তার বড়ো একটা অংশ য়োরোপের অন্তর্গত"। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই স্বীকার করছেন "তথ্যের দ্বারা এই কথাটা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য"—কিন্তু এটুকু স্বীকার করলেই কি সব মিটে যায়? যদি প্রমাণ করা দুঃসাধ্যই হয় তবে এমন উক্তির প্রয়োজন আছে কি? এবং তুলনামূলক সাহিত্য বিচার কি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অনুমানের 'পরই নির্ভরশীল? না যথেষ্ট অনুধাবন, অনুশীলন, চর্চা ও সেই সকল মূল ভাষার অধ্যয়ন দ্বারা উক্ত পারম্পর্যকে পাঠকের সামনে তুলে ধরার তার সার্থকতা? 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' আজ থেকে ঠিক ৬৮ বছর আগের রচনা, সে সময় বাংলা দেশে য়োরোপের বা ফ্রান্সের পড়ার রেওয়াজ কতটা ছিল আমাদের অজানা (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অবশ্য প্রচুর ফরাসী পড়তেন, তবে তার অধিকাংশই নাটক এবং উপন্যাস—)। তাছাড়া বুদ্ধদেব নিজেই জানাচ্ছেন যে তাঁর সমকালীন ফরাসী কবিদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মোটেই উৎসাহ ছিল না: "Strange paradox, this apparent indifference of one of the most receptive of poets

to the main modern of poetry of his time"। সুতরাং সেই কবিতাটির 'পর করাসী কবিত্বের প্রভাব কি করে সম্ভব? এ সম্পর্কেও বুদ্ধদেব বসু শুধুমাত্র মন্তব্য না করে প্রকৃত গবেষণার দ্বারা সুচিন্তিত মতামত দিতে পারতেন।

ইংরাজী প্রবন্ধ হয়ত আমাদের মত বাঙালী পাঠকের 'দুর্গম' মনে হবে, কিন্তু বুদ্ধদেব বসু কি মূল জর্মন, ফরাসী, সংস্কৃত এবং অন্যান্য মূল য়ুরোপীয় ভাষা থেকে উদ্ধৃতি সহকারে পূর্বে কখনো এ জাতীয় তুলনামূলক আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমাদের আলোকিত করেছেন? যদি না করে থাকেন তাহলে আমরা অনুরোধ করব, রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট সৃষ্টিশীল প্রতিভার সম্যক বিচারে তিনি এজাতীয় হঠাৎ মন্তব্য না করে' এবং অনুমানগুলিকেই প্রমাণস্বরূপ খাড়া না করে 'যেহেতু তথ্য কথাটার প্রতিপত্তি এখন বিপুল' সেহেতু তথ্যের 'পর নির্ভর করেই যেন এ-জাতীয় বিতর্কমূলক আলোচনার সূত্রপাত করেন। তা না হলে সরলমতি ছাত্র, পাঠক ও সাহিত্যরসিককে শুধুই বিভ্রান্ত করা হয় না কি? (বুদ্ধদেব বসু নিজেই উল্লিখিত বাংলা প্রবন্ধে পাঠকের 'প্রতারিত হবার উদ্গ্রীবতা অপরিসীম' বলে মন্তব্য করেছেন। তার জন্য এদেশ সমালোচকরাও কি কতকাংশে দায়ী নয়!) বর্তমান রচনাটিতে তিনি কি শুধু কতগুলি মনগড়া মন্তব্য পেশ করেননি! সাড়ে তিন পৃষ্ঠা রচনার কোথাও কোন যুক্তি নেই, বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি নেই, আছে কেবল নিছক অনুমান ও ব্যক্তিগত ধারণাকে কেন্দ্র করে একাধিক বিতর্কমূলক বিষয়ের অবতারণা। বস্তুত যে আলোচনাটি তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তা প্রকৃতই গবেষণামূলক, অথচ গবেষণা সম্পর্কে তাঁর কোনই আগ্রহ নেই, বরং রয়েছে কটাক্ষপাত। দ্বিতীয়ত, তিনি বলছেন, রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক য়ুরোপীয় কবিদের সম্পর্কে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না, পরমুহূর্তেই রবীন্দ্রনাথের রচনায় 'veiled confession of Tagore's debt to the West' এমন মন্তব্য করছেন। তৃতীয়ত, এই ছোট্ট আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের পড়াশুনোর প্রতি কটাক্ষপাত করার প্রচ্ছন্ন ও সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে, (Two Cities : ৩১ পৃঃ ৬ লাইন, ২৫-২৬ লাইন, ৩২ পৃঃ ৩৪-৩৮ লাইন, ৩৩ পৃঃ ২৮-২৯ ও ৩৭-৪০ লাইন) অথচ তিনিই স্বীকার করছেন, a single spark is enough to ignite the mind of a genius.—এ কম বিস্ময়ের কথা নয় কি?

বুদ্ধদেব বসুর উক্তি অনুসরণ করে আমরাও বলতে পারি না কি, তাঁর এই রচনাটিই 'Strange paradox' এর যোগ্যতম নিদর্শন ?

সর্বশেষে লেকসৃশীয়র প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর ইঙ্গিত সম্পর্কে আলোচনা করেই আমার বক্তব্য শেষ করব। লেকসৃশীয়রের ওথেলো ও লীয়র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের মন্দ অনুবাদে বুদ্ধদেব বলেছেন : "It is the mire of human nature that comes to the surface in these works" —কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য কি তাই ? "জীবনস্মৃতি"র ১৩১৪ বৈশাখ সংস্করণ এর ১২৪ পৃঃ ৮-১২ পংক্তিতে লেকসৃশীয়র প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজে বলছেন, "এই জন্যই ইংরেজী সাহিত্যে হৃদয়াবেগের এই বেগ এবং রুদ্রতা আমাদিগকে এমন একটি প্রাণের আঘাত দিয়াছিল যাহা আমাদের হৃদয় স্বভাবতই প্রার্থনা করে।···তাহাতে যদি তলার সমস্ত পাঁক উঠিয়া পড়ে তবে সেও স্বীকার।" যে কোন ক্ষিপ্রবুদ্ধি পাঠক বুঝবেন বুদ্ধদেব বসু তাঁর অনুবাদে মূল তাৎপর্য কিভাবে সম্পূর্ণ বিকৃত করেছেন। দ্বিতীয়ত "He officially disliked Shakespeare"—এই তথ্য তিনি কোথায় পেলেন ? 'জীবনস্মৃতি'র ওই সংস্করণে ১২৩-২৪ পৃষ্ঠায় মাঝে মাঝে লেকসৃশীয়র প্রসঙ্গের অবতারণা রয়েছে। সাধারণভাবে য়ুরোপীয় সমাজের গতিশীল চঞ্চলতার সঙ্গে তিনি আমাদের জীবনে অচঞ্চল স্থিরতার তুলনামূলক বৈশাদৃশ্য এঁকেছেন এবং সেই সূত্রেই লেকসৃশীয়র ও বায়রনের আলোচনা রয়েছে। এই সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুকে জিজ্ঞাসা করছি, তিনি যাকে Two Cities পত্রিকাটির ৩১ পৃঃ ৩২ লাইনে 'author of *Amiel's Journal*' বলে উল্লেখ করেছেন, সেই ব্যক্তিটি কে ? তিনি কি জানেন না যে 'Amiel's Journal' এর লেখক Amiel নিজেই, যার পুরো নাম Henri-Frederic Amiel এবং বইটির প্রকৃত নাম 'Journal Intime' ? বইটির প্রথম ইংরেজী সংস্করণ শ্রীমতী হামফ্রে ওয়ার্ড কর্তৃক অনূদিত হয়ে ১৮৮৫ খৃঃ ইংলণ্ডে প্রকাশিত হয়। সুতরাং 'author of *Amiel's Journal*' কথাটা কি রকম হ'ল ? 'Author of Andre Gide's Journal' বললে যা হয়, ব্যাপারটা সেরকম অর্থহীন হয়ে দাঁড়ালো না কি ?

'দেশ' পত্রিকার অদ্ভুত নির্দেশ

এই প্রসঙ্গে ৬ই শ্রাবণ ১৩৬৮ সালের 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদকীয় নির্দেশ

পত্রে অতিরিক্ত বিস্মিত হয়েছি। বুদ্ধদেব বসুর লেখাটি প্রথমবার মুদ্রণ করার সঙ্গে সঙ্গেই সম্পাদক জানিয়েছেন, 'নতুন করে এবিষয়ে কোনও আলোচনার সূত্রপাতে আমরা ইচ্ছুক নই'। সাহিত্য ও সাংবাদিকতার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবার ও সাধারণ গণতান্ত্রিক অধিকারের কণ্ঠরোধ করবার এই বাসনা 'দেশ' পত্রিকার কেন হলো ভেবে অবাক হচ্ছি! এটা কি গুরু শালীনতারও বিরোধী নয়! লেখাটিকে কেন্দ্র করে বিতর্ক হবে জানা সত্ত্বেও তার কোন আলোচনা করতে না দেওয়ার স্বাভাবিকভাবেই একথাও প্রমাণিত হয় যে 'দেশ' পত্রিকা সরকারীভাবেই বুদ্ধদেব বসুর বক্তব্য সমর্থন করেন। শিবনারায়ণ রায়ের লেখা প্রকাশ করে যারা দীর্ঘদিন কত উল্লেখযোগ্য আলোচনার সূত্রপাত করেছেন, তারাই হঠাৎ বুদ্ধদেব বসুর আলোচনাটি ছেপে এই অদ্ভুত নির্দেশ জারী করলেন কেন? পরন্তু, যে পত্রিকা সর্বসাধারণের, কোন বিশেষ লেখকের প্রতি তাদের এহেন পক্ষপাত কি শোভনতার পরিচায়ক! রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে-কোন সমালোচনা করবার অধিকার বুদ্ধদেব বসুর যদি থেকে থাকে, সেই সমালোচনার প্রত্যুত্তর দেবার গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাও সকলের আছে। সেই স্বাধীনতা হরণ করবার অধিকার কোন সংবাদপত্রের আছে কি?

বুদ্ধদেব বসুর প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ নিবেদন, তাঁর মন্তব্যগুলিকে তিনি তথ্য ও প্রমাণাদি সহযোগে বিস্তৃত আলোচনা করে প্রকৃত সমালোচনার সূত্রপাত করুন। অপরপক্ষে, 'দেশ'-সম্পাদকের নিকট আমাদের দাবী, শিল্পসাহিত্যের এই মৌল অধিকার হরণ সম্পর্কে জনসাধারণের কাছে তিনি ক্ষমাপ্রার্থী হোন।

অরুণ ভট্টাচার্য

টেম্পল প্রেস, ২৭৫ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯ থেকে অরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

It's a question of balance...

Balance on a bicycle is easily acquired. Not so easy is the balancing of your bicycle accounts—its costs against its service. The extreme care in choice of raw materials and rigid factory inspection of each component make Sen-Raleigh bicycles the most serviceable with a minimum of repair and replacement costs, thus striking the right balance.

RALEIGH

ROBIN HOOD

SEN RALEIGH
Products

লিলির রিচ

নোনতা বিস্কুট

টাটকা ও মচমচে

লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৪